মায়ের

তাঁকে,

"যে আমারে দেখিবারে পায়

অসীম ক্ষমায়

ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি"

বারোই নভেম্বর : উনিশ শ' বাহান্ন : কলকাতা

এই লেখকের লেখা

দৃষ্টিপাত

অনা[illegible]

আজ রাকতা য়ে কলম হেচ্চ্ দিগার পুঙনা সাবাদ।
এক জররা আজ উঁচ্চে হাসং আকিজুন না সাবাদ।
হার হিলা কে দর্ ত সাউয়ার আকনে আইয়েজ
কর্ দেম ও লেক বা কাজা দর্ না গিরিস্ত।

—ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ ॥

The little finger writes, and having writ
Moves on ; nor all thy piety nor wit
Shall lure it back to cancel half a line,
Nor all thy tears wash out a word of it.

—ফিটস্ জেরাল্ড কৃত ইংরেজী অনুবাদ ॥

পারস্যদেশীয় উপকথায় একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী আছে। গল্পের নায়ক—বিদ্যাহীন, বুদ্ধিহীন ও বিত্তহীন এক রাখাল বালক সমুদ্রের বেলাভূমিতে ক্রীড়াচ্ছলে শুক্তি আহরণ করতো প্রতিদিন। জানতো না, তার মধ্যে ছিল লক্ষ হীরা মাণিক। সে-মাণিক যার ঘরে আসে, তাকে রাজা করে; যার ঘর ছাড়ে, সে হয় ফকির। অপুত্রক অধিপতির মৃত্যুর পরে রাজ্যের বৃদ্ধ উজীর বের হলেন ভাবী সুলতানের সন্ধানে। বহুদিনব্যাপী ব্যর্থ অন্বেষণের পর হতাশ হয়ে একদিন শপথ করলেন, পরদিন জুম্মার নামাজের শেষে যার সঙ্গে প্রথম দেখা হবে, তাকেই রাজপদে মনোনীত করবেন। নামাজের পরে মসজিদের বাইরে এসে উজীর দেখতে পেলেন দ্বারের পাশে মীনারের ছায়ায় এক রাখাল বালক নিদ্রামগ্ন। ক্ষুধায় ও পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে সে আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে। ঘোড়ায় চড়িয়ে উজীর নিয়ে এলেন তাকে রাজধানীতে। রাখাল বালককে বসিয়ে দিলেন বাদশাহের তক্তে। শাহজাদীর সঙ্গে ঘটল তার পরিণয়।

নিজের অজ্ঞাতে অকস্মাৎ অসামান্যতা লাভের এমন বিস্ময়কর ঘটনা শুধুমাত্র রূপকথার ভাণ্ডারেই নিবদ্ধ নয়। সত্যিকার মানুষের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার ইতিহাসেও এমন একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। প্রীতিপ্রদ বলেই সে অভিজ্ঞতা দীর্ঘকাল আমাদের স্মরণে থাকে না। সে আমাদের আপন

সৌভাগ্যের অনুকূল, তাই তাকে আমরা আপন যোগ্যতার অবধারিত পুরস্কাররূপেই গণ্য করি, প্রসন্ন ভাগ্যদেবতার অকারণ পক্ষপাত বলে স্বীকার করিনে।

আমি লেখক নই। গ্রন্থ রচনার কোনো উচ্চাভিলাষ কোনোকালে আমার কল্পনায় ছিল না। অথচ সম্প্রতি গ্রন্থকাররূপে আমার পরিচিতি ঘটেছে। এটা একান্তই আকস্মিক। পাঠকজনের যে-প্রসন্ন প্রশ্রয় লেখকজীবনের চরম পুরস্কাররূপে চিরকাল স্বীকৃত, সেই অভাবনীয় অনুগ্রহের দ্বারা যদি ধন্য হয়ে থাকি, তবে তাও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

কর্মের [illegible] আমি দিল্লী এসেছিলেম। সে অনেক দিন আগেকার কথা। বয়স তখন অল্প, কৌতূহল প্রচুর এবং মনের স্বাভাবিক রসগ্রাহিতা পরিণত বুদ্ধি ও পরিপক্ক অভিজ্ঞতার অন্তরালে তখনও পরিপূর্ণরূপে বিলুপ্ত হওয়ার অবকাশ পায় নি। জীবনের যে-অধ্যায়ে হৃদয় সহজে উদ্বেল, কল্পনা উদ্দীপ্ত ও রসনা মুখর হয়, যৌবনের সেই প্রারম্ভকালে আর্যাবর্তের এই মহানগরীতে আমার প্রথম পদার্পণ। আমার পক্ষে সেটা অবশ্যই অবিস্মরণীয় ঘটনা।

সর্বদেশেই কাব্য ও উপকথার মধ্য দিয়ে কয়েকটি স্থান অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেগুলির খ্যাতি তাদের আপন মাহাত্ম্যে নয়, সাহিত্যিকের রচনানৈপুণ্যে। হারুন্-অল্ রসিদের রাজধানী বোগদাদের সঙ্গে সত্যিকার ভূগোলের সম্পর্ক সামান্য। তার যথার্থ পরিচয় আছে একমাত্র শেহরজাদী-কথিত একাধিক সহস্র রজনীর কাহিনীতে।

যে-উজ্জয়িনীর প্রাসাদ-অলিন্দে একদা মৃগলোচনা জনপদবধূরা প্রবাসী প্রিয়জনের প্রতীক্ষারতা ছিলেন, তার আসল ঠিকানা সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ম্যাপে মিলে না। শুধু স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।

কাব্যলোকের মহিমামণ্ডিত এই নগরমালার মধ্যে দিল্লীর স্থান নেই। রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত অভিশপ্ত যক্ষের বিরহ-বেদনা বহন করে আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে যে-পূর্বমেঘ যক্ষপ্রিয়ার কাছে উপনীত হয়েছিল, তার পরিক্রমণ-পথে দিল্লীর আকাশ ছিল কি না, সে-কথা কালিদাস বলেন নি। ইঙ্গ-বঙ্গ-অধ্যুষিত অতি-আধুনিক দার্জিলিংকেও রবীন্দ্রনাথ কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘলোক থেকে গল্পের স্বপ্নলোকে উন্নীত করেছেন। কিন্তু দিল্লীপথের ধূলি ছাড়া মহানগরীর আর কিছুই তাঁর রচনায় স্থান পায় নি, যদিও বদ্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁ'র পুত্রীকে জনশূন্য ক্যালকাটা রোড অপেক্ষা আজমিরী গেটের পাশে খুব বেমানান দেখাতো বলে মনে হয় না।

তবুও দিল্লীর গৌরব তার নিজস্ব। সে তো একটি মাত্র নগরী নয়, বহু নগরীর ধ্বংস ও বিকাশ। একটি রাজার রাজধানী নয়, বহু রাজত্বের শ্মশান ও সূতিকা। বিচিত্র সভ্যতা, বিভিন্ন ধর্ম, বহুবিধ জাতির সংঘাত, সংঘর্ষ ও সমন্বয়ে ভারতবর্ষের সুমহান ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে এইখানে। যুগ-যুগান্ত ধরে যে-তিনটি স্থান ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ধারণ, খ্যাতি বহন ও পরিচিতি প্রসারণ করেছে, তার মধ্যে

বারাণসীর পরিচিতি প্রজ্ঞায়, বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধি ভক্তিতে, দিল্লীর গুরুত্ব ইতিহাসে। ভারতবর্ষের ইতিহাস ও দিল্লীর ইতিবৃত্ত অনেকাংশে সমার্থক।

ইতিহাসের সঙ্গে কাব্যের প্রভেদ অনেক। কাব্যের আবেদন মানুষের মনে। তার নায়ক-নায়িকার বিচরণস্থল আমরা কল্পনায় অনুভব করি। চোখ বুজে তাকে ভাবা যায়। ইতিহাসের সাক্ষ্য থাকে মাটিতে। তার ঘটনাস্থল প্রত্যক্ষ। চোখ মেলে তাকে দেখা যায়। দিল্লীর প্রাচীর ও প্রান্তরে, দুর্গপ্রাকার ও প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে, সমাধিক্ষেত্র ও সৌধমালায় অসংখ্য দর্শনীয় আছে।

কিন্তু দর্শনের যে-রস, সে শুধু নয়ননিবদ্ধ নয়, মননসাপেক্ষ। চক্ষু দ্বারা দেখি—একথা বাল্যকালে বিদ্যারম্ভের প্রথম পর্বে পাঠ্যপুস্তকে আমরা সবাই পড়েছি। কিন্তু চোখ চাইলেই যে দেখা যায় না, এ-তথ্য বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে আমরা ক্রমশঃ জেনেছি। যে-দৃষ্টির সঙ্গে মনের যোগ নেই সে তো দেখা নয়,—তাকানো।

দেখার সঙ্গে আনন্দের যোগ সাধন করতে সঙ্গীর প্রয়োজন। ভোগের বেলায় সংখ্যাধিক্যের ফলে বস্তুর হ্রাস ঘটে। একের পাতে যা পরিপূর্ণ এক, দুইয়ের পাতে তা বিভক্ত অর্ধেক। উপভোগের বেলায় বহু দ্বারা রসের ঘটে বৃদ্ধি। এই জন্যেই স্টেথেস্কোপ হাতে রোগী দেখতে যাই একা, উড়নী গায়ে বিয়ের কনে দেখতে যাই সবান্ধবে

দিল্লীতে আমি দেখেছি অনেক, শুনেছি প্রচুর এবং

জেনেছিও নেহাৎ কম নয়। কিন্তু সমস্তই একক। যাঁর সঙ্গে দেখলে দেখার বস্তু দর্শনীয় হয়ে উঠে, তিনি ছিলেন অন্যত্র। তাঁকে নিয়ে দিল্লী পরিভ্রমণ সেদিন সম্ভব ছিল না। তবুও আমার চোখ দিয়েই তাঁকে দেখাব, আমার মনে এই অভিলাষ ছিল। সে-কাজটা সহজ নয়।

পুরাকালে হংসদূতের দ্বারা দূর-দূরান্তরে বার্তা প্রেরণের রীতি ছিল। কিন্তু এ-যুগের নলরাজেরা জানেন, বার্তাবাহী রাজহংস দময়ন্তীর উদ্যানে পৌঁছিতে পারবে না, মধ্যপথেই কোনো সুনিপুণ পাচকের হস্তে সুপক্ক ব্যঞ্জনে ভোজনরসিকগণের [illegible] সহায়ক হবে। বর্তমানের মরালগামিনীরা মরালকে বাতিল করেছেন। তাঁরা এখন উর্দিপরা সরকারী ডাক-হরকরার উপর নির্ভর করেন। সুতরাং আমার দেখাকে আমি রূপান্তরিত করলেম পত্রে। তার সংখ্যা অনেক এবং স্ফীতি ভীতিজনক।

চিঠি জিনিষটা স্বভাবতঃই দ্বিবচনের ব্যাপার। তাকে বহু বচনের ব্যবহারে আনলে ব্যাকরণদুষ্টি ঘটে। চিঠি চাঁদনী রাতে দুটিমাত্র প্রাণীর গঙ্গাবিহরণের ছোট্ট পানসিটি। কুসুমগঞ্জের হাটের পথে বহু জনের নদী পারাপারের জন্যে পাঁচ মাল্লার খেয়া নৌকা নয়।

দিল্লীর রৌদ্রদগ্ধ আকাশের নীচে আমার বিস্তীর্ণ অবকাশক্ষেত্রে যে প্রচুর পত্রশস্য জন্মলাভ করেছিল, সেগুলি একটিমাত্র গৃহিণীর ভাণ্ডারে মরাই ভরে' রইবে, এই ছিল কামনা। কোনো দিন কোনো কারণে সরকারী সিভিল

সাপ্লাইর গুদামে সেগুলি সর্বসাধারণের খাদ্য-সমস্যার সমাধান করবে, এমন আশঙ্কা ছিল না। পত্রগুলি যাঁকে লেখা, তাঁর কোমল করযুগলের মধ্যে কৈবল্য লাভ করলেই তাদের মোক্ষ। তারা যে ভবিষ্যতে কম্পোজিটারের স্থূল হস্তাবলেপনের দ্বারা সর্বাঙ্গ ছাপাখানার মসীলিপ্ত হয়ে সাহিত্যের বিচারশালায় লেখকের দুষ্কৃতির অকাট্য সাক্ষ্যরূপে দেখা দেবে, তা কল্পনাও করি নি।

মুদ্রণের দ্বারা পত্রের জাতিভ্রংশ ঘটে। যেমন সিনেমাকরণের দ্বারা উপন্যাসের। পত্রের রস লজ্জানম্র নববধূর অনুচ্চ কণ্ঠে গীত সঙ্গীতের মতো, নির্জন শয়নকক্ষে একমাত্র দয়িতের কাছেই তার প্রকাশ। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে জনাকীর্ণ জলসার আসরে তাকে টেনে আনলে তারও দুর্গতি, অন্যেরও দুর্ভোগ। কারণ, বঁধুর কানে যা কলস্বর, বহুর কানে তা কলরব।

অবশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত পত্রের অভাব নেই, যদিও সিনেমায় বেশীর ভাগ যুদ্ধ-চিত্রই যেমন প্রচ্ছন্ন প্রোপাগাণ্ডা, সাহিত্যের অধিকাংশ পত্র-সঙ্কলনও তেমনি ছদ্মবেশী প্রবন্ধসংগ্রহ। পত্র-সাহিত্য নামেও সাহিত্যের একটা বিভাগ আছে। সাধারণতঃ দুটি কারণে তার উদ্ভব। প্রথমটা তথ্যমূলক, দ্বিতীয়টা সাহিত্যিক।

কবি বা সাহিত্যিকদের লেখা পত্রে লেখকের দুটি বিভিন্ন রূপ প্রকাশ পায়। [illegible] বহির্দেশে প্রত্যেক সাহিত্যসেবীর নিছক মানুষরূপে যে একটা সত্তা বর্তমান,

এক শ্রেণীর পত্রে তারই পরিচয় থাকে। সেখানে পত্রলেখক পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্বামী, স্ত্রী বা বন্ধু প্রভৃতি সামাজিক সম্পর্ক দ্বারা পরিচিত, সাহিত্যপ্রতিভা দ্বারা নয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্রগুলি পত্ররচয়িতার আত্মপ্রকাশের অন্যতম উপকরণ। পত্ররচনা সেখানে একটা রীতি, ইংরেজীতে যাকে বলে ফর্ম। সেখানে যাকে লেখা হয় সে গৌণ, যা লেখা হয় সেটাই মুখ্য। এই ফর্ম অবলম্বন করে সার্থক কথাসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, যেমন,—রোমানফের গল্প। তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিত হয়েছে, যথা,—লেটারর্স টু দি শেরিফ অব ব্রিস্টল। নব শিক্ষার্থিনীর জন্যে সংক্ষেপে পৃথিবীর ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে; প্রমাণ—লেটার্স ফ্রম এ ফাদার টু এ ডটার। উপভোগ্য কবিতা রচিত হয়েছে, উদাহরণ—শিলং-এর চিঠি।

প্রথম শ্রেণীর পত্র প্রকাশ কালে প্রকাশকের একটি চোখ থাকে জীবনীকারের দিকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর পশ্চাতে থাকে সৃষ্টির প্রেরণা। 'ভাই ছুটি' বলে যার আরম্ভ আর ছিন্নপত্র—এ দু-এর রস যে আলাদা জাতের এবং গুরুত্ব যে পৃথক কারণে, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

মুদ্রিত পত্রের আরও একটি শ্রেণী আছে। সেখানে লেখকের উদ্দেশ্যটা এতই সুস্পষ্ট যে, তাকে কেউ পত্র বলেই জ্ঞান করে না। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যুযুধান দুই পক্ষের মধ্যে দৈনিক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় 'খোলা চিঠি'র গোলা বর্ষণকে পাঠকেরা কূটনৈতিক কুস্তির প্যাঁচরূপেই গণ্য করে, চিঠি বলে ভুল করে না।

দিল্লীতে লেখা পত্রগুলি মূলতঃ চিঠিই ছিল। কিন্তু সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশের কালে সংকলয়িতা বাংলা চলচ্চিত্রের সেন্সার বোর্ডের উপযোগী অতিরিক্ত সতর্কতার সঙ্গে তার মধ্য থেকে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গসমূহ, এমন কি তার ইঙ্গিত পর্যন্ত অসামান্য নিপুণতায় নিশ্চিহ্ন করেছেন। তাঁকে দোষ দিতে চাইনে। প্রত্যেক পত্রের মধ্যেই লেখক ও প্রাপকের সাংসারিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে যে-স্নেহ, প্রীতি, রাগ, অনুরাগ প্রকাশ বা প্রচ্ছন্ন থাকে, সর্বসাধারণের সমক্ষে তার উদ্‌ঘাটন বাঞ্ছনীয় নয়। তাতে পরিণামে উভয়েরই বিব্রত বোধ করার সম্ভাবনা। তবুও এ-কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গ্রন্থাকারে গ্রথিত আমার পত্রগুলি কারও কাছে যদি প্রবন্ধসমষ্টি বা অন্য কিছু মনে হয়ে থাকে, তবে তার জন্যে একমাত্র সংকলয়িতার কাঁচিকেই দায়ী করতে হয়। ডাক্তারেরা জানেন অস্ত্রোপচারের ফলে রোগীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আংশিক বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী।

কী কারণে পত্রাধিকারিণী চিঠিগুলিকে তাঁর নিজস্ব অন্তঃপুরের গোপনীয়তা থেকে টেনে এনে বহির্জগতে লোকলোচনের সম্মুখে তুলে ধরেছেন, তা আমার জানা নেই। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে নিশ্চিতই এর একটি বুদ্ধিবিভ্রান্তকারী ব্যাখ্যা আছে। তা'তেও আমার প্রয়োজন নেই। আমার মনে হয়, মেয়েদের স্বভাবের মধ্যেই একটা স্বাভাবিক প্রচার-প্রবণতা আছে।

সংসারে পুরুষের পরিচয় কীর্তিতে, সেটা স্বয়ং-প্রকাশ। নারীর গৌরব অধিকৃতির, সেটা প্রচারের অপেক্ষা রাখে। স্থায়ী

আমানতে গচ্ছিত টাকার পরিমাপ প্রচুর, এই তথ্যটুকু জেনেই পুরুষ সন্তুষ্ট। ব্যাঙ্কের পাশ-বই পকেটে নিয়ে বেড়ানো সে প্রয়োজন মনে করে না। কিন্তু অর্থের অস্তিত্বটাই নারীর কাছে যথেষ্ট নয়। তার প্রমাণটা যথোচিত পরিমাণে পরিস্ফুট না হলে তার তৃপ্তি নেই। তাই জড়োয়া গহনা সিন্দুকে থাকলেই মেয়েরা খুশি নয়, নিজের সর্বাঙ্গে ঐশ্বর্যের বিজ্ঞপ্তি বহন করে, আপন ধনসম্ভারের প্রচারকার্যে তাদের দুর্জয় আসক্তি।

জানি, আমার পত্রগুলির প্রতি আমি অযথা মহার্ঘ্যতা আরোপ করছি, এই অভিযোগ উঠতে পারে। কিন্তু দ্রব্যের মূল্য তো শুধুমাত্র তার অন্তর্নিহিত গুণাগুণের দ্বারা নির্ণীত হয় না। এক খণ্ড ব্যবহৃত ডাকটিকিটের দাম আমার কাছে কানাকড়িও নয়। অথচ ডাকটিকিট সঞ্চয় যাঁর বাতিক, তিনি তার জন্যে প্রয়োজন হলে হাজার টা দিতেও কার্পণ্য করেন না। সুতরাং সেদিনের পত্রগুলি অ ঃ পত্রাধিকারিণীর কাছে একেবারে মূল্যহীন ছিল না, এ বিশ্বাস যদি পত্রলেখকের মনে কখনও দেখা দিয়ে থাকে, তবে আশা করি তা অবিনয়ের অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

কিন্তু মূল্য এক কথা, প্রচার আর। পত্র-প্রকাশের সঙ্গে আত্মপ্রকাশে আমার প্রবল আপত্তি ছিল। প্রশ্ন করলে, নিশ্চিতরূপে হেতু নির্দেশ করা কঠিন। কারণ, মানুষের সকল কাজের পিছনেই একাধিক হেতুর সমষ্টি থাকে, শুধু একটিমাত্র হেতু থাকে না, যদিও নিজের অভিরুচি, সুযোগ ও সুবিধানুযায়ী ঐ বহুবিধ কারণের মধ্যে বিশেষ একটিকেই আমরা একমাত্র

কারণ বলে প্রমাণ করতে চাই। যে-সকল কারণে আত্মগোপনের প্রয়াস করেছিলাম, তার প্রধানতম বর্তমানে অর্থহীন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষের অভূতপূর্ব রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে অন্য অনেক পুরাতন বিধি-ব্যবস্থা, অন্তরায় ও অসুবিধার সঙ্গে সঙ্গে তারও অবসান ঘটেছে। সবিস্তারে আজ তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের ভারতবর্ষে শাসন-ব্যবস্থার স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় প্রবল প্রতিহিংসাপরায়ণতার সঙ্গে যাঁদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে তাঁদের পক্ষে তার পরিপূর্ণ অর্থবোধ নিশ্চয়ই কঠিন নয়।

দ্বিতীয় আপত্তি ছিল নিছক ভয়সঞ্জাত। মুদ্রণ সম্পর্কে আমার মনে একটা সাঙ্ঘাতিক শঙ্কা আছে। স্বয়ংবর-সভার রাজকন্যার মতো একমাত্র যোগ্যতমকেই ছাপার অক্ষর সসম্মানে বাসরঘরের ভিতরে নিয়ে যায়, নিষ্করুণ নির্মমতায় বাকী আর সবাইকে অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিতরূপে দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়ে রাখে। সেই ব্যর্থকাম উপহসিতদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে আমার উৎসাহ ছিল না।

তর্কবাগীশদের ঔৎসুক্য ঐখানেই নিবৃত্ত হয় না। তাঁরা ঘাড় নেড়ে সংশয়ের স্বরে বলেন,—তা যেন হলো; কিন্তু ঐ মৃত্যু-সংবাদ রটনাটা কেন?

জবাবে আমি বলি, সেটা রটনা নয়; ঘটনা। সেদিনের পত্রলেখকের যে নিঃশেষে মৃত্যু ঘটেছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। দেহটাই যে বেঁচে থাকার নিদর্শন নয়, মিশরের

মমি তার জ্বলন্ত প্রমাণ। আর দৈহিক মৃত্যুর পূর্বেই যে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটতে পারে, ইতিহাসে তারও নজীর আছে। রাম্‌জে ম্যাক্‌ডোন্যালডের সত্যিকার মৃত্যু কি তাঁর দেহাবসানের অনেক আগেই ঘটে নি?

দিল্লীতে নবাগত যাযাবরকে অদ্যকার লেখকের মধ্যে খুঁজতে যাওয়া পণ্ডশ্রম। ঠিক যেমন বিবাহোত্তর পত্নীর মধ্যে পূর্বরাগের প্রিয়াকে দেখতে চাওয়া বিড়ম্বনা। সেদিনকার রচনার সঙ্গে আজকের লেখা যদি কোনো পাঠক তুলনা করেন, তবে তিনিই আমার প্রতি সবচেয়ে বেশী শত্রুতা করবেন।

অনিচ্ছাকৃত শত্রুতার স্বাদ অবশ্য একেবারে অপরিজ্ঞাত নয়। মিত্রজনের মনোযোগও যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কতখানি অপ্রীতিকর হয়ে উঠতে পারে, তা ইতিপূর্বে জানা ছিল না। আত্মবিলুপ্তির জন্যে আমি যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেম। তাতে লাভ হয় নি। পরিচয় গোপন রয় নি। ফলে, চায়ের নিমন্ত্রণে গেলে যথারীতি পরিচয় আদান-প্রদানের পরে অকস্মাৎ প্রশ্ন শুনতে হয়,—"ওঃ, আপনিই তো সেই—?" আত্মীয়-বাড়িতে বিবাহ-সভায় সদ্যপরিচিতা অতিথিরা বইর নায়ক-নায়িকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু কণ্ঠে বলেন, "আচ্ছা সত্যি কি—"। বন্ধুদের আড্ডায় উৎসাহী সাহিত্যসমালোচকেরা পুস্তকে বর্ণিত বিভিন্ন চরিত্রের অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যা দাবী করেন।

বন্ধুদের উদ্বেগ এর চাইতেও মারাত্মক। তাঁরা শুধু প্রশংসা

করেই নিরস্ত নন। উপদেশদানেও সমা... ...সাহী। পরিচিত, অর্ধ-পরিচিত ও অপরিচিতের দল যখন-তখন বাড়ি বয়ে এসে অযাচিত পরামর্শ দেন। কেউ বলেন, এবার একখানা বড় উপন্যাস লিখুন। কেউ বা বলেন, উপন্যাস নয়,—ছোট গল্প। তাতেই আমার হাত খুলবে। আর এক দলের বিশ্বাস, প্রবন্ধ রচনাই আমার ক্ষেত্র।

অধিকতর হিতাকাঙ্ক্ষীর দল বিষয়-নির্বাচনের ক্লেশ পর্যন্ত নিজেরাই স্বীকার করেন। তাঁরা কেউ বলেন 'দৃষ্টিপাত'-এর দ্বিতীয় খণ্ড লিখতে। কেউ বা বলেন, দিল্লী আর নয়, এবার কলকাতার উপরে একটা বই। হু হু করে কাটবে। সংসারে ডাক্তারের সংখ্যা অগুণতি, সে-কথা আমরা প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো সময়ে উপলব্ধি করেছি। মাথা ধরেছে—একথা বলা মাত্র প্রত্যেক পরিচিত বন্ধুর কাছ থেকেই একটা ওষুধের বা প্রক্রিয়ার নির্দেশ কে না পেয়েছি? সম্প্রতি আবিষ্কার করলেম, এ জগতে সাহিত্যরসিকের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়।

শুধু উপদেশেই শেষ নয়। অনুরোধ এবং অনুযোগও আছে। সদ্যঃপ্রসূত মাসিকপত্রের তরুণ সম্পাদক আসেন লেখার বায়না নিয়ে। রিক্তহস্তে ফিরে যাওয়ার কালে মনে মনে গাল দিয়ে যান, লোকটা পয়লা নম্বরের স্নব। পুরাতন পুস্তক-ব্যবসায়ী আসেন নতুন বইর দাবী নিয়ে। বিফলমনোরথ হয়ে সন্দেহ করেন, নিশ্চয়ই অপর কেউ বেশী পারসেন্ট কবুল করেছে। নূতন প্রকাশক অনুরূপ ব্যর্থতায়

বিরক্তির সঙ্গে সিদ্ধান্ত করেন, এ লেখকের অর্থগৃধ্নুতা মেটানো তাঁর শক্তির বাইরে।

অর্থে আসক্তি নেই যোগী-ঋষির। আমি তাঁদের দলে নই। কিন্তু অর্থের কারণে গ্রন্থরচনা করেন অর্থ-বই লেখকেরা। আমি সে গোষ্ঠীরও বাইরে। নোট লেখা আমার কর্ম নয়। আসল কথা এই যে, আমার লেখার পশ্চাতে কোনো প্রেরণা নেই।

আমি সাহিত্যিক নই। কল্পনাশক্তির যে-প্রাচুর্য কথাসাহিত্যিকের সর্বপ্রধান অবলম্বন, আমার মধ্যে তার বাষ্পমাত্র নেই। নিজকে অসাহিত্যিক প্রমাণের আগ্রহে শরৎচন্দ্র বলেছেন, আকাশের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে তাঁর চোখে ব্যথা ধরে গেলেও, কারও নিবিড় কুন্তলদাম দূরে থাক, একগাছা চুলের আভাস পর্যন্ত কখনও তাঁর চোখে পড়ে নি। শরৎচন্দ্রের খেয়াল হয় নি যে, ঐ বিনয়োক্তি লিপিবদ্ধ করার কালে নিজের অজ্ঞাতেই তিনি অনবদ্য সাহিত্য রচনা করেছেন। কিন্তু আমার পক্ষে এটা নিতান্তই স্বীকারোক্তি। প্রস্ফুটিত পদ্মকোরকের পানে তাকালে কারো কোমল-আননের কথা আমার মনে জাগে না। পদ্মমধুর কথা স্মরণ করে প্রলুব্ধ রসনা জলসিক্ত হয়ে ওঠে।

আমি সাংবাদিক। সাংবাদিকেরা চেষ্টা করলে সাহিত্যসমালোচক বা প্রবন্ধকার হতে পারেন, কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর কথা-সাহিত্যিক হওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। উইনস্টন চার্চিলের গদ্য রচনার স্টাইল যতই মনোহর হোক

না কেন, গ্রেট এক্সপেক্টেশান্‌স তাঁর কাছে দুরাশা, গ্রেট কন্‌টেম্‌পরারীস নিয়েই তাঁর কারবার। সংবাদ-সাহিত্য নামক একটা বস্তু সম্প্রতি এদেশেও দেখা দিয়েছে বটে, কিন্তু সত্যিকার সাহিত্যের পংক্তিতে তার আসন আজও পাকা হয় নি। সেটা বড় জোর,—আর্ট ইন্ ইণ্ডাস্ট্রী।

এর কারণ সুস্পষ্ট। রস-সাহিত্যের সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হওয়ার প্রয়োজন নেই। যা ঘটেছে, তার চাইতে যা ঘটতে পারে তাই নিয়ে তার কারবার। সে-সাহিত্যের জন্মস্থান সাহিত্যিকের মনে। সংবাদ-সাহিত্য একান্তভাবে বাস্তব-সর্বস্ব। যা ঘটেনি, তা তার এলাকার বাইরে। সে-সাহিত্যের সূচনা হয় সাংবাদিকের দেখায়। কথা-সাহিত্য র‍্যাফেলের চিত্র। সংবাদ-সাহিত্য সেসিল বিটনের ফটোগ্রাফ। সাহিত্যিক রচনা করেন আপন মনের প্রকাশ-ব্যাকুলতায়। কেউ পড়বে, কি, পড়বে না, সে-চিন্তা তাঁর পক্ষে অবান্তর। সাংবাদিক রিপোর্ট লেখেন জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে। তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে সহস্র সহস্র পাঠক।

আমার চোখের সামনেও একটি ব্যক্তি আছেন। তাঁর নাম বলা নিষেধ। দিল্লীর পত্রগুলি তাঁকেই লিখিত। আজ যা লিখছি, তাও তাঁরই জন্যে। আমার কাছে তিনি অধিক প্রত্যাশা করেন না। তিনি জানেন, আমি দ্রষ্টা নই, দর্শক। আমি গল্প বানাতে পারিনে, গল্প শোনাতে পারি। বলা বাহুল্য, আমার লেখা তাঁর ভালোই লাগে। প্রশংসা যা

করেন, তাতে আর যাই থাক, অপ্রমত্ত সমালোচকের নিরপেক্ষ বিচারশক্তির প্রমাণ থাকে না। নিশ্চিত জানি, তিনি আমার জীবনী রচনার ভার নিলে আক্ষেপের কারণ ঘটবে না।

অবশ্য মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, কোনো লোকই সম্পূর্ণরূপে পৃথক নয়। মৌলিক হৃদয়বৃত্তির দিক দিয়ে মানুষ মাত্রই এক, অনুভূতির যোগসূত্রে অল্পবিস্তর একের সঙ্গে বহুর সাদৃশ্য আছে। সুতরাং হয় তো এক জনের কাছে যা রুচিকর, পাঁচ জনের কাছেও তা একেবারে বিস্বাদ নয়। বিচিত্র নয় যে, আমার লেখাও সেই একটি লোকের সঙ্গে অন্য আরও দু'-এক জন পাঠকের ভালো লাগবে। অবশ্য ভালো লাগার মাত্রা নিয়ে তারতম্য ঘটা অস্বাভাবিক নয়। মায়ের স্নেহে আর মাসির আদরে তফাৎ তো অবধারিত।

লেখার ইতিহাসটা কিন্তু নিতান্তই সাধারণ। বাংলাদেশের প্রত্যেক পুরুষকেই কোনো এক বিশেষ বয়সে ঘটকের আক্রমণ সইতে হয়। তাদের কেমন করে ঠেকাতে হয়, অভ্যাসের দ্বারা সে-বিদ্যা আমার আয়ত্ত। শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ এবং অনুরাগী পাঠকদের কি করে রুখতে হয়, সে-কৌশল আমার জানা নেই। একমাত্র তাঁদের হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রেরণায়ই একদিন এক বন্ধুর সহায়তায় আমি এই বিরাট নগরীর প্রান্তভাগে এক ক্লাবে যোগদান করলেম।

ক্লাব বস্তুটা এদেশে প্রাচীন বানপ্রস্থের আধুনিক এবং সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। তফাৎ শুধু এই যে, এর জন্যে পঞ্চাশোর্ধ্ব অবধি অপেক্ষা করতে হয় না। ক্লান্ত, মর্মাহত, তৃপ্তিহীন,

লক্ষ্যহীন অভিজাত নরনারীর এটা আত্মবিস্মৃতির অবলম্বন, ইংরেজীতে যাকে বলে এস্কেপ। তাই বেশীর ভাগ ক্লাবেই বিপত্নীক অফিসার, স্বামীপরিত্যক্তা রমণী, বিগতযৌবনা কুমারী, রূপহীনা তরুণী এবং অবিবাহিত প্রৌঢ় ব্যক্তিরা আসর জাঁকান। এঁদের জীবনে সুষমা নেই, অথচ আসক্তি আছে। তাই জীবনকে অপচয় করে এঁরা জীবনকে ভরাতে চেষ্টা করেন— রেসকোর্সে পর-পর উইন-এ হেরে-যাওয়া জুয়াড়ী যেমন সমস্ত ক্ষতি একেবারে পূরণের আশায় প্লেসে-এ দ্বিগুণ বাজী রাখে।

এই ক্লাবটিতেও সে-ধরনের নরনারীর অভাব ছিল না। আর ছিল বিলাত-প্রত্যাগত তরুণ ব্যারিস্টার, নতুন বিত্তশালী ব্যবসায়ী, সদ্য আলোকপ্রাপ্ত মারোয়াড়ী-নন্দনী ইত্যাদি। এই ক্লাবেই আমার প্রথম পরিচয় ঘটল মিসেস মলী সেনের সঙ্গে।

প্রাণী-জগতের মতো নাম-জগতেও যে বিবর্তন আছে, মলী সেন তার জীবন্ত সাক্ষ্য। তাঁর মাতামহ ছিলেন সেকালের বিখ্যাত কবিরাজ। ভৈষজ্যশাস্ত্রে তাঁর যেমন অসাধারণ ব্যুৎপত্তি, সংস্কৃত কাব্যেও তেমনি প্রখর অনুরাগ। দৌহিত্রীর জন্মমাত্রই মাতামহ নামকরণ করলেন, স্রগ্ধামালিনী। কিন্তু এত দীর্ঘ নাম বাণভট্টের কাদম্বরীতে যদি বা শোভা পায়, বিংশ শতাব্দীর গৃহস্থ পরিবারে চলে না। অচিরেই সকলের অলক্ষিতে নামের প্রথমার্ধ

বিস্মৃতির গর্ভে অন্তর্হিত হলো। রইল শুধু মালিনী। সেটা সম্বোধনে সহজ এবং শ্রবণেও মধুর।

মেয়ের জ্যাঠামশায় অবসরপ্রাপ্ত হেডমাস্টার। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে কলেজের ছাত্র ছিলেন। কার্লাইলের লেখা এখনও অনর্গল মুখস্থ বলতে পারেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর পরম ভক্ত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যৌবনে উপনিষদের উপর প্রবন্ধ লিখেছেন। দুর্নীতি সম্পর্কে তাঁর শুচিবাই প্রায় হিন্দু বিধবার আচারপরায়ণতার কাছাকাছি। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পারিবারিক প্রবন্ধ ছাড়া অন্য কোনো বাংলা বই অন্দরমহলে দেখলে তিনি আতঙ্কিত হতেন। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রীর নামে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের গন্ধ আবিষ্কার করে আঁতকে উঠলেন। নাম পালটে করলেন মলিনা।

পরবর্তী সংশোধনের ভার কন্যা স্বহস্তে গ্রহণ করলেন। পরীক্ষার ফিজ দাখিল করার কালে ফর্মে ইংরেজী ধরনে নাম লিখলেন—মলোনী। উত্তরকালে বন্ধু ও ভক্তজনের অন্তরঙ্গ সম্ভাষণে তার সর্বশেষ রূপান্তর ঘটিয়ে সোসাইটিতে আবির্ভূতা হলেন মিসেস মলী সেন। এখানে বলে দেওয়া আবশ্যক যে, বাংলা সাহিত্য-জগতে শেষের কবিতার অমিত রে তখনও জন্মগ্রহণ করে নি।

মলী সেন হচ্ছেন সেই জাতীয় মেয়ে—না, থাক, সে-কাহিনী বর্ণনা না করাই ভালো। তাঁর জীবন-আলেখ্য

তাঁর আপন উক্তি, আচরণ ও কর্মের মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত হোক্‌ জনসমক্ষে। বহু-চরিত্র-সম্বলিত ঘটনা-বহুল সুদীর্ঘ ছায়াচিত্রের মতো। আমার জবানিতে তার ব্যাখ্যা বাহুল্য মাত্র। সবাক চিত্রের তো কমেন্টারী প্রয়োজন হয় না।

আখ্যান

অনাবৃষ্টি, ঝঞ্ঝাবাত ও বন্যা নিতান্তই প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা। এদের উপদ্রব আকস্মিক, ফলাফল অনাকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু আগমন অনিশ্চিত নয় বাংলা দেশে। দোল, দুর্গোৎসবের ন্যায় এগুলিও বাৎসরিক। কখনও বাঁকুড়ায়, কখনও বাখরগঞ্জে, কখনও বা তিস্তা কি দামোদরে। দৈনিক সংবাদপত্রের সচিত্র বিবরণীর মধ্য দিয়ে বহু ব্যাপ্ত ধ্বংসসাধনের সকরুণ কাহিনী দেশ দেশান্তরে পরিচিত।

দৈব দুর্বিপাকে ক্ষতি ঘটে বহুর। সে-ক্ষতি অতি বিস্তৃত। বর্ষার প্লাবনে অকস্মাৎ জলমগ্ন হয় গ্রামের পর গ্রাম, বিনষ্ট হয় স্বল্পবিত্ত জনগণের সমস্ত সম্বল, শস্যনাশে সর্বস্বান্ত হয় ঋণভারজর্জরিত দরিদ্র কৃষককুল। কারো ধন যায়। কারো বা জন। শোকভারাক্রান্ত অসহায় নরনারীর সম্মিলিত কণ্ঠের কাতর অভিযোগ ও ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস নির্মম ভাগ্যদেবতার রুদ্ধ দ্বারপ্রান্তে চরম নিষ্ফলতায় পুঞ্জীভূত হতে থাকে দিনের পর দিন, মাসের শেষে মাস, বৎসরান্তে বৎসর। সেই সর্বব্যাপী দুঃখের তিমিরে শুধু স্বল্পসংখ্যক সেবাব্রতী আপন আপন পরিমিত শক্তি ও সামর্থ্যানুযায়ী আর্তত্রাণের আয়োজন দ্বারা কোনক্রমে জ্বালিয়ে রাখেন মানব করুণার ক্ষীণ দীপশিখা, মর্তলোকে বিধাতার সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ।

কিন্তু সুযোগও আসে কারো কারো। বন্যার্তদের দুঃখে সুচতুর দেশহিতৈষীরা সভা-সমিতিতে সঘন করতালির মধ্যে

প্রচুর অশ্রুপাত ও প্রচুরতর বাগ্‌বিস্তারের দ্বারা খবরের কাগজে নাম ও এসেম্বলীতে আসন পাকা করার ব্যবস্থা করেন। চলমান ট্রামে বাসে পেশাদার চাঁদা-প্রার্থীর দল যাত্রীদের সামনে চাঁদার বাক্স এগিয়ে ধরে বারংবার এবং লাল শালুর কাপড়ে সাদা অক্ষরে ঘোষিত একাধিক সংকটত্রাণ সমিতির সদস্যবৃন্দ হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে ডি. এল. রায়ের একটি অতিপরিচিত সুরে গাঁথা সংগীত সহযোগে দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহে নির্গত হয়।

দুর্গতেরা, অর্থাৎ তাদের নামটা, আরও একটা বিশেষ কাজে লাগে। অভিজাত সম্প্রদায়ের সৌখীন নাট্যাভিনয়ের সেটা বিশেষ সহায়ক।

ধনিগৃহের অফুরন্ত অবসরক্লান্ত সন্তানবিহীনা প্রৌঢ়া রমণী বা আলোকপ্রাপ্তা নব্যা তরুণীদের উৎসাহে অধুনা অধিকাংশ নাচের আসর, ভ্যারাইটি শো বা অভিনয়-আয়োজন হয়। কলেজে প্রক্সি দেওয়া তরুণ ছাত্র, ব্রীফহীন ব্যারিস্টার, পিতৃবিয়োগে হঠাৎ হাতে টাকা-পাওয়া জমিদার-নন্দন ও নারী-সান্নিধ্য-ব্যাকুল আর্ট-ভক্ত বেকার যুবকের দল তার কর্মকর্তা। গেরুয়া বস্ত্রের আবরণে ভণ্ড সন্ন্যাসীর ন্যায় জনহিতৈষণার তিলক ললাটে নিয়ে এদের এই নাট্যপ্রচেষ্টাগুলি ব্যক্তিগত প্রমোদানুষ্ঠানের অকিঞ্চিৎকরতা-মুক্ত হয়ে সৎকার্যের সনন্দ লাভ করে।

উদ্যোক্তারা তাই দুর্ভিক্ষ বা বন্যার শরণ নেন। অভাবে কোনো বিদ্যালয়ের উন্নতি বিধান, মৃত ব্যক্তির স্মৃতিরক্ষা এমন

কি হাতের কাছে সন্তোষজনক আর কিছুই না পাওয়া গেলে সর্বশেষে কন্যাদায়গ্রস্তের উপকারার্থেও অভিনয় এবং টিকেট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। বেশীর ভাগ মন্ত্রীর দেশসেবার মতো এ-সকল সাহায্য-রজনীর সাহায্যটাও লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র। সুতরাং বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থে সম্প্রতি মিসেস মলী সেন যে-নাটকাভিনয়ের প্রয়াস করেছেন, আশা করি তার সার্থকতা নিয়ে অনর্থক গবেষণায় কেউ সময় নষ্ট করবেন না।

অভিনয়টা নিউ এম্পায়ারে হলেই ঠিক মানাতো। সাধারণতঃ তাই হয়। কিন্তু অধুনা সিনেমার চাপে একমাত্র সকালবেলা ছাড়া সেখানে হল্ খালি পাওয়ার জো নেই। সময়টা এ-ধরনের অনুষ্ঠানের পক্ষে খুব উপযোগী নয়। সপ্তাহে একমাত্র রবিবার ছাড়া সে-সময়ে অবকাশ আছে কার? আর রবিবারেই বা সকালে স্কুল-কলেজের ছাত্র ও কিছু সংখ্যক আপিস আদালতের কেরানীবাবু ব্যতীত অভিনয় দেখতে আসবে কে? তাদের মধ্যে এক টাকা দামের উপরে টিকেট কিনবে ক'জন? তার চাইতেও বড় কথা,—সোসাইটির সেরা নর-নারীরাই যদি না দেখল, তবে অভিনয় করে সুখ কোথায়? মলী সেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মুখ বেঁকিয়ে বললেন,—"সকালবেলা থিয়েটার করতে পারব না। সে যেন রাত সাতটায় চায়ের নিমন্ত্রণ কিম্বা জানুয়ারী মাসে ফুটবল ম্যাচ। রিডিক্লাস্।"

এখানে বলে দেওয়া প্রয়োজন যে, মে-জুন মাসে ফুটবলের

মাঠে পশ্চিম দিকের মেম্বারস্ গ্যালারীতে সাদা ফ্রেমের সান্ গ্লাস চোখে আঁটা রঙ্গিন ম্যাকিন্টস হাতে মলী সেনকে প্রত্যহই দেখতে পাওয়া যায়, যদিও সেখানে তার এই নিয়মিত উপস্থিতি কতটা নিছক ক্রীড়ানুরাগপ্রণোদিত আর কতটাই বা ফ্যাশানের তাগিদে তা নিয়ে তাঁর অন্তরঙ্গ বান্ধবীদের মধ্যেও মতদ্বৈধ আছে। এমন কি, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি আড়ালে এমনও বলে থাকেন—"ও তো দেখতে যায় না, দেখাতে যায়।"

অসম্ভব নয়। আপনাকে উদ্ঘাটিত করার প্রেরণা আছে বিশ্ব-প্রকৃতিতে, আছে মানব-চরিত্রে। তাই বীজ আপনাকে অঙ্কুরিত করে বৃক্ষে, তরুলতা বিকশিত হয় ফুলে-ফলে, মানুষ পরিব্যক্ত হয় স্বীয় আচার আচরণে। নিজকে ব্যক্ত করার এই স্বাভাবিক ব্যাকুলতা যখন সহজ ও সুসমঞ্জস হয় তখন তাকে বলি আত্মপ্রকাশ। আতিশয্যের দ্বারা সে যখন কলুষিত হয়, তখন তাকে বলা হয় আত্মপ্রচার। বিকৃত বলেই সেটা ধিক্কৃত।

ইংরেজ কবি বলেছেন, এ জগতটা নাট্যশালা; মানুষ মাত্রই সেখানে জীবন-নাট্যের কুশীলব। মলী সেন বিলাতী কনভেন্টের ছাত্রী ছিলেন, সিনিয়র কেম্‌ব্রিজের বেড়া ডিঙ্গিয়ে সেখানে কলেজে প্রবেশের পথ মেলে। তাই যে-বয়সে বাঙ্গালী ছেলেরা নেস্‌ফিল্ডের ব্যাকরণ মুখস্থ করে, সে-বয়সে তিনি ইংরেজী নাটক পড়েছেন। তাঁর কাছে ঐ কাব্যোক্তি অবিদিত নয়।

কিন্তু তাতে মন ওঠে না। সুবৃহৎ পৃথিবীর বিশাল

নাট্যমঞ্চে কোটি কোটি অভিনেতা অভিনেত্রীর ক্লান্তিবিহীন অভিনয়-পর্বের মধ্যে একটি মাত্র মলী সেনের পার্ট কতটুকু? নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের চরাচর বিস্তৃত সেটের মধ্যে সে তো শুধু একজন 'এক্সট্রা'; সে তো 'স্টার' নয়।

জনতার কোনো বিশেষ ভূমিকা নেই, তাদের অভিনয় নিরবধি কাল এবং বিপুলা পৃথ্বীর অঙ্গীভূত। কোথায় যে তার প্রস্তাবনা আর কোনখানেই বা যবনিকা পতন তা সকলের অলক্ষিত। নায়িকার জন্যে চাই নির্দিষ্ট নাটক—তার পরিধি পরিমিত এবংআরম্ভ ও সমাপ্তি দুই-ই সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। ফুটবল সম্পর্কে যাই হোক না কেন, নাটকে দেখাবার প্রশ্নটাই প্রধান। সে-কথা মলী সেনের জানা আছে। তার জন্যে আবশ্যক যথোচিত মঞ্চ ও প্রেক্ষাগার।

উত্তর কলকাতায় সাধারণ রঙ্গালয় ভাড়া পাওয়া শক্ত নয়। কিন্তু তার কৌলীন্য নেই। সেখানে কাস্টমস্ বা পুলিস ক্লাবের সদস্যদের 'মেবার পতন' বা 'বঙ্গে বর্গী' অভিনয় চলে, যাতে মিহি স্বরের পুরুষেরা নকল চুল মাথায় চাপিয়ে শাহজাদী সাজে। সেখানে অভিজাতদের অভিনয় সম্ভব নয়। স্থানমাহাত্ম্য বলে একটা কথা আছে তো? গুলু ওস্তাগরের গলিতে কি বাড়ি তুলবেন স্যার ধীরেন মুখার্জী? মির্জাপুরের হোটেলে হবে চীফ মিনিস্টারের ডিনার?

তার চাইতে বাড়িতে স্টেজ বেঁধে অভিনয় করা বরং ভালো। তাতে সাহেবপাড়ার থিয়েটার হলের ডিগনিটি না থাকলেও, ডিস্টিংশান আছে। দামী জর্জেটের অভাবে

মোটা খদ্দরের শাড়ির মতো। অন্য লোকের কথা কী, জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একাধিক অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

মলী সেনদের বাড়িটা অতিশয় প্রাচীন। চক মিলানো গড়ন। মাঝখানে বৃহৎ উঁচু দালান। চণ্ডীমণ্ডপ। সেকালে দুর্গাপূজা হতো মহাসমারোহে। সামনে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। সেখানে বসে সমবেত জনতা ভক্তিভরে শ্রবণ করতো মহাষ্টমীর দিনে পূজামণ্ডপে কুল-পুরোহিতের উদাত্ত কণ্ঠে চণ্ডী পাঠ। প্রতি বৎসর রাস পূর্ণিমার রাত্রে যাত্রাভিনয় হতো। 'রাই উন্মাদিনী' পালায় অধিকারী অঘোর সামন্ত নিজে আসরে বসে বৃন্দাদূতীকে ঝাঁপ তালে গানের খেই ধরিয়ে দিতেন— "গোকুল ত্যজি শ্যাম রায়, তুমি এলে মথুরায়, শ্রীরাধিকার প্রাণ যায়, তোমার বিহনে এ-এ-এ।" প্রাঙ্গণের তিন দিকে ঘেরা দালানের দোতলার বারান্দায় চিকের আড়ালে বসে মহিলারা বিরহিণী রাধার দুঃখে ঘন ঘন চোখ মুছতেন। সে দীর্ঘ দিন আগেকার কথা।

মলী সেনের শ্বশুর বৈকুণ্ঠনাথের কুখ্যাতি ছিল অর্থগৃধ্নুতার। পাড়ার ফুটবলের চাঁদাবঞ্চিত ক্রুদ্ধ যুবকের দল তাঁর নামের ঈষৎ পরিবর্তন করে নব নামকরণ করেছিল ব্যয়কুণ্ঠ সেন। তিনি প্রথমে পূজা-পার্বণের আ[illegible]সিক অংশ কাট-ছাঁট করে নেহাৎ অবর্জনীয় শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানটুকু বজায় রাখলেন। যাত্রা হলো বন্ধ, কথকতা গেল উঠে, কাঙালী-বিদায় পেল লোপ।

পূজারও আয়ু বেশী দিন রইল না। সে-বার নবমীর দিনে বলির পশু আটকে গেল খড়্গে। শ্রীধর মাস্টার এ-বাড়িতে খাঁড়া ধরছেন এই বাইশ বছর ; এক কোপে মোষ নামিয়েছেন কতবার। তাঁর হাতে এমন দুর্ঘটনা এই প্রথম। তিনি হাতের অস্ত্র নামিয়ে রেখে, কপালের ঘাম মুছে, প্রতিমার পানে হাত জোড় করে বললেন,—"মা করুণাময়ী, রোষ করিসনে। দেখিস, কর্তার যেন কোনো অমঙ্গল না ঘটে। ভালোয় ভালোয় বছর পার হোক, আসছে বছর জোড়া মোষ মানত রইল তোর পায়ে।"

হায়, একসঙ্গে একাধিক মহিষের রুধিরপানের এমন লোভনীয় সম্ভাবনার প্রতিও মায়ের কিছুমাত্র আসক্তি দেখা গেল না। করুণাময়ীর করুণা রইল সম্পূর্ণই অপ্রকাশ। মাস খানেকের মধ্যে টাইফয়েডের ব্যাপক আক্রমণে মারা গেল পর পর বৈকুণ্ঠের বড় দুই ছেলে। একুশ দিন যমে-ডাক্তারে টানাটানির পর কোনো মতে বেঁচে গেল অবশিষ্ট পুত্র শিবনাথ, পটলডাঙ্গার পুরাতন সেন পরিবারের একমাত্র বংশধর। এই শোচনীয় দুর্ঘটনার সঙ্গে বলিবিভ্রাটে রুষ্টা ভবানীর প্রকৃত সম্পর্ক কতখানি, সে-কথা তিনিই জানেন। কিন্তু শোকে মুহ্যমান বৈকুণ্ঠনাথ রাগ করে বললেন,—"এ-বাড়িতে আর ভগবতীর পাট নেই, এবার থেকে পূজা বন্ধ।"

তারপর থেকে গৃহে আর পাতা হয় নি দেবীর আসন, স্থাপনা হয় নি অর্চনার ঘট। পূজার দালান ব্যবহৃত হয়েছে

বৈকুণ্ঠের ব্যবসায়ের গুদামঘর হিসাবে। পড়তি বাজারে মাল কিনে তিনি সেখানে মজুদ করেছেন উঠ্‌তি বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে। এক পাশে জড়ো-করা জীর্ণ তক্তাপোষ, বাণ্ডিল-বাঁধা পুরানো আমলে বৃহৎ ভোজের দিনে ব্যবহৃত কুশাসনের স্তূপ, ডালাভাঙ্গা টীনের বাক্স, দেয়ালে কলি ফেরাবার পাটের মোটা তুলিসমেত চুণের কেনেস্তারা এবং গৃহস্থালির অন্যান্য বহু পরিত্যক্ত অব্যবহার্য উপকরণ।

সে-সমস্ত দূর করে আজ ক'দিন ধরে থিয়েটারের স্টেজ তৈরী হচ্ছে। ঠেলাগাড়ি বোঝাই আসছে শাল কাঠের তক্তা, বস্তা বোঝাই রঙ্গিন কাপড়, ইলেকট্রিকের তার, বিভিন্ন বর্ণের আলো ও নানাবিধ সাজ-সরঞ্জাম। হাতুড়ি পেরেকের ঠকাঠক্ শব্দে দালানের কার্নিশে অতি পুরাতন বাসিন্দা মালিকহীন পারাবতের দল চকিত, ভীত ও সন্ত্রস্ত চিত্তে ইতস্ততঃ পলায়নরত।

যাঁর উপরে রঙ্গমঞ্চ তৈরীর ভার তিনি রায় দিয়েছেন, এ-বাড়ির সদর দালানটা স্টেজের পক্ষে খুবই উপযোগী। মনে হয়, যিনি বাড়ি তুলেছিলেন তিনি যেন এই অভিনয়ের কথা ভেবেই এমন উঁচু মণ্ডপ ও সামনে প্রেক্ষাগারের উপযোগী প্রাঙ্গণ পরিকল্পনা করেছিলেন।

শুনে মলী সেন খুশি হলেন। সেকেলে ধরনের এই অতি পুরাতন কক্ষগুলিও যে কোনো দিন কোনো উপলক্ষ্যে কাজে লাগতে পারে এ-কথা এই প্রথম তাঁর মনে হলো!

এ-বাড়িটার প্রতি মলী সেনের তীব্র বিতৃষ্ণা ছিল। পনর

বৎসর পূর্বে বৈশাখের এক উৎসব-মুখরিত সন্ধ্যায় বধূবেশে তিনি এই গৃহে প্রথম পদার্পণ করেন। প্রচলিত পঞ্জিকার শুভদিন-নির্ঘণ্টের তালিকা অনুসারে সে-দিনটা অবশ্যই মঙ্গলদায়ক ছিল। কিন্তু পাঁজির নিদান ও ভাগ্যের বিধান যে অনেক ক্ষেত্রেই হাতে হাত দিয়ে চলে না সদ্যবিবাহিত দম্পতির পরবর্তী জীবনে তারই দুঃখজনক প্রমাণ রইল। সে-কাহিনী যাঁরা জানেন তাঁদের কাছে আজ তার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। যাঁরা জানেন না তাঁদের জন্যে স্বল্প পরিসরে সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথেষ্ট নয়। সুতরাং সে-চেষ্টা না করাই ভালো। বরং বাড়ির প্রসঙ্গেই ফিরে আসা যাক।

মলী সেনের বিয়ের বছর পাঁচেক পরে এক ক্রিসমাসের রাত্রিতে ফারপোর ড্যান্স থেকে তাঁকে বাড়ি রেখে আসতে যাচ্ছিলেন সুধাংশু। ডক্টর সুধাংশু মিটার। তিনি চিকিৎসকই বটেন, তবে দেহের নয়, দাঁতের। শিবনাথের অনুজ। অতি দূর সম্পর্কীয়। আত্মীয়তায় মলী সেনের দেবর। হৃদ্যতায় কী তা এক কথায় প্রকাশ করা কঠিন। ইংরেজীতে ফ্রেণ্ড, ফিলসফার য়্যাণ্ড গাইড বলে একটা কথা আছে। তার বাংলা তর্জমা ঠিক জানিনে। জানলে ব্যাখ্যা করা সহজ হতো।

গাড়িতে উঠে সুধাংশু বলল,—"বউদি, তোমাদের এই মান্ধাতার আমলের বালাখানাটা ছাড়বে কবে?"

ঠিক বুঝতে না পেরে মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন,—"কিসের কথা বলছ।"

"আর কিসের? তোমাদের এই পটলডাঙ্গার রাজমহলটির।

আজকের দিনেও যে কোনো ডিসেণ্ট রুচির ভদ্রমহিলা এই ঘিঞ্জী পুরানো নোংরা গলির মধ্যে বাস করতে পারে এ আমার ধারণায়ই আসে না। ভাড়াটে বাড়িতে থাকে এমন সাধারণ চাকুরে, উকীল, প্রফেসারের স্ত্রীরাও তো আজকাল উত্তর কলকাতায় থাকতে চায় না। চৌরঙ্গী পাড়ায় থাকা সবার সাধ্য নয়, তবুও তারা অন্ততঃ লেক রোড কিম্বা সাদার্ন এভেনিউতে বাড়ি খোঁজে।"

মলী সেন ক্ষীণ স্বরে বললেন,—"পুরানো আমলের বাড়ি—"

সুধাংশু বাধা দিয়ে বলল,—"দোহাই তোমার, বউদি, ওটাকে বাড়ি বলো না। সিন্দুক বলতে চাও বলো, এমন কি অতি সম্ভ্রমে দুর্গ বললেও আপত্তি করব না। কিন্তু বাড়ি—কখনই নয়, নেভার।"

এ বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য। মলী সেন নিজে কতদিন সদ্যপরিচিত বন্ধু-বান্ধবকে ঠিকানা দিতে গিয়ে অস্বস্তি বোধ করেছেন। লাউডন স্ট্রীট, মালিন পার্কের ড্রয়িং রুমে বসে রামধন মিস্ত্রী লেনের নাম উচ্চারণ করতে হলে স্বভাবতঃই লজ্জায় অধোবদন হতে হয়।

"তোমার কথা সত্যি। আমি নিজেও যে এই দ্বাপর যুগের বাড়িটাতে একেবারে আনন্দে গদ গদ হয়ে আছি, তা ভেবো না। কিন্তু সাহেবী পাড়ায় বাড়ি পাচ্ছি কী করে?" বললেন মলী সেন।

"অন্য আর দশজনে যেমন করে পায়। হয় ভাড়ায়, নয়

কিনে। এ দুটোর একটাও না হলে তৃতীয় পন্থা আছে, সেটা সব চেয়ে ভালো,—নিজেরা তৈরী করে।” জবাব দিল সুধাংশু।

“বাড়ি তৈরী করা কি চারটিখানি কথা? তার কত ঝামেলা।”

“টাকা ঝমঝমালে ঝামেলা থাকে না। শিবুদা একবার মুখের কথাটি বের করুন দেখি, সাতদিনে তোমাদের বাড়ির জায়গা কিনে সাত মাসে বাড়ি তুলিয়ে দিতে পারি কিনা দেখো।”

শিবুদার অনুমতি সময়সাপেক্ষ। দেবর আর ভ্রাতৃজায়া মিলে পরামর্শ করলেন দিন দুই, গাড়ি চেপে দালালের মারফতে এখানে ওখানে জায়গা দেখলেন দিন দশেক।

এখন চৌরঙ্গীর আর সেই পুরাতন আভিজাত্য নেই। পাট কোম্পানীর সাহেব, বিলাতী ডিগ্রিওয়ালা স্ত্রীরোগের ডাক্তার ও রেডিওলজিস্টরা সে অঞ্চলে ফ্ল্যাট নিয়ে তার কুলীনত্ব অনেকখানি ঘুচিয়েছে। ময়রা স্ট্রীট বা উড স্ট্রীট এখন আর ফ্যাশান নয়। এখনকার খাঁটি অভিজাত পল্লী—আলিপুর।

পোর্টল্যাণ্ড পার্কে জমি পছন্দ হলো মলী সেনের। ব্যালার্ডি টমসন-ম্যাথুসকে দিয়ে প্ল্যান করানো হলো বাড়ির। সর্বাধুনিক এমেরিকান রীতির স্ট্রীমলাইনড ডিজাইন। স্পেগলার থেকে আসবে বাড়ির লিফট্, ফিলিপস থেকে ফ্লুরেসেণ্ট বাতি এবং স্যাঙ্কস্ থেকে স্যানিটারী ফিটিংস। বার্ডস্

করবে ফ্লোর, ল্যাজারাস দেবে ফার্ণিচার। বসার ঘরে দেয়ালে দেয়ালে ছবির ডিজাইন করবেন যামিনী রায়। বাকী রইল শুধু গৃহকর্তাকে বলা। টাকার প্রয়োজনে।

প্রত্যহ সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে কিছুক্ষণ ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজ করার অভ্যাস আছে শিবনাথের। দিবাভাগে ক্রেতা-বিক্রেতার আনাগোনায় ও অন্যান্য কাজের তাড়ায় কোনো কিছুতে নিরবচ্ছিন্নরূপে মন দেওয়ার উপায় থাকে না। নিশীথে নিজকক্ষের নিভৃত আবেষ্টনে ধীর চিত্তে হিসাবপত্র পরীক্ষার সুযোগ মেলে। সে-দিন তাতে বাধা পড়ল। মলী সেন এসে বললেন,—"একটা দরকারী কথা আছে।"

তা না বললেও চলতো। দরকার না থাকলে সন্ধ্যাকালে মলী সেন সিনেমায় বা ক্লাবে না গিয়ে বাড়ি থাকবেন কেন? দরকারটা যে শিবনাথের নয়, তাও অনুমান করতে কষ্ট হয় নি। লেজারের পাতা থেকে মুখ তুলে স্ত্রীর পানে তাকিয়ে শিবনাথ জিজ্ঞাসা করলেন—"কী ব্যাপার"?

ব্যাপার,—নতুন বাড়ি।

মলী সেন চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। এ-বাড়ি পরিত্যাগের সংকল্প, সাহেবী পাড়ায় নতুন গৃহ নির্মাণের অভিজ্ঞতা, তার জন্যে স্থান অন্বেষণ, জমি নির্বাচন, নক্সা তৈয়ার ইত্যাদি সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। টেবিলের উপরে প্ল্যান খুলে সযত্নে ব্যাখ্যা করে বোঝালেন, কোনখানে হবে শয়নকক্ষ, কোথায় হবে অতিথির ঘর, কত বড় হবে ড্রয়িং-রূম, কত দূরে থাকবে গ্যারেজ ও ভৃত্যদের বাস-ব্যবস্থা ইত্যাদি

বলতে বলতে উৎসাহে, উত্তেজনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিলেন মলী সেন।

শিবনাথ সমুদয় প্রস্তাব অখণ্ড মনোযোগে শুনলেন, সযত্নে প্ল্যানটি দেখলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন,—"নতুন বাড়ি কার জন্যে ?"

হায় অদৃষ্ট! সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পাঠান্তে অবশেষে প্রশ্ন করে কি না "সীতা কার পিতা!"

এর পরে সংযম রক্ষা করা অন্য যে-কোনো মহিলার পক্ষেই শক্ত হতো। কিন্তু মলী সেন আজ স্থির করেছিলেন কিছুতেই ধৈর্যচ্যুত হবেন না। গম্ভীর স্বরে উত্তর করলেন,—"আমার—মানে, আমাদের জন্যে।"

শিবনাথ সংক্ষেপে বললেন,—"তোমার জন্যে যদি হয়, করতে পারো। আমাদের জন্যে যদি হয়, তবে প্রয়োজন নেই।"

"তার মানে ?"

"খুব সহজ। আমি তো এখানেই বেশ আছি।"

"কিন্তু আমি যে এখানে সুখী নই, তা জানো ?"

"জানি। কিন্তু সুখ কি আছে রাজমিস্ত্রীদের ঝুলিতে ? নতুন বাড়িতে গেলেই কি সমস্ত দুঃখ দূর হবে ?"

"না, হবে না। তবে নিজের পছন্দ মতো একটা বাড়িতে বাস করছি, অন্ততঃ সেটুকু তো জানব।"

"বেশ তো, তুমি নতুন বাড়িতে থাকতে চাও, থাকো। আমি বাধা দেব না।"

ধৈর্যের বাঁধ বুঝি আর থাকে না। বহু কষ্টে আত্মসংবরণ

করে অবজ্ঞামিশ্রিত কণ্ঠে বললেন মলী সেন,—"বাধা দিতে চাইলে যেন বাধা দিতে পারতে। তুমি জানো আমি কারো বাধাই মানিনে, তোমার তো নয়ই।"

শিবনাথ নিরুত্তরে আপন খাতাপত্র টেনে নিয়ে পুনরায় হিসাব পরীক্ষা কার্যে মনোনিবেশের উদ্যোগ করলেন।

এ-ভঙ্গিটুকু মলী সেনের অজানা নয়। বিতর্কের মধ্যপথে অকস্মাৎ এরূপ মৌনতার দ্বারা অপ্রীতিকর বাদানুবাদের পরিসমাপ্তি ঘটানো শিবনাথের একটি পরিচিত পুরাতন কৌশল।

কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গের একটা চূড়ান্ত পরিণতি না ঘটিয়ে মলী সেন আলোচনা বন্ধ করতে প্রস্তুত নন। তাই তিনি উদ্গত ক্রোধ দমন করে যথাসম্ভব শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন,—"তোমার আপত্তি কী কারণে? জায়গাটা কি পছন্দ নয়?"

খাতায় নিবদ্ধদৃষ্টি শিবনাথ উত্তর দিলেন—"এর চেয়ে ভালো জায়গা কলকাতায় খুব বেশী পাওয়া যাবে, মনে হয় না।"

"তবে?"

শিবনাথ নিরুত্তরে পেন্সিল চালনা করতে লাগলেন ডেবিট-ক্রেডিটের অঙ্কে।

উত্তরের প্রত্যাশায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পুনরায় প্রশ্ন করলেন মলী সেন,—"বাড়ির প্ল্যানটা ভালো নয়?"

"প্ল্যানে তো কোনো দোষ দেখছিনে, ডিজাইনটি চমৎকার, ড্রয়িংও নিখুঁত।"

"তা হলে ?"

"বলেছি তো, তুমি নিজে থাকতে চাও তো বাড়ি সুরু করে দাও। কনট্রাক্ট দেওয়ার আগে এস্টিমেটটা একবার আমাদের দোকানের এঞ্জিনীয়রকে দেখিয়ে নিও, কোনো ভুল-চুক থাকবে না।"

"দেখ, এ-বাড়ি তৈরী তোমার ইচ্ছা নয়, সে-কথা অত ঘুরিয়ে বলার দরকার কি ? সোজাসুজি বলার সাহস নেই কেন ?"

শিবনাথ উত্তর দিলেন না, আপন মনে হিসাব পরীক্ষায় ব্যাপৃত রইলেন। সাহসের কথাটা না তোলাই ভালো ছিল। সে-কথা মলী সেনও মনে মনে জানেন। যদিও মুখে স্বীকার করেন না। কথা উঠলে বলেন,—"একে সাহস বলে না, বলে গোঁয়ার্তুমি, পিগ্‌হেডেডনেস।"

মিনিট দুই অপেক্ষান্তে মলী সেন আপন অভিযোগের পরিশিষ্ট হিসাবে বললেন, "স্বামী স্ত্রী দুজন আলাদা বাড়িতে থাকলে আর পাঁচজনে যে তার কী ব্যাখ্যা করে, তা তুমি বোঝ না এমন নয়। তুমি থাকবে পটলডাঙ্গার বাড়িতে আর আমি থাকবো পোর্টল্যাণ্ড পার্কে—লোকনিন্দায় তা হলে কান পাতা যাবে কোথাও ?"

টাকা আনা পাইর অঙ্কে লাল পেন্সিলের টিক দিতে দিতে প্রায় স্বগতোক্তির মতো অনুচ্চ কণ্ঠে শিবনাথ বললেন, "লোকনিন্দার কথা ভেবেই কি আমরা সব সময়ে সব কাজ করি ?"

" 'আমরা' মানে আমি তো ? না করিনে। যে-নিন্দা অকারণ, যে-নিন্দার পেছনে থাকে অক্ষমের ক্ষোভ আর বঞ্চিতের ঈর্ষা, তাকে আমি কেয়ার করিনে। আমি ক্লাবে পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে ব্রিজ খেলি বা রেসে যাই বলে তোমার যে সকল মাসি, পিসি, দিদি, দিদিমার দল দু'বেলা আমার অখ্যাতি না করে জল স্পর্শ করেন না, তাঁদের আমি বরাবর অগ্রাহ্য করব। কিন্তু আমি একা একটা ভিন্ন বাড়িতে বাস করলে কেউ যদি অপ্রিয় কিছু বলে, তাকে দোষ দেব না।"

"অর্থাৎ যিনি আসামী তিনিই বিচারক হয়ে রায় লিখবেন। আদালতে—"

অসহিষ্ণু স্বরে বাধা দিয়ে মলী সেন বললেন,—"তোমার ও-সব আইন আদালতের ব্যাখ্যান রাখো। তুমি যে ল' ক্লাশে কিছুদিন পড়েছিলে তা অত ঘটা করে প্রমাণ না করলেও চলবে। তা নিয়ে কিছু কম কাণ্ড হয় নি যে, পুরানো বলেই সে-কাহিনী আজ ভুলে যাবো। তুমি কষ্ট করে শুধু এইটুকু বলো যে, এই পুরানো অন্ধকার কুঠরি ছেড়ে তুমি নতুন বাড়িতে বাস করতে রাজী আছ কি না ?"

"কষ্ট করে নয়, স্পষ্ট করেই বলছি,—এ-বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র বাস আমার ইচ্ছা নয়।"

কণ্ঠে দৃঢ়তার অভাস। ভঙ্গিতে চরম সিদ্ধান্তের লক্ষণ।

মলী সেন চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে উচ্চ কণ্ঠে বললেন,—"তা হবে কেন ? জমির বায়না দেওয়া হয়েছে, মালিক কাল আসবে পুরো টাকা নিতে, পরশু সেল-ডিড

রেজেস্ট্রি হবে। এখন তা'কে বলতে হবে, জমি কেনা হবে না, কেন না আমার স্বামীকে না জানিয়ে এতদূর এগিয়েছিলেম। এখন দেখছি, তাঁর মত নেই। লজ্জায় মাথা কাটা যাবে আমার। আমাকে জব্দ করার এত বড় সুযোগ কি তুমি হাতে পেয়ে ছাড়তে পারো? তোমাকে কি আমি পাঁচ বছরেও চিনি নি?"

শিবনাথ এবার খাতা বন্ধ করে স্ত্রীর পানে তাকিয়ে বেদনাক্লিষ্ট কণ্ঠে বললেন,—"সেটাই সত্যি, মলী, এই পাঁচ বছরে তুমি আমাকে এতটুকুও চেন নি। চিনতে চাও নি। কিন্তু সে-কথা থাক। তুমি যে জমির বায়না করেছ তা তো এতক্ষণ আমাকে বলো নি। আমি এ-বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র বাস করব না। তোমার ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করার অভিপ্রায়ে নয়। এই বাড়ি আমার পিতামহের নিজের হাতে গড়া। এ-বাড়িতে আমার মা একদিন লাল চেলী পরে সিঁথিমৌর মাথায় বউ হয়ে এসেছিলেন। দেহান্তে এই বাড়ি থেকেই তাঁকে দাহ করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে শ্মশানে। এই বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন আমার কত প্রিয় পরিজন। এই বাড়ির প্রতি ধূলিকণায় জড়িয়ে আছে আমার ভাইদের স্পর্শ, বোনেদের চিহ্ন, বাবার স্মৃতি। কিন্তু কথা যখন দেওয়া হয়েছে, জমি নিশ্চয়ই কেনা হবে।"

মলী সেন বললেন,—"থাক, তোমাকে দয়া করতে হবে না। আমার নিজের গহনা বিক্রি করলে অন্তত হাজার পঞ্চাশ টাকা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। সে-টাকা দিয়ে আপাতত জমির দাম

আমি দিতে পারব। তোমার কাছে জীবিত স্ত্রীর অনুরোধের চাইতে যখন মৃত পিতামহের স্মৃতিই বেশী মূল্যবান—”

শিবনাথ বাধা দিয়ে বললেন,—“মূল্য কম বেশী নিয়ে কথা নয়, মলী, সেন্টিমেন্টের কথা। ... যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না, হৃদয় দিয়ে বুঝতে হয়। এ-বাড়ি আমাদের পয়মন্ত। এ-বাড়ি তৈরীর পরেই নানাভাবে ঠাকুর্দা মশায়ের সৌভাগ্য বেড়েছে, এ-বাড়িতে থেকে বাবা ব্যবসায়ে আশাতীত উন্নতি করেছেন।”

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মলী সেন মন্তব্য করলেন,—“আধুনিক কালেও যে, কোনো পুরুষ মানুষের এমন কুসংস্কার, সুপারস্টিশন থাকতে পারে তা জানা ছিল না। বসত বাড়ির উপরে ব্যবসায়ে সাফল্য নির্ভর করে—একথা যে বিশ্বাস করে তার পাড়াগাঁয়ে থাকা উচিত ছিল।”

“বোধ হয় তাই। কিন্তু সুপারস্টিশন তো কেবল পুরুষেরই মনোপলি নয়। বাড়ির সামনের রাস্তাটার নামের উপরই যে বাড়ির ভিতরের মানুষগুলির দাম নির্ভর করে, সে তো মেয়েরাই বিশ্বাস করে এবং এই আধুনিক কালেই।”

রোষে মলী সেনের সর্বাঙ্গ দগ্ধ হতে থাকল। কিন্তু মুখে যথোচিত কঠোর অথচ যোগ্য প্রত্যুত্তর যোগাল না। কোনো কথা না বলে ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে ঝড়ের বেগে নিষ্ক্রান্ত হলেন শিবনাথের কক্ষ থেকে।

তারপরে ক্রমান্বয়ে সপ্তাহখানেক ধরে একাধিকবার চেষ্টা করেছেন। পর্যায়ক্রমে যুক্তি, তর্ক, অনুরোধ, অনুনয়,

অনুযোগ, তিরস্কার ও অশ্রুধারা প্রয়োগ করেছেন মলী সেন। শিবনাথ অবিচল। তাঁর ঐ এক কথা,—"আমরা এ-বাড়ি ছাড়লে লক্ষ্মীও আমাদের ছাড়বে।

পরাজিত হয়ে অবশেষে হাল ছেড়েছেন মলী সেন। সে-জমি কেনা হয়েছে। পরিবর্তিত প্ল্যানে সেখানে বৃহৎ চারতলা বাড়ি উঠেছে সে-বছরই। তাতে বারোটা ফ্ল্যাট। বাংলা গভর্নমেন্টের সেক্রেটারী, পোর্ট ট্রাস্টের বড় সাহেব, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের এজেন্ট প্রভৃতি ক্লাইভ স্ট্রীটের রথী মহারথীরা সেগুলিতে বাস করেন। প্রতি মাসের পহেলা তারিখে শিবনাথের কারেণ্ট একাউণ্টে প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা ভাড়া জমা হয়।

তিক্ত স্মৃতি মনে রেখে লাভ নেই, আছে মনস্তাপ। মলী সেন তা জানেন। কিন্তু বিস্মরণ তো মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। নতুন জুতার ফোস্কা যেমন প্রতি পদক্ষেপেই পথচারীকে পায়ের ক্ষতস্থানের কথা বেদনার সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকে, তেমনি পটলডাঙ্গার সেই পুরাতন বাড়িতে বিতৃষ্ণ অবস্থিতি ক্ষণে ক্ষণে মলী সেনের মনে আনে সেদিনকার সেই পরাভবের অপমান। তার বেদনা গভীর। জ্বালা দুঃসহ।

সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে নাটককে বলে দৃশ্যকাব্য। বাংলা থিয়েটার যাঁরা দেখেন, তাঁরা জানেন, বাংলা নাটকে কাব্য

আছে সামান্যই, দৃশ্য আছে যথেষ্ট। সেগুলি সব সুদৃশ্য হলে ক্ষোভ ছিল না।

অভিনয়ে দৃশ্যপট ব্যবহারের 'প্রবল বিরোধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেটা অপ্রত্যাশিত নয়। তাঁর নাটক সবই কাব্যপ্রধান। কবিতা ছিল তাঁর জীবন-ধর্ম। যা লিখেছেন তা-ই হয়েছে কাব্য। এমন কি, শিশুশিক্ষার সহজ পাঠেও তার প্রকাশ। বলা যায় না, হয়তো তিনি শুভঙ্করের ধারাপাত নূতন করে লিখলে তাতেও কাব্যের স্বাদ পাওয়া যেত।

কবির বিশ্বাস, অভিনয় ব্যাপারটা গতিশীল। দৃশ্যপটগুলো স্থাণু। জীবন্ত মানুষের আবৃত্তি, সঙ্গীত ও নৃত্যলীলার সম্মিলিত সচল অভিব্যক্তির পথে সেগুলি অচল বিঘ্নস্তূপ। সযত্নে পরিত্যজ্য। অভিনয়ের পরিপূর্ণ উপভোগ দর্শকের কল্পনার উপরে দাবি রাখে। চিত্রিত পট ও নির্মিত দৃশ্য তার সেই কল্পনাশক্তিকে পদে পদে ব্যাহত করে।

মলী সেন কবি নন। নিজকে ইন্টেলেকচুয়াল বলেও কোনো দাবি করেন না। কিন্তু সহজাত বুদ্ধি ইংরেজীতে যাকে বলে কমনসেন্স, সেটা তীক্ষ্ণ। লোকচরিত্রে গভীর জ্ঞান নেই বটে, কিন্তু নিজ গোষ্ঠীর মানুষগুলিকে ভালো করেই চেনেন। জানেন, এদের পুরুষেরা বড় চাকরি করে, মোটা মাইনে পায়। মেয়েরা দামী গাড়ি চড়ে, ভারি গহনা গড়ায়। আর যাই করুক, এরা জেমস জয়েস পড়ে না। থার্ড প্রোগ্রামের নাম শুনলে থার্ড ডিগ্রির কথা ভেবে আঁতকে উঠতে পারে। এদের জন্যে চাই অন্য ব্যবস্থা।

রবীন্দ্রনাথেরই লেখা উদ্ধৃত করে মলী সেন বলেন,—"সংসারে বেশীর ভাগ লোকই ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছেন পা-ঝাড়া দিয়ে ; পিতামহের চারটে মুখ আছে শুধু বড় বড় কথা বলার জন্যে। তাদের জন্যে গাছে জল দেওয়ার দৃশ্যে শকুন্তলার হাতে শুধু জলের ঝারি দিলেই যথেষ্ট নয়, ডালপালা সুদ্ধ গাছের গুঁড়িটাকেই স্টেজের উপর খাড়া করা চাই।"

কথাটা মিথ্যা নয়। আমাদের দর্শকেরা সিনেমা দেখতে গিয়ে চায় গান, নাটক দেখতে গিয়ে ম্যাজিক। তাই সিনেমার কুন্দনন্দিনী যদি বিষ খেতে খেতে একখানা করুণ-রসাত্মক গান না ধরে, তবে সে শুধু নিজেই মরে না, সঙ্গে সঙ্গে ছবির প্রযোজককেও মারে। প্রাণে নয়, ধনে। থিয়েটারের ইন্দ্র যদি দর্শকদের চোখের সামনে রথে চেপে স্টেজ থেকে শূন্যে না মিলিয়ে যায়, তবে অচিরে প্রেক্ষাগৃহটিই শূন্য হওয়ার আশঙ্কা।

আজকের অভিনয়ে স্টেজে গাছের গুঁড়ি খাড়া করার ভার যিনি নিয়েছেন, ইংরেজী অক্ষরে তাঁর নামের উচ্চারণ 'রয়'। আসলে অবশ্য গাছের গুঁড়ি নয়,—সমুদ্রে ভাসমান প্রমোদ-তরণী। কারণ অভিনয়ের পালাটি অভিজ্ঞানশকুন্তলম নয়,—স্বপনকুহেলী। এতে তরু-আলবালে বারিসিঞ্চনরতা সখিপরিবৃতা শকুন্তলার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না ; দেখা যাবে জ্যোৎস্না-রজনীতে সমুদ্রবক্ষে বীণাবাদিনী রাজকন্যা মঞ্জুশ্রীকে।

ম্যাসাচুসেট থেকে ডিগ্রি ও ওয়েস্টিং হাউস থেকে ট্রেনিং

নিয়ে মিস্টার এন. সি. রয় অর্থাৎ শ্রীমান নিখিলচন্দ্র রায় বর্তমানে স্থানীয় এক নামজাদা এমেরিকান কোম্পানীর রেসিডেণ্ট ডিরেক্টার। কিন্তু সোসাইটিতে এঞ্জিনীয়র বলে তাঁর পরিচয়টা সত্য হলেও আংশিক মাত্র। এ যেন ইংলণ্ডের রাজনীতিতে উইনস্টন চার্চিলের পরিচয় দিতে বলা,—লীডার অব দি কন্‌সারভেটিভ পার্টি।

নিখিল রায়ের স্কন্ধ মোটেই বৃষের ন্যায় নয়, তাঁর ভুজদ্বয়কেও ঠিক শালপ্রাংশু বলা চলে না। বস্তুতঃ, কালিদাসের শ্লোকের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে গেলে তাঁকে দিব্যকান্তি বলা কঠিন। তবুও গণ্ডে কয়েকটি বসন্তের গুটিচিহ্ন বাদ দিলে বাঙ্গালী হিসেবে মোটামুটি তিনি সুপুরুষ, একথা একমাত্র স্বভাবনিন্দুক ব্যতীত আর সবাই স্বীকার করে। টেনিসে সুমন্ত মিশ্র বা দিলীপ বোসের পরেই তাঁর র‍্যাঙ্কিং হবে এমন সম্ভাবনা নিশ্চয়ই নেই। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ত্ব'তিন বারই তিনি সেমিফাইন্যাল অবধি উঠেছেন। ক্লাব টুর্নামেণ্টে কাপ পেয়েছেন একাধিক। বিলিয়র্ডে অনায়াসে তিনি নব্বই-এর কাছাকাছি ব্রেক করতে পারেন।

তাঁর জনপ্রিয়তার চূড়ান্ত প্রমাণ এই যে, একাদিক্রমে তিন বছর তিনি ক্লাবের সম্পাদক নির্বাচিত হওয়া সত্বেও সদস্যদের মধ্যে কেউ পদত্যাগ করে নতুন ক্লাব গড়ার উদ্যোগ করে নি।

নিখিলের চরিত্রে আর একটি বিস্ময়কর বিশেষত্ব সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। তিনি একজন সুদক্ষ অভিনেতা। স্বপনকুহেলীর নায়িকা সিংহল রাজকুমারী মঞ্জুশ্রীর ভূমিকায়

মলী সেন। নায়ক তাঁরই প্রণয়মুগ্ধ বিদেশী রাজকুমার ইন্দ্রজিতের অংশে—নিখিল রায়। বন্ধুবান্ধবীরা ঠাট্টা করে বলেন,—"গ্রিয়ার গার্সন অ্যাণ্ড ওয়াল্টার পিজন। একেবারে স্টার কাস্ট।"

অভিনয় নিখিলের নেশা, এ্যঞ্জিনীয়রিং তাঁর পেশা। ছুটোতেই তাঁর পারদর্শিতার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ দিতে বদ্ধপরিকর নিখিল আলোর মালায় ছেয়ে দিয়েছেন অভিনয়-মঞ্চ। মানবদেহে শিরা-উপশিরার মতো অসংখ্য দীর্ঘ বৈদ্যুতিক তার যোজনা করেছেন স্টেজের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। বৃহদাকার আর্ক ল্যাম্পগুলি ঝুলছে উপর থেকে। বিভিন্ন সুইচ নিয়ন্ত্রণে সেগুলির বিচ্ছুরিত আলোক-বন্যায় প্লাবিত অভিনয়-মঞ্চে কখনও দেখা যাবে রৌদ্রোজ্জ্বল দিবা দ্বিপ্রহর, কখনও আভাস দেবে অস্তগামী সূর্যকিরণে রক্তিম আসন্ন সন্ধ্যার, কখনও বা সৃষ্টি করবে শুক্লা রজনীর মৃদুস্নিগ্ধ চন্দ্রালোক। প্রয়োজন মতো সমস্ত আলো নিবিয়ে দিয়ে গভীর অন্ধকারে ঢেকে দেওয়া যাবে সমগ্র মঞ্চপীঠ।

অভিনয়ের সর্বশেষ অঙ্কে আছে, সবেগে আন্দোলিত রাজপুত্রের তরুণী ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গাঘাতে ভেসে যাচ্ছে কূল থেকে অকূলে, চোখের সমুখ থেকে দৃষ্টির অন্তরালে। প্লাইউড, কার্ডবোর্ড ও টিনশিট দিয়ে তৈরী হয়েছে ময়ূরপংখী নৌকা। তার তলদেশে গোলাকার ক্যাস্টর আঁটা। অদৃশ্য দড়ির সাহায্যে দুলে দুলে চলবে কৃত্রিম জলের উপর কৃত্রিম তরণী—সত্যিকার জলযাত্রার ভঙ্গিতে।

সমুদ্রের ঢেউ, তার গর্জন, তরণীর আন্দোলন ও গতি সমস্তই সৃষ্টি করা হবে বৈদ্যুতিক শক্তির সহায়তায়। তার জন্যে স্টেজের নীচে বসানো হয়েছে বিভিন্ন অশ্বশক্তিবিশিষ্ট ছোট বড় গুটিকয়েক মোটর এবং একটি কনভার্টার। আনা হয়েছে নানা আকৃতির রেল, নানা মাপের রোলার, ছোট বড় কপিকল, দাঁতওয়ালা চাকা, সরু-মোটা শিকল, লোহার স্প্রিং, কাঠের হাতল ইত্যাদি অগণিত যন্ত্রপাতি ও ও সাজসরঞ্জাম।

একটার পর একটা সুইচ টিপে শেষবারের মতো সমস্ত বৈদ্যুতিক কৌশলগুলি পরীক্ষা করে দেখছিলেন এবং দেখাচ্ছিলেন নিখিল। উৎসাহের আতিশয্যে ক্ষিপ্র তাঁর ভঙ্গি, আত্মতৃপ্তির অভিব্যক্তি তাঁর মুখে, চোখে, সর্বাঙ্গে।

নিজের পরিকল্পনার সার্থক রূপায়নে আত্মপ্রসাদ লাভ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু নিখিলের বর্তমান উৎসাহ ও আনন্দের কারণ কেবলমাত্র নিজস্ব এঞ্জিনীয়রিং বুদ্ধির প্রশংসনীয় পরিচয় নয়। যাঁকে দেখাচ্ছেন সেই বিশেষ ব্যক্তিটির উপস্থিতি এবং আগ্রহও নিখিলের মনে কম প্রভাব বিস্তার করে নি। সুইচ বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে মলী সেন প্রত্যেকটি আলোক নিয়ন্ত্রণের কৌশল এমন গভীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন যে, তাতে যে-কোনো বিশেষজ্ঞের মনেই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা জাগে। মাঝে মাঝে একটি দুটি প্রশ্নের দ্বারা মলী সেন ব্যাখ্যাকারীর সেই উৎসাহকে আরও বাড়িয়ে তুলছিলেন। স্বল্পপরিসর স্থানে কাছাকাছি

দাঁড়িয়ে বিভিন্ন স্যুইচ, গিয়ার, লিভার ও [illegible] টিপে, টেনে, খুলে বা বন্ধ করে দেখাতে গিয়ে উৎসাহে উদ্দীপ্ত নিখিলের হাত মাঝে মাঝে অতর্কিতে মলী সেনের হাতের আঙ্গুল বা বাহুর একাংশ স্পর্শ করছিল।

সমস্ত বোঝানো ও দেখানো শেষ হয়ে গেলে মলী সেন বিস্ময় ও আনন্দে স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

ক্ষণেক অপেক্ষা করে নিখিল প্রশ্ন করলেন, "কেমন হয়েছে বলুন, মিসেস সেন।"

মলী সেন কিছু না বলে শুধু একবার নিখিলের পানে তাকালেন। বলার প্রয়োজন ছিল না। তাঁর চোখের উজ্জ্বল চাহনি, তাঁর আননে আনন্দের আভা, তাঁর অধরে পরিতৃপ্তির ঈষৎ হাস্যরেখা যে-কোনো উচ্ছ্বসিত প্রশংসার চাইতে মুখরতর। নিখিলের অক্লান্ত পরিশ্রমের পরিপূর্ণ পুরস্কার।

পুনরায় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে নিখিল জিজ্ঞাসা করলেন,—"কী ভাবছেন?"

স্মিত মুখে মলী সেন উত্তর করলেন, "কিছু না।"

"কিছু না কী রকম! চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, চুপ করে ভাবছেন।"

"চুপ করে আছি, তা দেখতে পাচ্ছেন বটে; কিন্তু ভাবছি দেখছেন কেমন করে?"

"বাঃ রে, চুপ করে আছেন বলেই মনে হচ্ছে ভাবছেন। নইলে ভাবনা কি আর চোখে দেখা যায়?"

"যায় না বুঝি? যাক, বাঁচালেন। ভাগ্যিস পুরুষ

মানুষের দৃষ্টিশক্তিটা খাটো। আমরা মেয়েরা কিন্তু আপনাদে ভাব এবং ভাবনা দু'ই দেখতে পাই। কী, হাসছেন যে বড় বিশ্বাস হচ্ছে না? এঞ্জিনীয়র মানুষ, হাতে কলমে পরীক্ষ না করে কিছুই মানতে চান না! আচ্ছা আপনি এখন কঁ ভাবছেন বলব? শুনতে চান? থাক, থাক, আপনাকে অমন রাঙা হয়ে উঠতে হবে না। ভয় নেই। আমি বলছি না।"

হেমন্তে সুপক্ক ধান্যের সুরম্য ক্ষেত্রের উপরে হঠাৎ এ ঝলক স্বর্ণাভ রৌদ্রের মতো মলী সেনের মুখে চোখে এক নিঃশব্দ কৌতুকোজ্জ্বল হাস্যোচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ল।

বিব্রত নিখিল কী করবেন, কী বলবেন ভেবে না পে নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইলেন। অকারণেই তাঁর ললাটে স্বেদবি সঞ্চারিত হতে থাকল।

বৈদ্যুতিক তার বা সুইচ ইত্যাদির সংস্পর্শে পাছে কা কোনো বিপদ ঘটে সেজন্যে সুইচ বোর্ডটি স্বভাবতঃই স্টেজে এমন একটি নিভৃত অংশে রাখা হয়, যেখানে একমাত্র অভি ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো উপস্থিতি বা যাতায়াতে সম্ভাবনা নেই। যেহেতু এ-ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ব্যবহৃত বিদ্যু অপেক্ষা উচ্চতর শক্তির বিদ্যুৎ এবং মোটর, কনভার্টার নানাবিধ জটিল যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ, সেজন্যে নিখিল অধিক সতর্কতায় বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন।

স্টেজের নিভৃত কোণে কিছুটা উঁচুতে পৃথক একটি সু মঞ্চ তৈরী করে তার উপরে সুইচ বোর্ড ও কনট্রোল গিয়ারগু

বসিয়েছেন, যাতে অসতর্ক কেউ সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় হাত বাড়িয়েও তার সংস্পর্শে না আসে। মঞ্চটির চার দিক টিউবের রেলিং দিয়ে ঘেরা। ওঠা-নামার জন্যে আছে ক্ষুদ্রকায় একটি কাঠের সিঁড়ি। সেই রেলিং-এর উপর দেহের ভার ঈষৎ ন্যস্ত করে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন মলী সেন।

অপাঙ্গ দৃষ্টিতে নিখিলের সঙ্কট লক্ষ্য করে অত্যন্ত সহজ ভাবে বললেন, "কী ভাবছিলেম, শুনবেন? ভাবছিলেম, আপনার এই পরিশ্রম, এই পরিকল্পনা, এত সাজ-সরঞ্জাম, এই সার্থক কারুকলার যোগ্য হবে কি আমাদের অভিনয়?"

হঠাৎ কেমন যেন বিচলিত বোধ করলেন নিখিল। নিজের অলক্ষিতেই বুঝি সুইচ বোর্ডের কাছ থেকে সরে মলী সেনের পাশে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "মিসেস সেন, আপনাদের অভিনয় এর যোগ্য কি অযোগ্য জানিনে। সে-কথা আমি কখনও ভাবি নি। আমার সামনে ছিল শুধু একটি লক্ষ্য। সে আপনি। আমি যা-কিছু করতে চেয়েছি, যা-কিছু করেছি সবই আপনার পছন্দ হবে, আপনি খুশি হবেন, এই মনে করে।"

কথাগুলি যেমন করে বলা হলো, তেমন করে বলার কল্পনামাত্র ছিল না নিখিলের মনে। তাঁর নিজের কাছেই সেগুলি ছাপার অক্ষরে কেতাবী বক্তৃতার মতো মনে হলো। গলার স্বরটাও নিজের কানেই অতিমাত্রায় নাটকীয় শোনাল। অথচ জ্যামুক্ত তীরের মতো সদ্য উক্ত বাক্যগুলিকেও

আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় কোনো মতেই। ছিঃ ছিঃ! মিসেস সেন কী জানি কী ভাবলেন। অনুশোচনা হলো নিখিলের।

মিসেস সেন সত্যি কী ভাবলেন, তা বোঝার উপায় ছিল না। বাইরে অপরাহ্ণ বেলার রৌদ্রালোক ম্লান হয়ে এসেছে। ভিতরে স্টেজের নিভৃত অংশের এই অপরিসর মঞ্চটিতে আলোর প্রবেশপথ স্বভাবতঃই সঙ্কীর্ণ। সেই ক্ষীণ আলোক এখন ক্ষীণতর হয়েছে। নিরুত্তর পার্শ্ববর্তিনীর মুখমণ্ডলে তাঁর মনোভাবের যদি কোনো ইঙ্গিত প্রতিফলিত হয়েও থাকে, আসন্ন সন্ধ্যার এই স্বল্পালোকিত মুহূর্তে তা কোনক্রমেই আর দৃষ্টিগোচর নয়। তাই আপন প্রগলভতার অসামান্য মূঢ়তা স্মরণ করে লজ্জা ও অনুতাপে কেবলি ক্লিষ্ট হতে থাকলেন নিখিল রায়।

"জানেন, আপনার সঙ্গে আমি আর কথা বলছিনে ?"

কিছুটা অভিমান, কিছুটা ব্যথা এবং কিছুটা বা অনুযোগের সুর মেশানো ছিল মলী সেনের কণ্ঠে।

অপরিসীম বিস্ময়ে নিখিল জিজ্ঞাসা করলেন, "মানে ?"

"মানে, আমি ভীষণ রাগ করেছি।"

নিখিলের শঙ্কা তা হলে অহেতুক নয়। নিজের নির্বুদ্ধিতার নিদারুণ প্রতিফল প্রত্যক্ষ করে নিখিল মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিলেন। কেন বলতে গেলেন ঐ কথাগুলি ? ক্রুদ্ধ অভিভাবকের সম্মুখে অপরাধী বালকের মতো অসহায় নিখিল আপন স্পর্ধিত আচরণের সমুচিত দণ্ড লাভের

আশঙ্কায় নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে মনে মনে যেন মুহূর্ত গণনা করতে লাগলেন।

"আপনি আমার কোনো কথা রাখেন না; আপনার সঙ্গে আড়ি।" কপট কলহের ভঙ্গিতে বললেন মলী সেন।

না, এ তো ঠিক শাস্তি বিধানের ধারা নয়! কণ্ঠে তো উদ্যত রোষের আভাস পাওয়া যাচ্ছে না! নিশ্চিত হতে না পেরে সংশয়ের স্বরে নিখিল জিজ্ঞাসা করলেন,—"আপনার কথা রাখিনে? কই, আমি তো মনে করতে পারিনে কবে আপনার কোন কথা অগ্রাহ্য করেছি।"

"করেন নি? আজ দুপুরে খেতে এসেছিলেন? এতবার অনুরোধ করে লোক পাঠালেম, কান দিয়েছেন তাতে?"

আঃ! কী আশ্বস্তি!! দূর দিগন্তে যাকে অগ্নিশিখা বলে ভয় হয়েছিল, দেখা গেল, সেটা প্রত্যূষের অরুণ রঙে রঙ্গিন লঘু মেঘখণ্ড মাত্র। নিখিল আপন স্বাভাবিক স্থৈর্য ফিরে পেয়ে সহজ কণ্ঠে বললেন,—"ওঃ, এই? আমি ভাবছিলেম, কী জানি সাংঘাতিক কিছু বা।"

"এটা সাংঘাতিক নয় বুঝি?"

"না, একবেলা ভাত না খাওয়াটা আমাদের মতো মুটে মিস্ত্রীদের পক্ষে কিছুই নয়। পাওয়ার হাউসে—"

মলী সেন হাস্যচপল কণ্ঠে বাধা দিয়ে বললেন, "থাক, থাক। অত বিনয় প্রকাশের প্রয়োজন নেই। আপনি যে আপিসের বড় সাহেব, সে আমরা সবাই জানি।"

নিখিল সহাস্যে বললেন, "হাঁ, বড় সাহেব বটে, তবে শুধু

পাখার নীচে বসে দস্তখৎকারী নই। দরকার হলেই আস্তিন গুটিয়ে হাতুড়ি, রেঞ্চ ধরতে পারি। পাওয়ার হাউসে ব্রেকডাউন হলে কতদিন সকাল থেকে রাত অবধি একটানা কাজ করতে হয়। আর্দালী-চাপরাশীরা বুদ্ধি করে কখনও দু'এক টুকরো রুটি বা দু'একটা সিদ্ধ ডিম যোগাড় করে আনে। কখনও বা স্রেফ চা আর সিগারেট। কতবার এমন হয়েছে। আজ তো আপনার কেনা কেক, সন্দেশ, আপেল, নাসপাতিতে রীতিমতো ভূরি ভোজন বলা চলে।"

মলী সেন যুক্ত দুই কর প্রণামের ভঙ্গিতে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, "মানছি, আপনারা সব ঋষিতুল্য লোক। বশিষ্ঠ, জমদগ্নির লেটেস্ট এডিশন। উর্ধ্বলোকে বিচরণ করেন। আপনারা শুধু ধোঁয়া নিয়েই বাঁচতে পারেন। আমরা মর্ত্যলোকের ক্ষুদ্র জীব, পা দুটি ধুলো-কাদার মাটিতে। আমাদের যে বস্তু না হলে চলে না।"

"বেশ তো, মর্ত্যলোকের মর জীবেরা মর্তমানের কাঁদি নিয়ে বসে থাক না। আমরা কি আপত্তি করেছি?"

অনুপ্রাসযুক্ত উত্তরটা খুব সুচতুর হয়েছে ভেবে মনে মনে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ বোধ করলেন নিখিল।

"না করেন নি। কিন্তু তবুও আপনাদের কথা ভেবেই কলা গিলতে গেলেও গলায় আটকে ধরে তাদের, সে-খবর রাখেন? জানেন, আমাকে আপনি আজ সারা দিন না খাইয়ে রেখেছেন?" নিখিলের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন মলী সেন।

গভীর বিস্ময়ে নিখিল বললেন, "আমি না খাইয়ে—মানে—আপনি—আপনি আজ খান নি দুপুর বেলা? সে কী? কেন?"

ঈষৎ হাস্য করে মলী সেন বললেন, "যোগী ঋষিদের নিয়ে বিপদই তো ঐ। মুনিঠাকুর, আপনাদের তৃতীয় নয়নটা আছে কপালের কোনখানে বলতে পারেন? জানলে সুবিধে হতো। আমাদের এত ভুগতে হতো না।"

এ-সব কথার সম্পূর্ণ অর্থগ্রহণ নিখিলের সাধ্য নয়। কিন্তু এ-কথা বুঝতে কষ্ট হলো না যে, মলী সেনের এই স্বেচ্ছাকৃত অনাহারের পশ্চাতে তাঁর নিজের সম্পর্ক আছে এবং সে-সম্পর্ক কেবলমাত্র পাকযন্ত্রের নয়, হৃদ্‌যন্ত্রেরও বটে।

অনুতপ্ত কণ্ঠে নিখিল বললেন, "কী করি বলুন, তখন এখানে নিজে দাঁড়িয়ে না করালে কিছুতেই মিস্ত্রীরা সন্ধ্যের আগে এ-সব শেষ করতে পারত না। অভিনয়ের সময় স্টেজে আলোই জ্বলত না। জানেন তো, ফাঁকি দিতে পারলে আমাদের লোকগুলি কুটোটিও নড়াতে চায় না। তা' ছাড়া এ-সব ব্যবস্থা জটিলও কম নয়। হাতে ধরে দেখিয়ে না দিলে ওদের পক্ষে করাও অসম্ভব। কিন্তু আমার জন্যে আপনি কেন না খেয়ে বসে রইলেন? অন্যায়, ভারি অন্যায় আপনার।"

"বসে আর রইলেম কোথায়? টেবিলে দুজনের খাবার সাজিয়ে নিয়ে আপনাকে ডাকতে পাঠালেম। আপনি এলেন

না। অপেক্ষা করে বেলা গড়িয়ে গেল। ঘড়ির কাঁটা একটা থেকে দুটোয়, দুটো থেকে আড়াইটার কোঠায় পৌছল। প্লেট ধরে সমস্ত খাবার-দাবার দিয়ে দিলেম চাকর-বেয়ারাদের।”

আসলে কথাটা সত্য নয়। না খেয়ে থাকেন নি মলী সেন। বরং সর্ষেবাটা আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে রাঁধা ঝালের মাছটা দু'বার চেয়ে নিয়েছেন।

নিখিলের খাওয়ার আয়োজন তিনি যথেষ্টই করেছিলেন। টেবিলে অপেক্ষাও নেহাৎ অল্প করেন নি। অবশেষে নিখিল আসবেন না নিশ্চিত জেনে বুদ্ধিমতী মেয়ে মাত্রেরই যা করা উচিত, তিনি তা-ই করেছেন।

মলী সেনের বিশ্বাস, এ-সব ক্ষেত্রে এমন সামান্য একটু অতিরঞ্জনে দোষের কিছুই নেই।

হৃদয়ের ব্যাপারে মলী সেন নিজেকে মনে করেন একজন খাঁটি আর্টিস্ট। তিনি বলেন, “ঘটনার সত্য আর আর্টের সত্য এক নয়। যা ঘটেছে তার চাইতে যা ঘটলে ঠিক হয় তার উপরেই আর্টিস্টের পক্ষপাত। নীতিবাগীশেরা যাই কেন না বলুন,—সত্যম্ শিবম্ হতে পারে, কিন্তু সুন্দরম্ নয়। প্রয়োজন মতো একটু বাড়িয়ে বা কমিয়ে না দেখালে সত্য চিরকাল শুষ্কং কাষ্ঠং হয়ে থাকে, কোনোকালেই নীরস তরুবর হয় না।”

বিরুদ্ধবাদীরা প্রশ্ন করে, “যথা?”

“যথা, পুলিশ কোর্টের রিপোর্টে থাকে সত্যিকার ঘটনা। বঙ্কিম-বাবুর উপন্যাসে আছে সত্যিকার আর্ট। যেমন,

পত্রিকার পাতার ফটোগ্রাফে পাই অবিকৃত সত্য, শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবিতে দেখি উপভোগ্য আর্ট।”

শুনে ক্লাবে, পার্টিতে তাঁর ভক্তমণ্ডলী সপ্রশংস বিস্ময়ে মুখব্যাদান করে মন্তব্য করেন,—“মাই গশ্! হাউ ক্লেভার!”

নিখিল ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়র। কিলো-ওয়াট বোঝেন, এম্পিয়র জানেন, ভোল্টেজ চেনেন। আর্টের সরু গলি-ঘুঁজিতে তাঁর গতায়াত নেই। তিনি সহজ সরল বুদ্ধিতে এইটুকু বুঝলেন, এই অতিথিপরায়ণা কোমলহৃদয়া মহিলাটি আজ তাঁরই জন্যে সারাদিন অভুক্ত। অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। সহৃদয় কণ্ঠে বললেন, “কেন বলুন তো অনর্থক না খেয়ে কষ্ট পেলেন?”

মলী সেন বললেন, “দেখছি, এঞ্জিনীয়র সাহেবের নোট বইতে সবই আছে; শুধু লেখা নেই—পাগলা ষাঁড়ে করলে তাড়া কেমন করে ঠেকাব তায়?”

কিন্তু এ কথাগুলির প্রকৃত তাৎপর্য কী, আলোচ্য প্রসঙ্গে তাদের সম্পর্কই বা কোনখানে, তা নিখিলের কাছে স্পষ্ট হওয়ার পূর্বেই পরিবর্তিত কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, “রাগ করে আজ ভেবেছিলেম, থাকুন না আপনি উপোস করে। আমার ভারি বয়েই গেল তাতে। প্রতিজ্ঞা করেছিলেম, একমাত্র অভিনয়ের ব্যাপার ছাড়া আপনার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্কই রাখব না। কিন্তু প্রতিজ্ঞার মুস্কিলই এই যে, সেটা না ভাঙ্গা পর্যন্ত মনে আর স্বস্তি থাকে না।”

নিখিল কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে বাধা দিয়ে মলী সেন বলতে লাগলেন, "জানেন মিস্টার রয়, ভগবান লোকটা বড় একচোখো রেফারী। জীবনের খেলায় পুরুষেরা কেবলই ধাক্কা দিয়ে দিয়ে গোল করে, আর মেয়েরা কেবলই পড়ে গিয়ে গিয়ে গোল হারে। তিনি হুইসিল হাতে নির্বিকার চেয়ে দেখেন,—বোধ হয় উপভোগই করেন,—ফাউল দেন না। গ্যালারী থেকে জুতো আর ইটপাটকেল ছুঁড়ে মারবার আশঙ্কা নেই কি না।"

মলী সেনের কণ্ঠের সূক্ষ্ম আবেদন যেন সহস্র সহস্র অদৃশ্য তরঙ্গে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। সেই কাতর ব্যাকুলতা তাঁর তন্বী দেহটিকে ঘিরে এক গম্ভীর অথচ বেদনাবিধুর ভাবাবেগের নিস্তব্ধ আবেষ্টন রচনা করল।

হঠাৎ দুই পদক্ষেপে সুইচ বোর্ডটার কাছে গিয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলেন নিখিল। ঘুমন্ত ব্যক্তিকে অকস্মাৎ সজোরে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তোলার মতো নিজেকে তিনি যেন সবল আঘাতের দ্বারা মোহাবিষ্ট স্বপ্নরাজ্য থেকে [illegible] বাস্তবতায় ফিরিয়ে আনলেন।

আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্চের ঠিক নীচে কার যেন দ্রুত পদধ্বনি ও গুরু পতন-শব্দ শোনা গেল। চমকে উঠে "কে ওখানে ?" বলে হাঁক দিলেন নিখিল।

দুজনেই রেলিং-এর উপর দিয়ে ঝুঁকে নীচে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন। সেখান থেকে মেজের উপরে শুধু শাড়ির একটি প্রান্ত ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না।

নিখিল দ্রুতপদে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলেন। মলী সেনও তাঁর অনুগমন করলেন।

"এ কী! এ যে নীরজা! তুমি এখানে? এমন করে শুয়ে?"—বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে নিখিল তাকালেন।

কিন্তু তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়ার পূর্বেই সেখানে ঝড়ের বেগে উপস্থিত হলেন ব্যস্ত-সমস্ত সিদ্ধনাথ। কোনো দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করে বললেন,—

"এই যে মিসেস সেন, আপনি এখানে! আপনাকে না খুঁজেছি হেন স্থান নেই। আর একটু দেরী হলেই খবরের কাগজে নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন ছাপতে হতো, হাঃ হাঃ হাঃ (অট্টহাস্য)। উঃ, কম করে বার দশেক না কোন আপনার দোতলার বারান্দা আর গ্রিনরুমে ছুটেছি। হাঁটুতে ব্যথা ধরে গেছে। একটু বাতের দোষ আছে কি না। এটা পৈতৃক, ঠাকুর্দা মশায়েরও ছিল। মেজ শ্যালক আয়ুর্বেদ কলেজের প্রফেসর। ব্যবস্থা দিলেন,—পুরানো ঘি গরম করে সকাল-সন্ধ্যা মালিশের। গিন্নীকে বললেম, শালা না হলে এমন ঠাট্টা কেউ করে? ঘি নতুনই মিলে না, তার আবার পুরানো। দাদাকে বলো, এখন থেকে দালদা মালিশের ব্যবস্থা দিতে, নইলে রোগী জুটবে না। হোঃ হোঃ হোঃ।"

সিদ্ধনাথ এক নিঃশ্বাসে কথা বলেন। দম ফুরিয়ে নিজে না থামা পর্যন্ত তাঁকে কিছু প্রশ্ন করা বৃথা। তাঁর অট্টহাস্য শেষ হলে, মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কী সিদ্ধনাথ-বাবু? আমাকে খুঁজছিলেন কেন?"

"খুঁজছিলেম কেন? অভিনয় সুরু হওয়ার আর ঘণ্টা তিন-চার মাত্র বাকী। এদিকে অপর্ণার মা বলে পাঠিয়েছে,—অপর্ণার অসুখ, সে আজ পার্ট করতে পারবে না। ডোবালে দেখছি।"

"কী সর্বনাশ! অপর্ণার যে প্রথম দৃশ্যেই পার্ট। এখন উপায়?" উদ্বেগে মলী সেনের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল।

সিদ্ধনাথ বললেন, "না, না, আপনি উতলা হবেন না। মনে উদ্বেগ থাকলে আপনার পার্ট নষ্ট হবে। আপনি এ-সব ভাববেন না। অপর্ণার ভার আমি নিচ্ছি।" চার পাশে একবার সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সন্তর্পণে বললেন, "অসুখ না হাতি! আসল ব্যাপার, কমপ্লিমেণ্টারী। চারখানা করে সব অভিনেতা অভিনেত্রীদের দেওয়া হয়েছে তাদের আত্মীয়-বন্ধুদের জন্যে। অপর্ণার মায়ের আরও চারখানা চাই। তাই নিয়ে ঝগড়া।"

তাঁর বাচনভঙ্গি দেখে মনে হয়, যেন অতি মারাত্মক এক গুপ্ত সামরিক তথ্য উদ্ঘাটিত করলেন।

মলী সেনকে আশ্বাস দিলেন, "সব আমি ঠিক করে দিচ্ছি। আপনাকে ভাবতে হবে না। কিন্তু এদিকে ভাড়া-করা চেয়ারগুলো যে এখনও এসে পৌঁছল না। যারা টিকিট কিনেছে তারা বসবে কোথায়? ডোবালে দেখছি!"

মলী সেন পুনরায় উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, "অ্যাঁ, এখনও চেয়ার আসে নি? তা'হলে কী হবে?"

"আহা, আপনি চঞ্চল হচ্ছেন কেন? আমি সব ব্যবস্থা

করছি। আপনি স্থির হয়ে নিজের পার্টের কথা ভাবুন তো। আপনি উতলা হবেন না।"

যেরূপ ব্যস্ততার সঙ্গে এসেছিলেন ঠিক সেরূপ ব্যস্ততায়ই প্রস্থান করলেন সিদ্ধনাথ।

মলী সেন নিখিলকে বললেন, "যাই, একটু গরম কফির চেষ্টা করিগে। তা নইলে স্টেজ-ফ্রাইট-এ ধরবে। আপনি ওয়াশ্ চান তো উপরের বাথরুমে চলে যান। নতুন সাবান, তোয়ালে সমস্ত ঠিক করা আছে। বেশী দেরী করবেন না যেন, আমি ড্রেসিং-রুমে পেয়ালা নিয়ে বসে থাকব কিন্তু।"

ইতিমধ্যে নীরজা উঠে দাঁড়িয়ে নিজ বসন সুবিন্যস্ত করেছেন। নিখিল দেখলেন, মলী সেনের প্রস্থানপথে অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছেন নীরজা। নিখিল দৃষ্টিবিশারদ, কবি কিম্বা সাহিত্যিক নন। সে-নেত্র শূন্যগর্ভ কি অগ্নিগর্ভ, তা বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

নীরজা কৈফিয়তের সুরে বললেন, "আমার কানের একটা ইয়ারিং কোথায় হারিয়ে গেছে। তাই খুঁজে দেখছিলেম এখানটায়। হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গিয়েছি।"

নিখিল বললেন, "এই অন্ধকারে খুঁজলে পাওয়া যায় কখনও? দাঁড়াও আমি একটা টর্চ নিয়ে আসছি।"

নীরজা বাধা দিয়ে বললেন, "না, মিছে পরিশ্রম করবেন না। নিশ্চয়ই এখানে নয়, অন্য কোথায় হারিয়েছি।" বলে প্রস্থানোদ্যম করলেন।

নিখিল পিছন থেকে এগিয়ে এসে নীরজার বাম বাহু লক্ষ্য

করে বললেন, "এ কী, এত রক্ত কিসের? পড়ে গিয়ে কোথাও কেটে যায় নি তো?"

আপন দক্ষিণ হস্তে নীরজার বাহুটি নিখিল তুলে ধরলেন। "ইস, অনেকটা কেটেছে যে! এখনও রক্ত বেরুচ্ছে। তাড়াতাড়ি একটা ব্যাণ্ডেজ করা চাই।" বললেন নিখিল।

নীরজা সজোরে নিখিলের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, "কিছু দরকার নেই। ও কিছু নয়, সামান্য কাটা। ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে ফেললেই হবে। আপনি যান।"

"দরকার নেই মানে? এ-সব ধুলো-বালির মধ্যে সেপ্‌টিক হতে কতক্ষণ? চলো আমার সঙ্গে মিসেস সেনের কাছে। তাঁর কাছে নিশ্চয়ই ডেটল পাওয়া যাবে।" বলে পুনরায় নীরজার বাহুটি হাতে তুলে নিলেন।

"আমার কিছু হয় নি, মিস্টার রয়। আপনি কেন অনর্থক এই নিয়ে ফাস্ করছেন? আপনার পায়ে পড়ি। আপনি যান। আপনার কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

নীরজার কণ্ঠে কঠোর তিক্ততা নিখিলকে আঘাত করল। বিস্মিতও করল। নিঃশব্দে নীরজার বাহুটি নিজের হাত থেকে মুক্ত করে দিলেন।

নীরজা নিখিলের দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র না করে সতেজ পদক্ষেপে স্টেজের অপর প্রান্তের দ্বারোদ্দেশে রওনা হলেন।

সামনে তাকিয়ে চলতে চলতে—এ কী? হঠাৎ আলোগুলি কি সব নিস্তেজ হয়ে এল? চোখে ঝাপসা দেখায় কেন? বুকের পাশে জামার অংশটা ভিজে ঠেকছে

যেন! জলবিন্দু ঝরল কোত্থেকে? দুই হাত নিজের চক্ষে স্থাপন করলেন নীরজা। তাই তো চোখে জল কেন! নিজের কাছেই নিজে আবিষ্কার করলেন নীরজা, তিনি কাঁদছেন। শ্রাবণ দিনের মেঘকজ্জল আকাশ থেকে বারিবর্ষণের মতো শ্যামাঙ্গী নীরজার ঘনকৃষ্ণ দুই নয়ন থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। তাঁর কপোলে, কণ্ঠে, বক্ষে ও বসনে। অবিরাম বেগে। অজস্র ধারায়।

নিখিলের বৈদ্যুতিক কলাকৌশল ও আলোকসম্পাতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মঞ্চের দৃশ্যসজ্জার ব্যবস্থা করছেন বীরেশ্বর বোস—প্রথিতযশা চিত্রশিল্পী। জলের রং ও তৈলচিত্র দুটোতেই তাঁর সমান খ্যাতি। রূপ সৃষ্টি ও ব্যবহারিক শিল্প—দুটোতেই তাঁর সমান পারদর্শিতা। একাধিক চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের শিল্প-নির্দেশক। তা' ছাড়া শ্বেতাঙ্গ-পরিচালিত বিজ্ঞাপন কোম্পানীতে স্ফীত বেতনে নিযুক্ত স্থায়ী কমার্শিয়েল আর্টিস্ট।

টেবিলের উপরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নানা রং-এর টিউব। ফুলদানীর মধ্যে দীর্ঘবৃন্তযুক্ত পুষ্পগুচ্ছের মতো একটি চিনেমাটির ঘটে দাঁড় করানো গোটা পাঁচেক তুলি। বাম

হস্তের মুষ্টিতে ধৃত আরও গোটা তিনেক। বিভিন্ন রং ব্যবহারের জন্যে। যখন যে-রংটি প্রয়োজন সে-তুলিটি বাম হাত থেকে ডান হাতের আঙ্গুলে তুলে নেন। একটানা সুরে শীষ দিতে দিতে একটি মাটির ঘটের গায়ে রেখার পরে রেখা, রং-এর পরে রং যোজনা করছিলেন বীরেশ্বর। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবেরা জানেন, এটাই বীরেশ্বরের গভীর মনোনিবেশের লক্ষণ। তখন তাঁর কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে নেই।

কিন্তু ব্যাঘাত ঘটল।

একটি প্রৌঢ়া মহিলা এসে প্রশ্ন করলেন, "এই যে বীরেশ্বর, শুনলেম কাল সন্ধ্যে থেকে না কি কেবল সীনই আঁকছ?"

মহিলার শ্বশ্রূকুলে পোষাকী ও পিতৃকুলে আট-পৌরে নাম কিছু একটা অবশ্যই ছিল এবং আছে। কিন্তু সে বোধ হয় একমাত্র তিনি ছাড়া আজ আর কেউ মনেও আনতে পারে না। ঘরে বাইরে সর্বত্র বর্তমানে তাঁর এক ও অনন্য পরিচিতি "মান্নামাসি।"

বীরেশ্বর মুখ তুলে বললেন, "হ্যাঁ, মান্নামাসি। প্রথম অঙ্কের সুন্দর সেটটা হঠাৎ ছিঁড়ে নষ্ট হয়ে গেল। সেটা ফের নতুন করে আঁকতে হলো।"

"সারা রাত জেগে বসে ছবি আঁকলে? ধন্যি তোমার ধৈর্য আর উৎসাহ।"

"অন্য উপায় ছিল না, মিসেস সেন বেচারী এমন মুষড়ে

পড়েছিলেন। তা' ছাড়া তক্ষুণি নতুন করে আঁকতে না বসলে আজ এতক্ষণে শেষও হতো না।"

একটু বক্র হেসে মান্নামাসি বললেন, "ওঃ তাই নাকি! সত্যি তো, মিসেস সেনকে মুষড়ে পড়তে দেখলে তোমরা ছেলেরা কি আর স্থির থাকতে পারো? দেখ বীরেশ্বর, তোমার মা আমার দিদির পিসশ্বাশুড়ী হতেন, তোমাকেও এই এতটুকু কাল থেকে দেখে আসছি; আমাদের নেহাৎ আপনার জনই মনে করি, তাই বলছি। নাটক করছো কর। কিন্তু ঐ মিসেস সেনটির কাছ থেকে সাবধান।"

মান্নামাসির মন্তব্যের তাৎপর্য বীরেশ্বরের কাছে অজ্ঞাত। তিনি জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাতেই বললেন, "সেই যে ছেলেবেলায় গল্প শুনেছি কামাক্ষ্যায় না কি পুরুষ মানুষদের ভেড়া বানিয়ে রাখে, এও যেন তাই। ওর কাছ থেকে একটু দূরে দূরেই থেকো।"

"আপনি কি বলছেন?"

"ঠিকই বলছি। কানেও তুলো দিই নি, চোখেও ঠুলি পরি নি! জানি সবই। নাম করবো না, কিন্তু যারা ডুবেছে তাদের দেখেছি, যারা ডুবতে বসেছে তাঁদেরও দেখছি। কিন্তু তাদের যেমন-তেমন। তোমার যে ঘরে স্ত্রীপুত্র আছে। তুমি বেশী কাছে ঘেঁষো না যেন।"

উত্তরে বীরেশ্বর কিছু বলার পূর্বেই বেয়ারা এসে সংবাদ দিল, "হুজুর, টেলীফোন।"

"কার, আমার?" বীরেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন।

"জী, হুজুর, আপকে ঘরসে টেলীফোন আয়া হৈ।"

"ঘরসে টেলীফোন!" অর্থাৎ সুবালা। বীরেশ্বরের স্ত্রী।

বীরেশ্বর শঙ্কিত হলেন। শঙ্কা অহেতুক নয়। কাল বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন বেলা সারে চারটায়। বলে এসেছিলেন, ফিরতে একটু রাত হতে পারে। আজ সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। চব্বিশ ঘণ্টার কাছাকাছি। এখনও বাড়ি যাওয়া হয় নি। নিজের অপরাধের গুরুত্বে বীরেশ্বর নিজের কাছেই সঙ্কোচ বোধ করলেন।

সংসারে কর্মিষ্ঠ ব্যক্তিদের নিয়ে বিপদ এই যে, অপরের কর্মদক্ষতার উপরে তাদের আস্থা কম। সমস্তটাই স্বহস্তে সমাধা না করতে পারলে তাদের মন খুশি হয় না। ক্লাবের দুটি সদস্যা—মিনতি ও ডলী—শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী। চিত্রাঙ্কনে দক্ষতা আছে। দৃশ্যপট চিত্রণে বীরেশ্বরের সহযোগিতা করতে তাঁরা দুজনেই উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু কোনো কিছুই সম্পূর্ণরূপে তাঁদের হস্তে ন্যস্ত করার মতো নির্ভরতা নেই বীরেশ্বরের। তিনি কখনও বা মিনতির হাত থেকে তুলি কেড়ে নিয়ে আঁকতে বসেন ফুলের মঞ্জরী, কখনও বা ডলীকে সরিয়ে দিয়ে উইংসে লাগাতে সুরু করেন সবুজ রং-এর ওয়াশ্। ফলে পরিশ্রমের পরিমাপ বিভক্ত হয়ে লঘু হওয়ার অবকাশ পায় না, পুঞ্জীভূত হয়ে কেবলি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

স্টেজের বহির্দেশে যবনিকার দুই পার্শ্বে ঘন কৃষ্ণ মখমলের উপরে কোনারকের সূর্যমন্দিরের রথচক্রের অনুকরণে রূপালী

জরির দুটি চক্র রচনার পরিকল্পনা বীরেশ্বরের। চক্র দুটির কেন্দ্র থেকে দুলিয়ে দেওয়া হবে তুষারশুভ্র একজোড়া চাঁদমালা। নীচে থাকবে দুটি আম্রপল্লববাহী পূর্ণকুম্ভ। শুভকর্মের চিরপরিচিত শাস্ত্রসম্মত মাঙ্গলিক। সেই মঙ্গলঘট দুটি আলিম্পনের ভঙ্গিতে সযত্নে সুচিত্রিত করছিল ডলী।

বীরেশ্বর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

"মিস দত্ত, আপনার হাতে কী? মঙ্গলঘট? না, না, এ লাইনটা অত সরু নয়। আচ্ছা, দিন আমাকে, দেখিয়ে দিচ্ছি।" বলে নিজেই তুলি নিয়ে বসে পড়লেন। দেখিয়ে দিতে বসলেও সেটা একেবারে শেষ না করে যে উঠবেন না সে-কথা সবারই জানা আছে। এমন ঘটনা হামেশাই ঘটছে।

টেলীফোনের দিকে যেতে যেতে আপন মনে প্রশ্নোত্তরের দ্বারা আপন বিবেক গ্লানিমুক্ত করার প্রয়াসী হলেন বীরেশ্বর।

কাল বাড়ি থেকে বেরুবার সময় তিনি কিছু ভাবেন নি যে, রাত্রিতে বাড়ি ফিরতেই পারবেন না। কী করে ভাববেন? সমুদ্র-সৈকতের দৃশ্যপটটি যে কর্মকর্তাদের অনবধানতায় অমন ভাবে ছিঁড়ে নষ্ট হবে, তা কি কেউ আগে কল্পনা করেছিল? সেখানা যে নতুন করে আঁকতে হবে তা কি তিনি জানতে পেরেছিলেন? হাত গুণতে তো আর জানেন না। হুঃ, কাল রাত্রিতে তক্ষুণি আঁকা সুরু না করলে আজ অভিনয়ের আগে তা শেষ হতো কি না! মিনতি, ডলী হাজার হোক ছেলেমানুষ, তাদের ভরসায় কি সেটা ফেলে রাখা চলে?

হ্যাঁ, সুবালাকে একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কাল রাত্রিতে ব্যস্ততার মধ্যে সেটা ভুল হয়ে গিয়েছে। অন্যায়ই হয়েছে। কিন্তু আজ সকালে কি একবার চেষ্টা করেন নি? দশ মিনিটের চেষ্টায় টেলীফোনের যে রং নাম্বার পেয়েছেন সে কি তাঁর দোষ? কে না জানে যে, কলকাতার টেলীফোনে পনর মিনিটের আগে একটা লাইন পাওয়া যায় না! পাওয়া গেলেও ভুল নম্বর। রিসিভার তুলেই একেবারে যে ঠিক লাইনটি পায় সে তো নিশ্চিন্ত মনে সেন্টলেজারের টিকিট কিনলেও পারে!

"হ্যালো, কে, সুবালা? হ্যাঁ, আমি কথা বলছি। দেখ, কাল রাত্তিরে এখানে"—বীরেশ্বর গৃহে প্রত্যাগমনের বিঘ্ন সবিস্তারে বর্ণনা করতে যাচ্ছিলেন।

সুবালা বাধা দিয়ে বললেন, "প্রিমিয়র কোম্পানী থেকে লোক এসেছিল। বললে, তাদের ডিজাইনটা কাল চাই-ই।"

"কাল? আচ্ছা, ওটা তো প্রায় হয়েই আছে। একটু শুধু ফিনিশ দিয়ে দেওয়া বাকী। দশ মিনিটের কাজ। আমি তোমাকে কাল রাত্তিরে খবর—"

"আর নিউ বুক কোম্পানী ফোন করেছিল। তাদের ওখানে আজ কিম্বা কালের মধ্যে যেতে বলেছে, খুব জরুরী।"

"কাল যাব'খন। আজ সকালে তোমাকে—হ্যালো, হ্যালো—ঐ যাঃ, বোধহয় লাইন কেটে দিয়েছে। হ্যালো মিস, হ্যালো, হ্যালো"—বীরেশ্বর টেলীফোনটা ফ্লাশ করতে সুরু করলেন। ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্।

বৃথা চেষ্টা। আজকাল কি আর টেলীফোনে কথা বলার জো আছে কারো সঙ্গে? গভীর বিরক্তির সঙ্গে বীরেশ্বর রিসিভারটা রেখে দিলেন।

মনে মনে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করলেন বীরেশ্বর। কাল বিকেল থেকে আজ এতক্ষণ পর্যন্ত গৃহে অনুপস্থিতির অপরাধে সুবালা যদি বিক্ষোভ প্রকাশ করতেন, এমন কি কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনা করতেন, তবে যেন বীরেশ্বর আশ্বস্ত হতেন। তা' হলে আত্মপক্ষ সমর্থনের অন্ততঃ একটা প্রয়াস করা যেতো। সুবালা সে-প্রসঙ্গ অবতারণার অবকাশ মাত্র দিলেন না।

এই সুবালার রীতি!

দুধের ঘনত্ব বৃদ্ধি দ্বারা তার পরিমাণে ঘটে হ্রাস। নামেরও সঙ্কোচন হয় অনুরাগের আধিক্যে। হৃদ্যতা ও স্নেহাধিক্যের ফলেই বিনোদ বিনুতে এবং শ্রীলতা লতায় পরিণত হয়।

যে-মেয়েটির উপরে মলী সেনের সজ্জাকক্ষের সমুদয় ব্যবস্থাপনার ভার, তার নামটিও স্নেহানুরক্তগণের নিকট সম্ভাষণে সুধীরা থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে হয়েছে,—ধীরা।

সম্পর্কে ধীরা মলী সেনের ভাগিনেয়ী। শিবনাথের এক মামাতো বোনের মেয়ে। গত বৎসর বেথুন থেকে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করেছে। তাকে ফর্সা বলা কঠিন, দেহ-সৌষ্ঠবেও নিখুঁত নয়। কিন্তু মুখে বুদ্ধিদীপ্ত এমন একটি স্নিগ্ধ লাবণ্যের আভাস আছে যা সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রূপ না থেকেও রমণী যে রমণীয়া হতে পারে ধীরা তারই দৃষ্টান্ত।

মেয়েটি মলী সেনের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। স্কুলে নীচের ক্লাশের ছাত্রদের প্রায় প্রত্যেকেরই একজন আদর্শ, হিরো থাকে। কারো বিদ্যাসাগর, কারো নেতাজী, কারো বা ফুটবলার কিম্বা সিনেমা স্টার। ধীরার আছে মলী সেন। তার কলেজের সহপাঠিনী থেকে সুরু করে পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে এমন একজনও নেই যে মলী মামীর রূপ, গুণ, বিদ্যা ও বুদ্ধির বিস্তারিত বিবরণ অন্ততঃ বার পাঁচেক শোনে নি।

অনুরাগ ও অনুসরণের বিচারে ধীরা প্রায় ভক্তের পর্যায়ে পড়ে। বৃহৎ বিষয়ের সঙ্গে ক্ষুদ্রের তুলনা যদি ক্ষমার্হ হয় তবে বলা যেতে পারে,—বুদ্ধদেবের যেমন আনন্দ, মহাত্মা গান্ধীর যেমন বিনোবা ভাবে, মলী সেনের তেমনি ধীরা। মলী সেনের সাজসজ্জা, রুচি, মতামত, এমন কি, কথা বলা থেকে সুরু করে চলার ভঙ্গিটি পর্যন্ত ধীরা অনুকরণ করে থাকে। কোনো কাজে গভীর মনোনিবেশকালে গলার সূক্ষ্ম স্বর্ণহারটি দুই ওষ্ঠাধরের মধ্যে চেপে ধরার অভ্যাস

আছে মলী সেনের। মাতুলানীর এই মুদ্রাদোষটি পর্যন্ত ভাগিনেয়ীর চরিত্রে সযত্ন চেষ্টা দ্বারা প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রীতিটা উভয়তঃ। মলী সেনও ধীরাকে অত্যন্ত পছন্দ করেন। শনিবারে কলেজের শেষে প্রায়ই নিয়ে এসে নিজের কাছে রাখেন। সোমবারে গাড়ি দিয়ে আবার কলেজে পৌঁছে দেন। দু' একটা পার্টি, পিক্‌নিকেও মাঝে মাঝে নিয়ে যান। জামা, জুতা, সেন্ট প্রভৃতি উপহার দেন যখন তখন।

কতবার শাড়ি কিনতে গেছেন মার্কেটে। নিজের জন্যে। সঙ্গে ছিল ধীরা। সে বলেছে "এই শাড়িটা চমৎকার, এটা কেনো মলী মামী।"

মলী সেন জিজ্ঞাসা করেছেন, "এটা তোর কাছে ভালো লাগছে ? আচ্ছা বেশ, তোর জন্যে নিচ্ছি।"

ধীরা অপ্রতিভ হয়ে বলেছে, "না, না, আমার জন্যে নয় ; তোমার জন্যে কিনতে বলছি।"

"আচ্ছা, আপাততঃ তোর জন্যেই কিনছি, আমাকে না হয় দু' একদিন ধার দিস পরতে।"

ধীরা মনের চাঞ্চল্য যথাসাধ্য দমন করে বলেছে, "বা রে, তোমাকে যে-শাড়িতে মানায়, আমার গায়ে তা কেমন দেখাবে ?"

"খুব খাশা দেখাবে। নে, বাড়ি গিয়ে আবার মাকে যেন দেখাসনে। সে আমাকে কষে বকুনি দেবে।"

সেটা মোটেই সত্য নয়। বকুনি ধীরার মা দেন না।

ধীরার বাবা দু' একবার মৃদু স্বরে আপত্তি করেছেন স্ত্রীর কাছে। "বৌঠান বড় মানুষ, টাকার ছড়াছড়ি। কিন্তু আমাদের কি এতটা নেওয়া ঠিক? পূজা-পার্বণে ভালোবেসে দু' একটা উপহার দেন, সে এক কথা। আর ফি মাসেই শাড়ি দিচ্ছেন, জামা দিচ্ছেন, সে অন্য ব্যাপার। শিবুদা-ই বা কী ভাবছেন কে জানে।"

মেয়ের মা সে-কথায় কান দেন নি। তিনি মেয়েমানুষ, সাংসারিক বুদ্ধি স্বভাবতঃই প্রখর। ধীরাকে মলী সেন স্নেহ করেন, সে তো লাভেরই কথা। ওই তো আরো কত মেয়ে কলেজে পড়ে। তাদের মায়েরা দুঃখ করে বলে, খরচের আর পার নেই, মেয়ের জামা-কাপড়ের নিত্য নতুন ফ্যাশানের দায়ে প্রাণ যাওয়ার দাখিল। ধীরার জন্যে আজ পর্যন্ত তাঁকে কখনও ভাবতে হয়েছে?

নতুন উপহারের কথা ছেড়েই দাও। মলী সেনের নিজের ব্যবহৃত শাড়িই কি ধীরাকে তিনি কম দিয়েছেন? ফি মাসেই নতুন শাড়ি কেনা মলী সেনের একটা সখ যেমন ফি সপ্তাহে সিনেমায় যাওয়া অবিবাহিত পুরুষের। অথচ একটা শাড়ি বারকয়েক পরিধানের পরেই আর আকর্ষণ থাকে না তার প্রতি। ধীরাকে দিয়ে দেন। ধীরা না থাকলে নিশ্চয়ই অন্য কাউকে দিতেন। আলমারী বোঝাই করে আর কতদিন রাখতে পারতেন? তা' ছাড়া ধীরার বিয়ের কথাটাও তো একবার ভাবতে হবে। টাকা লাগবে না তখন? মামীর করুণা অক্ষুণ্ণ থাকলে সে-সময়েও অনেক সুরাহার সম্ভাবনা।

অকাট্য যুক্তি।

বাবার মুখ বন্ধ হয়।

মামীর সজ্জাবিন্যাসের ভার যে ধাঁরা সানন্দে এবং সাগ্রহেই গ্রহণ করেছে, সে-কথা উল্লেখ না করলেও চলে।

এ-বাড়িতে কক্ষের অভাব নেই। ঠাকুর দালানে যেখানে স্টেজ তৈরী হয়েছে তার পিছনে ও দু'পাশে একটা করে মাঝারি ধরনের কুঠরি। সেগুলি অভিনেতা অভিনেত্রীদের সজ্জাকক্ষরূপে ব্যবহারের জন্যে নির্দিষ্ট হয়েছে। বাঁ দিকের ঘরটি আয়তনে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। মহিলাদের প্রসাধন ও সজ্জাপর্ব অধিকতর ব্যাপক এবং সময়সাপেক্ষ। উপচার উপকরণও অনেক। সুতরাং সেটি তাঁরা দখল করবেন। বিপরীত দিকের কক্ষটি পুরুষ অভিনেতাদের পোষাক পরিবর্তনের স্থান।

পূর্ববর্তী অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতায় মলী সেন জানেন, এ সব সৌখীন অভিনয়ে স্টেজে অনাবশ্যকরূপে ভীড় জমে। রঙ্গাবতরণকারিণীদের চাইতে নেপথ্যচারিণীর সংখ্যা বেশী হয়। অভিনেত্রীদের আত্মীয়া ও সখীদের উপস্থিতিতে বেশ পরিবর্তনের স্থানগুলি জনাকীর্ণ থাকে। ফলে সবারই পক্ষে নিশ্চিন্ত নিভৃতে আপন অঙ্গরাগে মন দেওয়া কঠিন হয়। দুরূহ ভূমিকায় আত্মপ্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে অভিনেতা অভিনেত্রীদের পক্ষে যে একটি উত্তেজনাহীন শান্ত পরিবেশে কিছুক্ষণ আত্মস্থ হওয়ার প্রয়োজন আছে, তারও আর কিছুমাত্র সুযোগ মেলে না। তাই মলী সেন এবার নিজের জন্যে পৃথক একটি কক্ষ নির্দিষ্ট রেখেছেন।

ধীরা মলী সেনের বেশবিন্যাসের সমুদয় উপকরণ একে একে সজ্জাকক্ষটির যথাস্থানে সাজিয়ে রাখছিল। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে দ্বারের পানে তার দৃষ্টিক্ষেপ ও হাত ঘড়িটার প্রতি তাকানো থেকে এ-কথা অনুমান করা কঠিন নয় যে, সে কোনো এক জনের আগমন প্রত্যাশায় আছে।

"কী করছ?" বলে একটি তরুণ প্রবেশ করল কক্ষে।

ধীরার কাছ থেকে কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

"খুব ব্যস্ত না কি?" পুনরায় প্রশ্ন করল আগন্তুক। কিন্তু উপস্থিত অপর ব্যক্তিটি সেই দণ্ডে ড্রেসিং-টেবিলের প্রসাধন সামগ্রীগুলি নিয়ে এমনই ব্যাপৃত হয়ে পড়ল যে, মনে হয় পাউডারের কৌটা বা নখর-রঞ্জনীর শিশিটা থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও অন্যদিকে মনোযোগ দেওয়ার অবকাশ নেই তার। এমন কি, প্রশ্নগুলি যে সে শুনতে পেয়েছে, তারও কোনো লক্ষণ দেখা গেল না তার আচরণে।

যুবকটি মৃদু হেসে কৌতুকের স্বরে বলল, "চিনতে পারছ কি? আমার নাম শ্রীসমীরচন্দ্র গুপ্ত। পিতা মৃত অধরচন্দ্র গুপ্ত, নিবাস লাহোর, হাং সাং—১৭ নম্বর মহেশ মিত্র লেন, পোস্ট আপিস বিডন স্ট্রীট, থানা—"

অত্যন্ত নীরসকণ্ঠে ধীরা উত্তর করল, "চিনতে পারলেই বা চেনার দরকার কী?"

সমীর অনুতপ্ত কণ্ঠে বলল, "আমার অনেকটা দেরী হয়ে গিয়েছে। এখানে যে পাঁচটার সময় আসতে হবে সে-কথা ভুলেই গিয়েছিলেম। রাগ করো না লক্ষ্মীটি।"

এ-কৈফিয়তে ক্রোধ শান্ত হয় না বরং বৃদ্ধি পায়। ভুলতে পারাটাই যে সবচেয়ে বেশী অমার্জনীয় অপরাধ। তীব্র অভিমানে ধীরার হৃদয় পীড়িত হলো। সমীরের দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র না করে অত্যন্ত উদাসকণ্ঠে বলল, "না, রাগ কিসের ?"

সমীর কাছে এসে ধীরার হাত ধরে বলল, "আমার অন্যায় হয়েছে, মাপ করো।"

ধীরা সজোরে হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল, "আঃ, ছাড়ো বলছি। কেউ দেখলে কী ভাববে ? উঃ, লাগছে। ছাড়ো, ছাড়ো।"

সমীর ধীরার হাতখানা আপন মুষ্টি থেকে মুক্ত করে দিয়ে ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, "সত্যি লেগেছে কি ?"

"না, লাগবে কেন ? আমার হাতটা তোমার স্প্রিং-ডাম্বেল কি না যে, গায়ের জোরে চাপবে। যা "ষণ্ডামর্কের মত এক একটা আঙুল তোমার।"

"সত্যি, আমি একটা জন্তু।"

সমীরের মুখে অনুতাপের ছায়া দেখে মুহূর্তে ধীরার অভিমান দূর হলো। হেসে বলল, "ইস, বিনয় করা হচ্ছে দেখছি। জন্তু নয় তো কী ? জন্তুর চাইতেও বেশী। জন্তুদের বন্ধু নন্তু-বাবু। তা দেখুন নন্তু-বাবু, ফের যদি কখনও এমন দেরী হয়, তবে জন্মের মতো আড়ি হবে কিন্তু।"

সন্ধি হয়ে গেল। শীতের কুয়াশান্তে শিশিরার্দ্র ঘাসের উপরে মৃদুতাপ সূর্যালোকের মতো প্রীতিরসে ছেয়ে গেল দুটি

প্রথম প্রণয়মুগ্ধ তরুণ-তরুণীর সুনিবিড় সান্নিধ্য, তাদের কপট কলহ-কাকলি-মুখর নিভৃত সাক্ষাৎ।

ধীরা বলল, "আর পাঁচ মিনিট আগে এলেই মলী মামীকে দেখতে পেতে।"

সমীর ঠাট্টা করে বলল, "তোমার মলী মামী কি কুতুবমীনার, না, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল, যে দেখতে আসতে হবে?"

"আহা, অত ঠাট্টা করতে হবে না। সত্যি বলছি, মলী মামীর সঙ্গে একবার আলাপ করলে দেখবে, যা বলেছি ... বর্ণও বেশী নয়।"

"কিন্তু আলাপ করেও তোমার মতো যদি অষ্টপ্রহর তাঁর নাম না জপ করতে পারি, তবে শেষে রাগ করো না যেন।"

ধীরা রেগে বলল, "হয়েছে, হয়েছে। আমি না হয় মলী মামীর নাম জপ করি। আর তুমি? ডন ব্র্যাডম্যান, লেন হাটন আরও ঐ রকম কী সব বিলাতী দেবতাদের নামে যে ঘুমের ঘোরেও চেঁচিয়ে ওঠ, সে বুঝি আর আমি জানিনে? একবার দেখোই না মলী মামীকে, মুণ্ডু ঘুরে যাবে।"

সমীর কপট গাম্ভীর্যে ছ' হাত দিয়ে নিজের মাথাটাকে এদিকে ওদিকে নাড়া দিয়ে বলল, "মাথাটা বেশ শক্ত বসে আছে কাঁধের ওপরে। বেশী ঘুরতে পাবে না।"

সমীরের ভঙ্গি দেখে ধীরা কলহাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। বলল, "জানো, মান্নামাসি বলেন, মলী মামীকে দেখলে পুরুষ মানুষের নাকি আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। আসলে মান্নামাসি

মলী মামীকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। আড়ালে গাল দিয়ে বলেন,—ছেলেধরা। তাঁর মেয়ের সঙ্গে যে দু'-একটি ছেলের বিয়ের কথা হয়েছে তাদের—, এই রে! নাম করতে না করতেই, এদিকে আসছেন। চল চল ওদিকে পালাই। আমাদের দুজনকে এক সঙ্গে দেখতে পেলে আর রক্ষে রাখবেন না।"

মলী সেন শিবনাথকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

তিনি এসে প্রশ্ন করলেন, "আমাকে কী দরকার?"

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যোগ্য প্রশ্নই বটে!

কিন্তু মলী সেন সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য না করে সহজ কণ্ঠেই বললেন, "দৈনিক বিশ্ববার্তার ফটোগ্রাফার আসবে এক্ষুণি। একটা ফটো নিতে চায়।"

"ফটো? কার, আমার?"

"হ্যাঁ, তোমার এবং আমার।"

ব্যাপারটা শিবনাথের কাছে কিছুমাত্র স্পষ্ট হলো না।

বিস্ময়াবিষ্ট নেত্রে স্ত্রীর পানে তাকাতেই মলী সেন ব্যাখ্যা করলেন, "বিশ্ববার্তা আমাদের এই সাহায্য রজনীর খবর খুব ফলাও করে ছাপছে। কাল অভিনয়ের রিভিউর সঙ্গে

ছাপবার জন্যে অভিনেতা, অভিনেত্রী ও উদ্যোক্তাদের কয়েকখানা ছবি নিতে চায়। তাদের নিজেদের ফটোগ্রাফার আসবে এক্ষুণি।"

মলী সেনের উদ্যোগে এই নাট্যানুষ্ঠানের প্রতি বিশ্ববার্তার এই বিশেষ মনোযোগের অবশ্য একটু সবিশেষ হেতু আছে।

বিশ্ববার্তার সম্পাদককে আমন্ত্রণ করা হয়েছে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে। প্রতি সপ্তাহেই তিনি শহর ও পল্লীর একাধিক সভা সমিতির হয় সভাপতিত্ব, নয় তো, উদ্বোধন করে থাকেন। ছাত্রদের রবীন্দ্র-জয়ন্তী, বৃদ্ধদের বৈষ্ণব সম্মেলন, তরুণদের সাহিত্য সভা, হ্যানিম্যান স্মৃতি বার্ষিকী, পঞ্জিকা সংস্কার বা নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সমিতির অধিবেশন প্রভৃতি সর্বত্র তাঁর সমান গতিবিধি। প্রত্যেকটিতে তাঁর সমান ওজস্বিনী বক্তৃতা। সভার উদ্যোক্তারা খুবই খুশি হয়। সারগর্ভ ভাষণের জন্যে নয়, প্রচারসাফল্যের জন্যে। পরদিন সম্পাদকের নিজ কাগজে ডবল কলাম হেডিং-এ বক্তৃতার সঙ্গে সভার যে সুদীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয়, সেটা যথাস্থানে ছাপা হলে কলাম ইঞ্চি দরে স্থূল অঙ্কের বিল মেটাতে হতো।

অবশ্য এই উদ্বোধনের ব্যাপারটা কেন্দ্র করেই ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে একটা অপ্রীতিকর মতবিরোধেরও উদ্ভব হয়েছিল।

বিপদ এই যে, সংবাদপত্র জগতে বিশ্ববার্তার প্রতিদ্বন্দ্বী আছে এবং তার সম্পাদকেরও অনুরাগী লোকের অভাব নেই। ফলে সভাপতির আসন নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বিরোধী

দলের মুখপাত্র, বলল, "বিশ্ববার্তার সম্পাদককে ডাকা ভুল হয়েছে।"

অপর পক্ষ তা মানতে রাজী নয়। তাদের জবাব,—"ভুল যে নয় তা বুঝতে পারবে অভিনয়ের পরদিন সকালের বিশ্ববার্তা দেখলে।"

"সেই সঙ্গে 'নবীন ভারতটা'ও দেখব তো? বিশ্ববার্তা যেমন ফলাও করে বিবরণ ছাপবে, নবীন ভারত তেমনি তার নামটুকুও উল্লেখ করবে না।"

"কেন? তাদের রিপোর্টারকে কম্‌প্লিমেন্টারী টিকিট দিই নি?"

"ওঃ, তা হলে আর কি? একেবারে নবীন ভারতের মাথা কিনে বসে আছ! রিপোর্টারদের ডেকে কী হয়? তাদের রিপোর্ট তো হবে চার পাঁচ লাইন। কাগজের এক কোণে স্থানীয় সংবাদ বা আবহাওয়া খবরের নীচে ছাপা হবে। কারও চোখেও পড়বে না।"

"তা হলে আর কি করা যাবে? নবীন ভারতে না হয় না-ই বেরুবে।"

"না-ই বেরুবে? নবীন ভারতের সার্কুলেশান কত জানো?"

বিশ্ববার্তার বন্ধু ব্যঙ্গস্বরে বলল, "সার্কুলেশান যাই হোক, পাঠক কারা? নবীন ভারত তো বেশী কেনে শুনেছি দোকানীরা। পৃষ্ঠা সংখ্যা বেশী, পরের দিন প্যাকেট বাঁধার কাজে লাগে।"

"আর তোমার বিশ্ববার্তার বিক্রি বুঝি সব বিশ্ববিদ্যালয়ে?

নবীন ভারতের সম্পাদককেই আমাদের অনুষ্ঠানে ডাকা উচিত ছিল এ-কথা আমি হাজার বার বলব, তাতে মিসেস সেন খুশি হোন আর নাই হোন।"—বলে নবীন ভারত-সেবক মলী সেনের পানে তাকাল।

মলী সেন বললেন, "আমি একটুও অখুশি হই নি, সতীশ বাবু। আমাদের এ-সব ব্যাপারে যত বেশী পত্রিকার সহায়তা পাওয়া যায় ততই ভালো। পাবলিকের কাজে পাবলিকের সহানুভূতি না পেলে চলবে কেন? আর প্রেস পাবলিসিটি না হলে কি আজকাল লোকের সমর্থন মেলে? বিশ্ববার্তার সম্পাদককে ডাকা হয়েছে, হয়েছে। নবীন ভারতের সম্পাদককেও ডাকলে ক্ষতি কি?"

ক্ষতি নেই। কিন্তু অসুবিধা আছে।

সম্পাদকেরা তো একজন সাধারণ শ্রোতা বা দর্শক হিসাবে সভা সমিতিতে আসতে পারেন না। বিশেষতঃ এক সম্পাদক যে-সভায় বিশেষ একটি অনুষ্ঠান সম্পাদনের মর্যাদা নিয়ে আসছেন তাতে অপর সম্পাদকের নিষ্ক্রিয় উপস্থিতি কল্পনা করাও অসম্ভব। অথচ একই সভার দুজন উদ্বোধনকর্তাও সম্ভব নয়। গৌরবে বহুবচন ব্যাকরণে আছে বটে, জীবিত ব্যক্তির বেলায় তো তা হওয়ার উপায় নেই।

মলী সেনই মীমাংসা করলেন সমস্যার। পূর্ব-নির্ধারিত ব্যবস্থানুযায়ী বিশ্ববার্তার সম্পাদক করবেন উদ্বোধন। নবীন ভারতের সম্পাদককেও আমন্ত্রণ করা হলো। তিনি হবেন প্রধান অতিথি—গেস্ট ইন চীফ।

এ-সকল নেপথ্য-তথ্য শিবনাথের জানা ছিল না। ফটো তোলার প্রস্তাবে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার ফটোর কী প্রয়োজন? তোমাদের অভিনয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী?"

"নেই তা জানি। কিন্তু সম্পর্ক রাখলে দোষ কী?"

"দুর্গতদের দোহাই দিয়ে আনন্দ করায় আমার রুচি নেই।" বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতেই শিবনাথের কণ্ঠে কিছুটা উত্তাপের আভাস ছিল। ৮

মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "দুর্গতদের দোহাই না দিয়ে শুধু আমোদের জন্যেই নাটক করলে তুমি তাতে খুশি হয়ে যোগ দিতে? দেখ, আমার কোনো ব্যাপারেই তোমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, তোমার কোনো কাজেও আমার কোনো উৎসাহ নেই—এ তো দুজনের কারুরই জানতে বাকী নেই। আজ নূতন করে তা নিয়ে তর্ক করা পণ্ডশ্রম। এই অভিনয় আয়োজনে তোমার যোগ নেই, এতে আমি দুঃখিত নই। অনুমান করছি, মনোবেদনায় তোমারও বক্ষ বিদীর্ণ হচ্ছে না। কিন্তু ফটো তোলাতেই বা এত আপত্তি কিসের? কাল কাগজে তোমার ও আমার ছবি এক সঙ্গে ছাপা হলেই কেউ কিছু মানহানির মামলা দায়ের করবে না।"

"না তা করবে না, কিন্তু—"

শিবনাথের বক্তব্য শেষ হওয়ার পূর্বেই ফটোগ্রাফার সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন সুরেন লাহিড়ী। সাহিত্যিক। অন্ততঃ

তিনি নিজে তাই মনে করেন। করাটা বোধ করি খুব অন্যায়ও নয়। বাংলা দেশে এমন সাপ্তাহিক, মাসিক, পূজা সংখ্যা ও বিশেষ সংখ্যা কমই আছে যাতে সুরেন লাহিড়ীর কবিতা, প্রবন্ধ বা গল্প প্রকাশিত না হয়। এখানে চুপি চুপি বলে দেওয়া প্রয়োজন যে, লাহিড়ী একটা নামজাদা ব্যাঙ্কের পাবলিসিটি অফিসার অর্থাৎ বিজ্ঞাপন বিতরণের কর্তা।

সামাজিক মর্যাদা বা অর্থ-গৌরবে লাহিড়ী মশায় ঠিক মলী সেনদের গোষ্ঠীতে নন। শুধু সাহিত্যিক পরিচয়েই তিনি সেখানে প্রবেশাধিকার পেয়েছেন। এই সাহায্য রজনীর প্রচারসচিবের কাজ তিনি স্বেচ্ছায় এবং সানন্দেই গ্রহণ করেছেন। বললেন, "এই যে আপনারা প্র[illegible] হয়েই আছেন। ইনিই বিশ্ববার্তার ফটোগ্রাফার। নিন মশাই, আপনার যে ক'খানা ফটো দরকার, তুলে নিন।"

শিবনাথ যথাসাধ্য স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু সুরেন বাবু, আমার ছবি আবার কেন? আপনাদের অভিনয়ের পাত্র-পাত্রীদের—"

"সে তো নেওয়া হবেই। আগে আপনাদেরটা হয়ে যাক। আপনারা হলেন জয়েণ্ট প্রডিউসরস। কাগজে আজকের এনাউন্সমেণ্টটা দেখেন নি বুঝি! প্রথম লাইনেই বড় বড় অক্ষরে লেখা, মিস্টার শিবনাথ এ্যাণ্ড মিসেস মলী সেন প্রেসেণ্ট বেঙ্গলী রোমান্টিক মিউজিক্যাল—'স্বপন কুহেলী'। হুঃ, আমার পাবলিসিটির স্টাইলই আলাদা। একেবারে বিলেতী কায়দা।" আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন সুরেন লাহিড়ী।

শিবনাথের হাতে একখানা সংবাদপত্র দিয়ে বললেন, "দেখুন একবার পড়ে, আজকের বিশ্ববার্তা কী লিখেছে।"

পত্রিকার পৃষ্ঠে লাহিড়ী কর্তৃক সযত্নে লাল পেন্সিলে চিহ্নিত অংশটুকুর উপরে শিবনাথ দ্রুত দৃষ্টি চালনা করলেন। মলী সেনদের অভিনয় প্রচেষ্টার সুদীর্ঘ এক কলম ব্যাপী সাধুবাদ। প্রথমে দুর্গতদের সাহায্যার্থে সম্ভ্রান্ত নরনারীর এই উদ্যম যে দেশের পক্ষে কতখানি আশা ও আশ্বাসের লক্ষণ সে সম্পর্কে বিস্তর বাগ্‌বিস্তার করে বিশ্ববার্তার নিজস্ব সংবাদদাতা বিশেষভাবে মলী সেনের গুণকীর্তন করেছেন। বেশীর ভাগ ধনীগৃহের কর্মহীনা গৃহিনীদের মতো অলস বিলাস ব্যসনে সময় অতিবাহিত না করে জনকল্যাণ ও আর্তের সহায়তায় এগিয়ে এসে তিনি সমাজের সম্মুখে যে-মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা যেন অন্য মহিলারাও অনুসরণ করেন।

কিন্তু প্রশংসা একমাত্র মিসেস সেনেরই প্রাপ্য নয়। কারণ যদিও আজ সন্ধ্যায় অভিনয়ের কোনো ভূমিকায় মিস্টার সেনকে পাদপ্রদীপের সম্মুখে দেখা যাবে না, তবুও সংবাদদাতা বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছেন যে, স্ত্রীর এই জনহিতকর উদ্যোগে মিস্টার সেনের উৎসাহ ও সহযোগিতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অভিনয়ের সববিধ ব্যবস্থায় মিস্টার সেনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও বিপুল অর্থব্যয়ের উল্লেখ করে উপসংহারে তিনি লিখেছেন,—

—"কলিকাতার শিল্প ও বাণিজ্য জগতের যাঁহারা সংবাদ রাখেন তাঁহারা সকলেই সেন ও দত্ত পরিবারের ব্যবসায়িক সম্মেলন, শিল্প

জগতে বাঙ্গালীর অতুল কীর্তি মেসার্স ডাট্ এ্যাণ্ড সেন (১৯৩০) লিমিটেডের অসাধারণ সাফল্যের কথা অবগত আছেন। এই দুই সম্ভ্রান্ত বংশের বৈবাহিক সম্বন্ধও সমাজের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক হইয়াছে। মিস্টার শিবনাথ সেন ও তাঁহার পত্নী মিসেস মলী সেন (ভূতপূর্ব দত্ত) তাঁহাদের সম্মিলিত বহু পরহিতজনক কর্মের মধ্য দিয়া তাহা প্রমাণিত করিতেছেন। হিন্দু স্বামী-স্ত্রীর প্রাচীন মহান আদর্শ এদেশ হইতে লুপ্ত হইতেছে বলিয়া যে-সকল মূঢ় সনাতনী সর্বদা আর্তনাদ করিয়া থাকেন তাঁহারা এই শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী সেন দম্পতীকে দেখিয়া জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

গর্বভরে লাহিড়ী বললেন, "পড়লেন সবটা? কী রকম? হুঃ, আমি যখন একবার পাবলিসিটির চার্জ নিয়েছি তখন,—ও কী, আপনার মুখ চোখ এমন লাল হয়ে উঠল কেন, মিস্টার সেন? এতে লজ্জা পাবার কী আছে? চলুন বারান্দায়। এবার ফটোটা শেষ করে ফেলা যাক।"

অভিনয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁদের নিজস্ব মোটর নেই তাঁদের বাড়ি থেকে মেয়েদের

গাড়ি পাঠিয়ে আনার ব্যবস্থা করেছেন মলী সেন। বুকের কাছে সিল্কের রিবন আঁটা স্বেচ্ছাসেবিকারা ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন অভিনেতা, অভিনেত্রী ও উদ্যোক্তাদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় ঠিকানা নিয়ে তালিকা প্রস্তুত করছিলেন।

বীরেশ্বর নিজ বাড়ির নম্বর ও রাস্তার নাম লিখিয়ে দিলেন। কিন্তু খুব নিশ্চিত বোধ করলেন না। সুবালা নিজে উদ্যোগী হয়ে আসবে কি? সম্ভাবনা খুবই কম। কম কেন, একেবারে নেই-ই বলা যেতে পারে। বীরেশ্বরের সম্পর্কিত কোনো অভিনয়, প্রদর্শনী বা শিল্পানুষ্ঠানে আজ পর্যন্ত কোনো দিন সুবালাকে যোগ দিতে দেখা যায় নি।

বড়দিনের সময়ে বীরেশ্বরের চিত্রপ্রদর্শনী দেখতে পরিচিত অপরিচিত নরনারীর ভীড় হয়েছে মিউজিয়মে। দৈনিক সংবাদপত্রে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় সচিত্র প্রবন্ধ লিখেছেন চিত্র-সমালোচকেরা। প্রসিদ্ধ রসজ্ঞের দল সুখ্যাতি করেছেন প্রকাশ্য সভায়। একমাত্র নিস্পৃহ, নিরাসক্ত, নিরুৎসুক রয়েছেন সুবালা। শিল্পীর নিজের স্ত্রী। বন্ধু-বান্ধবের দল আগ্রহ ভরে নিয়ে যেতে চেয়েছে সঙ্গে করে। অসুস্থতা বা অন্য কোনো অপরিহার্য গৃহকর্মের অজুহাতে সুবালা বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন তাঁদের নিমন্ত্রণ।

সে-বার ফাইন আর্টস সোসাইটির এগজিবিশানে প্রদর্শনীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রের জন্যে রাষ্ট্রপালের স্বর্ণপদক পেলেন বীরেশ্বর। বিশেষভাবে আহূত সভায় শহরের শ্রেষ্ঠ গুণী, জ্ঞানী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপস্থিতি ও সঘন করতালির মধ্যে সে-পদক

গলায় পরিয়ে দিলেন প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রী মহোদয়। স্বামীর এই সম্মান-সভায় সুবালাকে অনেক করে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সভার উদ্যোক্তাগণ। এমন সোসাইটির সভানেত্রী লেডী সুধা ব্যানার্জী স্বয়ং পত্র দ্বারা বীরেশ্বরকে অনুরোধ করেছিলেন সস্ত্রীক উপস্থিত হতে।

নির্দিষ্ট দিনে সভাস্থলে বীরেশ্বরকে আসতে হলো একক। সেদিন সকাল বেলায়ই কী এক অপরিহার্য কারণে সুবালার শ্রীরামপুরে যাওয়ার প্রয়োজন ঘটল। ছোট ভাই-এর বাড়িতে। সেখান থেকে ফিরতে ট্রেন ফেল করলেন।

সুবালা যেন এক দুর্বোধ্য প্রহেলিকা বীরেশ্বরের কাছে। গৃহকর্ম, সেবা, যত্ন ও পরিচর্যায় তাঁর নিরবচ্ছিন্ন কৃতিত্ব রন্ধ্রহীন। যথাকালে হাতের কাছে প্রয়োজনীয় জিনিষটি বীরেশ্বর পেয়ে আসছেন সর্বদা। ঘড়ির কাঁটার মতো নিঃশব্দ নিয়মে স্বামীর আহার, নিদ্রা, পোষাক, পরিচ্ছদ, আরাম, আয়েশের ব্যবস্থা করেন সুবালা অনলস ঐকান্তিকতায়।

আপিসের বরাদ্দ কাজের চাপে দিনের বেলায় নিজের কাজ করার সময় থাকে না বীরেশ্বরের। অথচ ব্যক্তিগত চিত্রাঙ্কনে অর্থাগম হয় প্রচুর। তাই প্রায় প্রত্যহই অনেক রাত অবধি জেগে বীরেশ্বর ছবি আঁকেন। সে-সময়ে এক পেয়ালা গরম কফি পেলে তিনি খুশি হন। ছাত্রাবস্থায় বরোদায় এই অভ্যাসের সুরু। কথাচ্ছলে বীরেশ্বর একদিন তার উল্লেখ করেছিলেন। তারপর থেকে ইজেলের পাশে একটি ছোট টিপাইতে নিয়মিত তার ব্যবস্থা হয়ে আসছে

আজ সাত বছর। পেয়ালা, পিরিচ, ফ্লাস্কভর্তি গরম কফি, দুধ, চিনি। একদিনের জন্যেও ব্যতিক্রম হয় নি।

রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে অস্পষ্ট অস্ফুট অর্ধোক্তি করার অভ্যাস আছে বীরেশ্বরের। কে যেন সুবালাকে বলেছে, হাত বুকের উপরে চেপে রেখে ঘুমোলে দুঃস্বপ্ন থেকে এমন হয়। পুত্র নিয়ে সুবালা ঘুমোন এক ঘরে। বীরেশ্বরের শয্যা পৃথক কক্ষে। কিন্তু প্রতি রাত্রিতে অন্ততঃ একবার সুবালা এসে মশারি তুলে দেখে যান নিদ্রিত স্বামীর বাহু দুটি তাঁর বক্ষের উপর ন্যস্ত না রয়। বীরেশ্বরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সম্ভবপর সর্বপ্রকার আয়োজনের প্রতি সুবালার অপলক দৃষ্টি।

তবুও উভয়ের পরিপূর্ণ যোগ নেই জীবনে। কোথায় যেন গ্রন্থি হয়েছে শিথিল, মর্মে রয়েছে শূন্যতা। বীরেশ্বর অনুভূতি দিয়ে তার আভাস পান অন্তরে, কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে তার নিশানা খুঁজে পান না।

অসুস্থ হয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে হলে সুবালা স্বামীর সঙ্গে যাবেন নিশ্চিত। পূজার ছুটিতে শিলং বেড়াতে গেলে বীরেশ্বরকে যেতে হয় একা। প্রতি বৎসরই কোনো না কোনো প্রতিবন্ধক দেখা দেয় সুবালার পক্ষে। পরিপাটিভাবে বীরেশ্বরের বাক্স গুছিয়ে দিতে দিতে বলেন, আসছে বারে তিনি যাবেন।

সেই প্রতিশ্রুত আগামী বৎসর আসে, যায়, বিলীন হয় বিগত বৎসরের বিস্মৃত অতীতে। স্বামীর সঙ্গে সুবালার দার্জিলিং, পুরী কিংবা মধুপুর ভ্রমণ আর কিছুতেই হয়ে ওঠে

না। যথাকালে যথারীতি বিশেষ কোনো অসুবিধা দেখা দেয় প্রায় অবধারিত রূপে। ছেলের এগজামীন, বোনের বিয়ে, নয় তো বাড়ির অব্যবস্থা কিম্বা অন্য আর কিছু।

অভিনয়মঞ্চ থেকে প্রেক্ষাগারে যাতায়াতের সঙ্কীর্ণ গলিপথটায় নিখিলের সঙ্গে মান্নামাসির প্রায় মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন, সংসারে কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর লোককে যথাসাধ্য এড়িয়ে চলতে হয়। যথা,—গরীব আত্মীয়, বীমার দালাল ও সর্বজনীন পূজার সেক্রেটারী। মান্নামাসি এর কোনোটিই নন। তবুও নিখিল তাঁকে দেখলেই শঙ্কিত হন। চাণক্যশ্লোক নিখিলের ভালো পড়া নেই। কিন্তু মনে হয়, মান্নামাসিকে তিনি শৃঙ্গীনামের পর্যায়েই গণ্য করেন এবং শুধু শত নয়, প্রায় সহস্র হস্তেন দূরে রাখতে চেষ্টা করেন।

এত কাছাকাছিতে না দেখার ভান করে পাশ কাটিয়ে যাওয়া অসম্ভব। অকস্মাৎ পিছন ফিরে প্রস্থানোদ্যোগ ততোধিক দৃষ্টিকটু। কী করবেন ভেবে স্থির করার পূর্বেই মুখে চোখে সৌজন্যের বন্যা বইয়ে দিয়ে মান্নামাসি বললেন,

"এই যে, মিস্টার রয়, থিয়েটারের ব্যবস্থা নিয়ে কী পরিশ্রমটাই না করতে হচ্ছে আপনাকে! গৌরী বলে, 'মা মিস্টার রয়, শেষকালে একটা অসুখ-বিসুখ না বাধিয়ে বসেন, আমার তো সে-ই ভয়'। মিথ্যে নয়—"

নিরুপায় নিখিল বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি মেয়েদের ড্রেসিং-রুম থেকে আসছেন? সেখানে নীরজা আছে কি?"

"দেখি নি তো। তা'কে কী দরকার?"

"বেচারা হঠাৎ আছাড় খেয়ে হাত কেটে ফেলেছে। এই মাত্র স্টেজ ম্যানেজার বললেন, তাঁর কাছে ফার্স্ট-এইডের বাক্স আছে। ব্যাণ্ডেজ যদি বা না হয়, অন্ততঃ একটু আইওডিন দিয়ে দিলেও কাজ হতো। তাই তাঁকে খুঁজছিলেম।"

মান্নামাসি আপ্যায়নের ভঙ্গিতে বললেন, "আচ্ছা, আমি দেখছি, নীরজা কোথায় আছে। কিন্তু এদিকে আমি যে যাচ্ছিলেম আপনারই সন্ধানে। গৌরী সেই কখন থেকে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

গৌরী মান্নামাসির মেয়ে। বিবাহযোগ্যা।

নিখিল জিজ্ঞাসা করলেন, "তাই নাকি? কেন বলুন তো?"

"তা তো বলেন নি কিছু। তবে মনে হচ্ছে, চা খাওয়ার জন্যে।"

"সে জন্যে আমাকে কেন?"

"তা জানেন না বুঝি? তা হলে খুলেই বলছি, মিস্টার রয়। অনেক বেলায় এখানকার রিহাসেল থেকে বাড়ি

ফিরে গেল। আমি বললেম, চান করে খেয়েদেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিতে, নইলে রাত্তিরে ক্লান্তি লাগবে, গানের গলা খুলবে না। ওমা, খানিক বাদে দেখি, মেয়ে রান্নাঘরে বসে শিঙ্গাড়া ভাজছে। কেন? না, মিস্টার রয়ের জন্যে ফ্লাস্কে চা আর টিফিন বাস্কেটে খাবার নিয়ে যেতে হবে। থিয়েটারের বাড়িতে যা হৈ-হট্টগোলের ব্যাপার। সেখানে সময় মতো চা জুটবে কি না কে জানে।"

মান্নামাসিকে নিখিল এতদিনে অনেকটাই জেনেছেন। তাঁর এ-ধরনের হৃদয়গ্রাহী রচনাশক্তির সঙ্গেও নিখিলের পরিচয় এই প্রথম নয়। তাই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ না করে শুধু সাধারণ ভদ্রতার ভঙ্গিতে বললেন, "মিসেস পাকড়াশী---"

বাধা দিয়ে অত্যন্ত আত্মীয়তার সুরে মান্নামাসি বললেন, "না, না, ঐ 'মিসেস পাকরাশী'টা আপনাকে ছাড়তে হবে, মিস্টার রয়। ঐ দেখ, আমিই বা বলছি কাকে? তুমি তো নিজের পেটের ছেলের মতো, তোমাকে 'আপনি' বলা কি আমার ভালো দেখায়? তা দেখ, নিখিল, তোমাদের ঐ সাহেবী কায়দায় মিস্টার মিসেসগুলি আপিসে, ক্লাবেই বলো। আপনা-আপনির মধ্যে ও-সব কেন? এই তো সে-দিন গৌরীও বলছিল, 'মা, মিস্টার রয় যে আমাকে সর্বক্ষণ মিস পাকড়াশী বলেন, আমার বড় সঙ্কোচ লাগে। মনে হয় যেন ট্রেনের দুজন প্যাসেঞ্জার, গাড়ির কামরায় আলাপ। যে যার স্টেশনে নেমে গেলেই শেষ।' না, বাপু, তুমি এখন থেকে আমাকে মান্নামাসিই বলো।"

"তা না হয় বলব। কিন্তু আমি বলছিলেম, মিস পাকড়াশী যে আমার জন্যে এতখানি কষ্ট করেছেন, সে-জন্যে তাঁকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবেন। কিন্তু আমার চা-এর দরকার নেই।" বলে নিখিল প্রস্থানোদ্যম করলেন।

মান্নামাসি ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, "সে তা'হলে তোমাকে নিজে এসে বলতে হবে, নিখিল। আমার বলায় হবে না।"

মরু-যুদ্ধে জার্মান সেনাপতির মতো প্রতিপক্ষের সর্বাপেক্ষা দুর্বল অংশে আঘাত হানলেন মান্নামাসি। কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট গাম্ভীর্য আরোপ করে বলতে লাগলেন, "তুমি তো জানো না, নিখিল, ঠিক সময়ে চা-এর পেয়ালাটি হাতে না পেলে গৌরী একেবারে নেতিয়ে পড়ে। মেয়ের আমার ঐ রোগ। নিজেই স্বীকার করে। বলে, 'দুদিন ভাত না খেয়ে থাকতে বলো, রাজী আছি। কিন্তু চা না পেলে বাঁচব না।' সেই গৌরী কিনা এই সন্ধ্যে অবধি চা না খেয়ে আছে।"

মান্নামাসি নিখিলের মুখের পানে তাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু নিখিলের জন্যে আপন কন্যার এই কৃচ্ছ্রসাধনের সকরুণ কাহিনী উপস্থিত শ্রোতার মনে অনুতাপের দাবানল সৃষ্টি করেছে এমন কোনো চিহ্ন সেখানে দেখা গেল না।

নিখিল পূর্ববৎ ভদ্রতায় শুধু বললেন, "আমি দুঃখিত।"

জেনারেল রোমেল রণকৌশল পরিবর্তন করলেন। শ্লেষমিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, "আমি সেই কখন থেকে বলছি, গৌরী, তুই চা-টা খেয়ে নে। মিস্টার রয়ের জন্যে মিছে বসে থেকে মাথা ধরাস নে। তিনি হয়তো অন্য কোথাও চা

খাচ্ছেন। তা মেয়ে কি শোনে। বলে 'না, মা, অমন কথাটি বলো না। মিস্টার রয়ের নাম করে এনেছি, তিনি না খেলে বরং বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে সব নর্দমায় ফেলে দেব।"

বৃথা। খোঁচাটা নিখিল যে শুধু অম্লানবদনে পরিপাক করলেন তাই নয়, অধিকন্তু অকপট স্বীকৃতি দ্বারা কথার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটুকুকে আরও সুস্পষ্ট করে তুললেন। বললেন, "আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন মান্নামাসি। সাড়ে তিনটা বাজতেই মিসেস সেন আমাকে চা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। চা আর নয়। এখন এক পেয়ালা কফি চাই। সে-ও মিসেস সেন তৈরী করেছেন, বলে গেছেন। এখন তাঁর ওখানেই যাচ্ছি। আচ্ছা, চলি। নমস্কার।"

ক্রোধে মান্নামাসির দুই কর্ণ তপ্ত, ললাট কুঞ্চিত এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ত্বরান্বিত হয়ে উঠল। ক্ষোভে ও অপমানের জ্বালায় তিনি প্রথমে উত্তেজিত ও পরে ম্রিয়মান হয়ে গেলেন।

ছিঃ, ছিঃ, কী লজ্জা! এমন প্রকাশ্য অবজ্ঞা ও সুস্পষ্ট প্রত্যাখ্যানের কলঙ্ক তিনি আর কত কাল বহন করবেন? শুধু তো নিখিলই নয়। ইতিপূর্বে আরও কয়েকটি সম্ভবপর পাত্রের কাছেও তো তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।

মান্নামাসি আর যাই হোন, একেবারে নির্বোধ নন। যোগ্য জামাতা সংগ্রহের ব্যগ্রতায় মেয়ের নাম করে তিনি যে-সকল কাহিনী রচনা করেন, শ্রোতাদের কাছে সেগুলি যে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না সে-কথা তিনি নিজেও মনে মনে বোঝেন। কিন্তু উপায়ান্তর ভেবে পান না। তিনি

ভুলে যান যে, এ-যুগে যারা নিজেই নিজের পত্নী নির্বাচন করে তারা রূপকথার রাজপুত্রের মতো ভাটের মুখে গুণপনা শুনে রাজকন্যার গলায় মালা দেবে এমন সম্ভাবনা নেই। জানেন না যে, কোর্টশিপের মার্কেটই হচ্ছে একমাত্র বাজার যেখানে মিডল্‌ম্যান নেই। সে স্বয়ং কন্যার মা হলেও নয়!

কিন্তু এই ছেলেগুলিই বা কী? চোখ কান বলে কি কিছু নেই এদের? মান্নামাসি ভাবেন। এত পড়াশুনা করেও এক একটা যেন আস্ত হস্তীমূর্খ। কাণ্ডজ্ঞান বিন্দুমাত্রও নেই। এই যে নিখিল,—মস্ত এঞ্জিনীয়র, বিলাতী ডিগ্রি, বড় চাকরি। অথচ একটা অপদার্থ ফ্লার্ট মেয়েমানুষ নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। তার হুঁশ আছে একটু! হুঃ, মিসেস সেনের কাছে কফি খেতে যাচ্ছেন! বলতে লজ্জা হলো না একটু! পুরুষ জাতটা এমনি নির্লজ্জ বেহায়াই বটে! তাদের সংস্রব পুরোপুরি বর্জন করাই বিধেয়।

কিন্তু তার কি উপায় আছে? পুরুষকে বাদ দিলে আর যাই হোক, মেয়ের তো বর জোটে না। ভাবনা তো ঐখানে এবং সব চেয়ে দুর্ভাগ্য এই যে, সে-ভাবনাটা একা মান্নামাসিরই। আর কারো নয়। দুর্ভাবনাভারে বহু বিনিদ্র রজনীতে কন্যার নিশ্চিন্ত নিদ্রালস দেহের পানে তাকিয়ে তিনি সখেদে বাংলা প্রচলিত প্রবাদ-বিশেষ স্মরণ করেছেন। হায়, হতভাগা মেয়েটার যদি একটু নিজের হিতাহিত বোধ থাকতো! এই তো দত্তদের বিভা, নিজেই নিজের বিয়ে ঠিক করল। প্রীতি রায়, বেথুনে গৌরীর দু' ক্লাশ নীচে পড়তো;

দেখতেও এমন কিছু আহা-মরি নয়। অথচ কেমন খাসা বরটি বাগাল!

আর গৌরী? কচি খুকীটি তো নয়—লোকের কাছে যতই কেন না কমিয়ে বলেন, তিনি নিজে জানেন,—মেয়ের বয়স কত! একটু যদি তার নিজের উদ্যোগ থাকতো! না দেখাবে সে কোনো আগ্রহ, না করবে তেমন খাতির আপ্যায়ন; ছেলেরা কাছে ঘেঁষবে কী ভরসায়? তারা সন্ধ্যেবেলায় সিনেমা দেখতে বললে মেয়ে বলে, মাথা ধরে। বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইলে মেয়ে জবাব দেয়, ভালো লাগে না। তিনি নিজে চেষ্টা করে যে দু' একটি প্রার্থনীয় পাত্রকে ভিড়িয়ে দিয়েছেন, তারা দু' চার দিন পরে হতাশ হয়ে সরে পড়েছে। বোকা, নিরেট বোকা। হবে না কেন? যেমন বাপ তার তেমনি মেয়ে। ঠিক বাপের ধারা পেয়েছে।

রাগে ও বিরক্তিতে মান্নামাসির সর্বাঙ্গে যেন আগুনের জ্বালা ধরল।

কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়। বাপের সঙ্গে গৌরীর মিল আছে অনেকখানি। সেটা মান্নামাসির পক্ষে রুচিকর নয়।

বাপ পরলোকে। বেঁচে থাকতে তাঁকে নিয়ে মান্নামাসির মনস্তাপের অবধি ছিল না। মৃত্যুর পরেও তাঁর স্মৃতি মনে সুখোদ্রেক করে না। বিবাহিত জীবনের নিদারুণ ব্যর্থতার জন্যে মান্নামাসি তার স্বামীকে কোনোকালে ক্ষমা করেন নি। কোনোকালে ক্ষমা করবেনও না।

রূপার জোরে কুরূপা মেয়ে পার হওয়ার চির প্রচলিত

পন্থায় মান্নামাসিও নিশ্চয়ই ধনবান পতি লাভ করতে পারতেন। কিন্তু তা হয় নি।

এ জগতে নিঃসম্বল দরিদ্রের আছে মহত্ত্ব, অমিতব্যয়ী ধনীর আছে ঔদার্য। ব্যয়কুণ্ঠ বিত্তবানের নেই কোনোটাই। সংসারে কৃপণ বড়লোকেরাই সব চেয়ে ভয়াবহ। মান্নামাসির বাবার কাছেও মেয়ের মায়ার চাইতে টাকার মায়া ছিল বেশী। অনেক দিন অপেক্ষার পর কন্যার যৌবন যখন উত্তীর্ণপ্রায়, খুঁজে পেতে তিনি সব চেয়ে সস্তায় যে-পাত্র সংগ্রহ করলেন তাঁর না ছিল কাঞ্চন, না ছিল কৌলীন্য।

সংসারে এক শ্রেণীর লোক আছে যারা ছাত্রজীবনে কৃতিত্বে সকলের শীর্ষস্থানে থেকে কর্মজীবনে বিফলতার গভীর তলদেশে গড়িয়ে পড়ে। জীবনের আকাশে তারা ক্ষণস্থায়ী সন্ধ্যাতারার মতো। রজনীর প্রথম প্রহরে সর্বাধিক ঔজ্জ্বল্যে দেখা দিয়ে মধ্য প্রহরে নিষ্প্রভতায় অগণিত তারকারণ্যে অলক্ষ্যে হারিয়ে যায়। মান্নামাসির স্বামী গৌরমোহন সেই জাতের।

ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় গৌরমোহন কখনও দ্বিতীয় হন নি। ভবিষ্যতে তিনি জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, দ্বিতীয় আশু মুখুজ্যে, ব্রজেন শীল এমনই অসাধারণ কিছু একটা হবেন—এ সম্বন্ধে ছাত্রাবস্থায় তাঁর বন্ধুবান্ধব, মাস্টার, অধ্যাপক সবাই একমত ছিলেন। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল, শুভানুধ্যায়ীদের সকল ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করে দিয়ে তিনি হলেন হাইকোর্টের—না, জজ নয়, একজন সাধারণ উকীল।

আসল কথা, গৌরমোহনের পাণ্ডিত্য যতখানি, সাংসারিক বুদ্ধি ততখানি নয়। তিনি অতি মাত্রায় লাজুক ও মুখচোরা গোছের লোক। কলেজের পরীক্ষার খাতায় কঠিন আইনের প্রশ্নের গবেষণাপূর্ণ জবাব লিখে যে পরীক্ষকদের চমৎকৃত করেছে, সামান্য একটা জামিনের আর্জি পেশ করতে সে যে কথা খুঁজে পায় না অথবা অসংলগ্ন উক্তি করে, তার দৃষ্টান্ত তিনি। হায়, ওকালতিতে তিনি রাসবিহারী ঘোষ হবেন বলে যারা শেষ আশা রেখেছিল, গৌরমোহন তাদেরও নিরাশ করলেন।

সর্বাপেক্ষা কঠিন আঘাত পেলেন মান্নামাসি। ভবিষ্যতে বিপুল সাফল্যের দ্বারা স্বামী সকলের ঈর্ষা উৎপাদন করবেন, এই কল্পনা নিয়ে বিয়ের সময় মান্নামাসি তার শ্বশুরালয়ের ধনহীনতাকে খুব হৃষ্টচিত্তে না হলেও যা হোক এক রকম মেনে নিয়েছিলেন। সে-সফলতার আশু লক্ষণ তো কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর নয়। তবুও নিজের উদগ্র উচ্চাভিলাষের জোরে তিনি নিজকে দমতে দিলেন না। স্বামীকেও না। বললেন, "দেশী উকীলদের কেউ পোছে না। বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে এস। পসার জমতে দেরী হবে না।"

গৌরমোহন ততদিনে নিজের অক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েছেন। বুঝেছেন, বাক্‌পটু না হলে আইন ব্যবসায় চলে না। উকীল থাকতে যার হাতে মামলা আসে না, ব্যারিস্টার হলেই তার দরজায় মক্কেলের কিউ জমে যাবে এমন সম্ভাবনা কোথায়?

স্ত্রীকে বুঝিয়ে বলেন, "তার চাইতে বরং, বাগেরহাট কলেজে একজন ফিলজফীর লেকচারারের কাজ খালি আছে—কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে—"

দুই চক্ষে অজস্র অবজ্ঞা বর্ষণ করে মান্নামাসি বললেন, "ছ্যা, শেষকালে ন্যাদানে গুরুমশাই? সেও আবার কলকাতায় নয়, অজ পাড়াগাঁয়ে। তা, তোমার আর এর চাইতে কত বেশী উচ্চাকাঙ্ক্ষা হবে! ও-সব কল্পনা ছাড়ো। যা বলছি শোন। ব্যারিস্টারীর চেষ্টা দেখ।"

অসহায় গৌরমোহন অবশেষে খরচের প্রশ্ন তুললেন। জানেন একমাত্র অর্থঘটিত যুক্তিই স্ত্রীর কাছে অকাট্য। তিনি শ্বশুরেরই তো মেয়ে!

ফল হলো না। মান্নামাসি গৌরমোহনের আপত্তি সত্ত্বেও বসত বাড়িটা বাঁধা রেখে হাজার কয়েক টাকা যোগাড় করলেন। কন্যার ভবিষ্যৎ ভেবে শাশুড়ীও কিছু টাকা ধার বলে দিলেন। বলা বাহুল্য, নিজের স্বামীকে লুকিয়ে।

বিলাতে গৌরমোহন যথারীতি লীঙ্কনস্ ইন থেকে পরীক্ষায় সব ক'টি পেপারে প্রথম হলেন, প্রাচীন ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের বিবর্তন সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ থিসিস লিখে লণ্ডন ইউনিভার্সিটির ডক্টরেট পেলেন এবং অতঃপর দেশে ফিরে এসে ব্রীফহীন ব্যারিস্টারদের সংখ্যাবৃদ্ধি দ্বারা হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীর শোভা বর্ধন করতে লাগলেন।

দুঃখে ও হতাশায় মান্নামাসির অসন্তোষের আর সীমা রইল না। পরিচিত বন্ধু বান্ধবীদের সুখ ও ঐশ্বর্যের কথা

স্মরণ করে নিজগৃহের অসচ্ছলতা তাঁর কাছে ক্রমশঃ অধিকতর অসহনীয় হয়ে উঠতে লাগল।

দাশ সাহেবের কেমন ঝকঝকে দামী জ্যাগুয়ার। গৌরমোহনের একটা ছোট অস্টিনও হয় না কেন? রিচি রোডের সুহাসিনীর যেমন রেডিওগ্রাম ও রেফ্রিজারেটার, টেলীফোন, বাবুর্চী, বেয়ারা,—মান্নামাসির তেমন কিছুই নেই। এর চেয়ে ঘোরতর অবিচার ভগবানের রাজ্যে আর কী হতে পারে? অথচ গুণে, বুদ্ধিতে মান্নামাসির চাইতে তার যোগ্যতা এমন কীই বা বেশী। শুধুমাত্র গৌরমোহনের হাতে পড়েই তাঁর এ-দুরবস্থা, এ-কথা মনে করে স্বামীর প্রতি মান্নামাসির অশ্রদ্ধা দিনে দিনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতে লাগল।

তাঁর বর্তমান দুর্ভাগ্যের পশ্চাতে মান্নামাসি শুধু গৌরমোহনের অক্ষমতাই নয়, দুরভিসন্ধিও অবিষ্কার করলেন। গৌরমোহন যে নিজের ভবিষ্যৎ অসাফল্যের কথা আগের ভাগে জেনে শুনেই মান্নামাসিকে বিয়ে করে ঠকিয়েছেন, সে-সন্দেহ ক্রমশঃই তাঁর মনে দৃঢ়মূল হলো। গৌরমোহনের সঙ্গে বিয়ে না হলে তিনি যে অপর কোনো ধনশালীর ঘরে গৃহিণী হতেন, সে-বিষয়ে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। কেন, ঝামাপুকুরের মৈত্রদের বাড়িতে বিয়ের কথা হয় নি তাঁর? সান্ন্যাল এটর্নীর বড় ছেলে দেখতে আসে নি তাকে? সেখানে বিয়ে হলে যে আজ তিনি সোনার ইট গেঁথে গলায় পরতে পারতেন। সে-খবর রাখে কেউ?

না। অন্ততঃ গৌরমোহন রাখেন না। আর রাখলেই

বা কী ? এ-সকল উক্তির প্রত্যুক্তি অবশ্যই আছে। সোনার ইট গেঁথে সত্যি গলায় পরা যায় কিনা এবং পরা গেলেও সাধারণ বিছে হারের চেয়ে তাতে বেশী সুন্দরী দেখায় কিনা, সে-বিষয়ে মতভেদের অবকাশ নিশ্চয়ই আছে। তবে ইতিমধ্যে এটুকু বোঝার মতো কাণ্ডজ্ঞান গৌরমোহনের হয়েছে যে, স্ত্রীর সঙ্গে বাদ প্রতিবাদ অপেক্ষা নিরুত্তর থাকাটাই অধিকতর নিরাপদ।

কিন্তু মৌনব্রতই যে সংসারে নিশ্চিত পরিত্রাণের পথ নয়, সে-কথাও গৌরমোহন ক্ষণে ক্ষণে উপলব্ধি করেন। হয়তো তিনি পড়ার ঘরে একাগ্র চিত্তে নতুন কোনো পুস্তকে মনোনিবেশ করেছেন এমন সময় অকস্মাৎ সেখানে মান্নামাসির আবির্ভাব ঘটল। অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, "গৌরীর স্কুলের বাস বন্ধ করে দাও।"

গৌরমোহন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তা'হলে সে স্কুলে যাবে কেমন করে ?"

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর শুনলেন,—"পায়ে হেঁটে।"

গৌরমোহন বুঝলেন, এটা রাগের কথা।

অত্যন্ত নম্রকণ্ঠে বললেন, "বাসের তো ভাড়া মাত্র দশ টাকা। সে ক'টা টাকা বাঁচিয়ে আর—"

"বটে ? দশটা টাকা তোমার গ্রাহ্যের মধ্যেই নয় ? মাসের শেষে ক' হাজার টাকা এনে হাতে দাও শুনি ? কী করে সংসার চলে খবর রাখ তার ?" ক্রোধে একেবারে ফেটে পড়লেন মান্নামাসি।

আবার একদিন হয়তো এসে বললেন, "গৌরীর স্কুলে যাওয়ার শাড়ি নেই। যাও, বাজার থেকে কয়েকটা জামা কাপড় নিয়ে এস দিকিন।"

সিল্ক, জর্জেট, ঢাকাই, বিষ্ণুপুরী ইত্যাদির এমন এক ফর্দ দিলেন মান্নামাসি যা স্কুলে যাওয়ার কথাই নেই, ফুলশয্যার তত্ত্বের পক্ষেও বেশী মনে হতে পারে।

গৌরমোহন সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এত কিসের জন্যে?"

"এটুকুতেই তোমার চোখ কপালে উঠল? আমার বাপের বাড়িতে ছেলেবেলায় কখনও যে এক জামা পরে দু'দিন স্কুলে যাই নি, তা জানো? বেশ তো, মেয়েকে অনাথ আশ্রমে দিয়ে দাও; কাপড়, জামা কিছুই কিনতে হবে না।" বলে মান্নামাসি সবেগে প্রস্থান করলেন।

কন্যাকে কেন্দ্র করে এই কলহের পিছনে একটু বিশেষ কারণ আছে।

মান্নামাসি জানেন, মেয়ের প্রতি গৌরমোহনের স্নেহ সাধারণের চাইতে অনেকটা বেশী। চতুর শাশুড়ীরা যেমন ঝিকে ভর্ৎসনা করে বউকে শেখান, তেমনি তিনিও গৌরীকে উপলক্ষ্য করে তার বাপকে জব্দ করে থাকেন। এমন কি, গৌরমোহন স্ত্রীর সাক্ষাতে কন্যাকে যথেষ্ট আদর করতেও কুণ্ঠা বোধ করেন। মান্নামাসি দেখতে পেলেই মন্তব্য করেন, "থাক, থাক, হয়েছে তো ভারি একটা মেয়ে। বিয়ে দিতে জিভ বেরিয়ে যাবে। হতো যদি ছেলে, তবুও না হয় বুঝতেম!"

তিনি যে পুত্রসন্তান প্রসব না করে কন্যা জন্ম দিয়েছেন তার সমুদয় অপরাধও একমাত্র গৌরমোহনেরই, এ-সম্পর্কে মান্নামাসির মনে কিছুমাত্র সংশয় নেই।

মাঝে মাঝে স্বামীর চরিত্রে উদ্যোগের অভাব তিনি আপন কৌশল ও আয়োজনের দ্বারা পরিপূরণের চেষ্টা করেন।

যে-সব এটর্নী ইচ্ছা করলেই গৌরমোহনকে ব্রীফ দিতে পারেন, মান্নামাসি বেছে বেছে তাঁদের ডিনার খাওয়ান। সিনীয়র ব্যারিস্টারদের বাড়ি বয়ে এসে কারো সঙ্গে সম্পর্ক পাতান কাকাবাবু। কারো স্ত্রীকে ডাকেন দিদি, কারো বা নাতনীর জন্মদিনে 'বিধবা-কল্যাণ সমিতি' থেকে উলের জাম্পার কিনে এনে নিজের হাতে বোনা বলে চালিয়ে দেন উপহার।

কিন্তু পৈতৃক কৃপণ স্বভাব কাটিয়ে উঠতে না পারার ফলে নিমন্ত্রিতেরা বাড়ি ফিরে খাদ্যের পরিমাণ নিয়ে নিজেদের মধ্যে করেন কৌতুক। উপহারের স্বল্পমূল্যতা নিয়ে গিন্নীরা আড়ালে করেন নিন্দা। গৌরমোহনের চেম্বার মক্কেল অভাবে শূন্য থাকে পূর্ববৎ।

অবশেষে আর্থিক গৌরবের অভাব রাজনৈতিক খ্যাতি দ্বারা পূরণের মানস করলেন মান্নামাসি। স্বামীকে বললেন, কর্পোরেশনের নির্বাচনে দাঁড়াতে। মেয়রের না হোক, অন্ততঃ কাউন্সিলরের স্ত্রী হলেই বা কম কী?

গৌরমোহন প্রমাদ গণনা করে বললেন, "সর্বনাশ! আমাকে লোকে ভোট দেবে কেন?"

স্ত্রী বললেন, "কেন দেবে না? ঐ রামদুলাল বটব্যালের

চাইতে তুমি কোন অংশে খাটো? সে তো আকাট মূর্খ, পাঁড় মাতাল। চোরাই মালের ব্যবসা করে। সে যদি ইলেকশানে দাঁড়াতে পারে, তুমি পারবে না কেন?"

"তার কত টাকা আছে জানো?"

"থাকুক টাকা, তুমি তো ভোটদাতাদের ঘরে মেয়ের সম্বন্ধ করতে যাচ্ছ না যে তারা তোমার টাকার খোঁজ নেবে। তারা ভোট দেবে সৎ ও যোগ্য প্রার্থী দেখে।"

'যুক্তি নির্ভুল। কিন্তু যুক্তি দিয়ে যদি নির্বাচনে জেতা যেতো, তবে আর ভাবনা ছিল কী? বাস্তবিক, একমাত্র কলেজে পরীক্ষায় পাশ করা ছাড়া লজিক যে সংসারে আর কোনো কাজে লাগে, এমন প্রমাণ নেই।

গৌরমোহন আপত্তি করলেন, "ইলেকশানে কত লোকজন চাই, তা জানো? লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ক্যানভাস করা, মিটিং করা, এ-সব করবে কে?"

"সে-সব আমি ঠিক করে রেখেছি। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তারা সবাই বলেছে, তোমার মতো বিদ্বান প্রার্থী দাঁড়ালে ইলেকশান জেতা কিছুই নয়। তারা সবাই তোমার ভলান্টিয়ার হবে, হ্যাণ্ডবিল বিলোবে, পোস্টার আঁটবে। তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।"

গৌরমোহন বুঝলেন, স্ত্রী ইতিমধ্যেই অনেকখানি অগ্রসর হয়েছেন।

সাধারণতঃ কোনো ব্যাপারেই তিনি স্ত্রীর বিরুদ্ধাচরণে সাহস করেন না। কিন্তু এবারে তাঁকে সহজে রাজী করা

গেল না। তিনি কেবলই বলেন, "আমি জেলেও যাই নি, কোনো দলেও নেই। আমাকে চেনে কে? জানে কে? ভোট দেবে কে?"

মান্নামাসি সহজে নিরস্ত হওয়ার পাত্রী নন। তিনি গৌরমোহনকে ভীতু, বুদ্ধিহীন, নিষ্কর্মা ইত্যাদি আরও যে সকল বাছা বাছা শব্দে তিরস্কার করলেন তার অধিকাংশই মুদ্রণের যোগ্য নয়। অহর্নিশি এরূপ নিষ্ঠুর তাড়নার ফলে দিন চার পাঁচ পরে অবশেষে বিধ্বস্ত গৌরমোহন আত্মসমর্পণ করলেন। নমিনেশান পেপার দস্তখত করে ভোটযুদ্ধে নামলেন।

গৌরমোহনের বিদ্যার খ্যাতি তখনও কিছুসংখ্যক লোকের মনে ছিল। গোড়াতে অনেকেই তাঁর প্রতি অনুকূল মনোভাবও দেখালেন। কিন্তু ভোটের দিন এগিয়ে আসতেই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর তৎপরতাও বৃদ্ধি পেল। সে রাতারাতি খদ্দর পরে গভর্নমেণ্টকে এলোপাতাড়ি গাল দিতে সুরু করল। পাড়ার ইউথ ক্লাবে লিখে দিল এক হাজার টাকার চেক, কনসার্ট পার্টিকে খাওয়াল ভোজ এবং মহিলা সমিতিতে দান করল দু'ডজন চরকা ও তিনখানা কলের তাঁত।

অবিলম্বে গৌরমোহনের সমর্থকদের সংখ্যা হ্রাস পেতে লাগল। ছেলেদের মধ্যে যারা কয়েক দিন আগে মাত্র গৌরমোহনের হয়ে কাজ করেছে, তারাই এখন লালকালিতে ছাপা পোস্টার কাঁধে নিয়ে প্রবীণ দেশসেবী ও পরদুঃখকাতর রামদুলাল বটব্যালকে ভোট দিয়ে জাতির মর্যাদা এবং করদাতাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার অনুরোধ জানাতে লাগল।

টিনের চোঙ্গা মুখে কালও যারা 'ভোট ফ... রমোহন' বলে চেঁচিয়েছে আজ তারা 'রামতুলালকী জয়' চীৎকারে পল্লী কাঁপিয়ে তুলল।

পত্নীর তাগাদায় গৌরমোহন নিজে ...ড়ায় যে-সকল ভদ্রমহোদয়ের সঙ্গে দেখা করে ভোট প্রার্থনা করলেন, তাঁরাও প্রসন্ন হলেন না। এ কী রকম ভোটপ্রার্থী? এ তো প্রায় কথাই বলে না। না, লোকটা যথেষ্ট বিনয়ী নয়। রামতুলাল মদ খায় বটে, কিন্তু অমন অমায়িক লোক আর হয় না। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সর্বনাশের যেটুকু বাকী ছিল তাও মান্নামাসির অতিকৃপণতায় পূর্ণ হলো। তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের জলযোগের আয়োজনে যথেষ্ট হাতটানের পরিচয় দিলেন। রামতুলালের লোকেরা যখন তু'বেলা লুচি তরকারী ও দরবেশ খাচ্ছে, তখন তু'খানা থিন এরারুট বিস্কুট ও এক পেয়ালা চা খাইয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে রাখতে চাইলে চলবে কেন? তা ছাড়া, ভোট ক্যানভাসের জন্যে দিন-চুক্তিতে যে-তিনখানা ট্যাক্সি ভাড়া করা হয়েছে, তাদের গতিবিধি সম্পর্কে তিনি এমন কড়া হিসাব নিতে সুরু করলেন যে, সেগুলি চেপে বন্ধুবান্ধবসহ স্বেচ্ছাসেবকেরা যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, চিড়িয়াখানা ও পরেশনাথের মন্দির বেড়িয়ে আসবে তার আর জো রইল না। আশ্চর্য নয় যে, অতঃপর বিরক্ত চিত্তে ভলান্টিয়ারেরা প্রায় সবাই সরে পড়ল।

ভোটের দিন গৌরমোহনের ক্যাম্পে সরবৎ ও পান

সিগারেট খেয়ে ভোটদাতারা রামদুলালকে ভোট দিয়ে এল। গৌরমোহনের জামানতের টাকাটা পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হলো।

অতঃপর মান্নামাসির আর দয়া মায়া রইল না। উঠতে বসতে তিনি স্বামীকে গঞ্জনা দিতে লাগলেন। গৌরমোহন কোনো বিষয়ে কিছু বলতে গেলেই তিনি তাঁকে থামিয়ে দেন,—"ঢের হয়েছে, তোমার আর ফোঁড়ন কাটতে হবে না। তোমার যা যোগ্যতা সে তো দেখাই গিয়েছে।"

মান্নামাসির আগ্রহাতিশয্যে তিনি যে একান্ত অনিচ্ছায়ই নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন সে-কথা মান্নামাসিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার সাহস গৌরমোহনের ছিল না। তিনি বিনা প্রতিবাদে মেনে নিলেন যে, নির্বাচনে পরাজয়ের সমুদয় দোষ একমাত্র তাঁরই।

নির্বাচনের ধকলে গৌরমোহনের শরীর ভেঙ্গে পড়ল।

গৌরী এসে বলল, "মা, বাবা মাথার যন্ত্রণায় বড় কষ্ট পাচ্ছেন, একজন ডাক্তার ডাকলে হয় না?"

নির্বাচনের ব্যয়ের প্রচণ্ড দমকা হাওয়ায় সংসারের ছিদ্রযুক্ত জীর্ণ আর্থিক তরণীটা তখন প্রায় কাৎ হয়ে পড়েছে। মান্নামাসির মেজাজ গোড়া থেকেই বিগড়ে ছিল। শ্লেষ করে বললেন, "হ্যাঁ, ডাকতে হবে বৈ কি! এ কি আর আমাদের মতো মুখ্যু লোকের মাথা যে একটা এ্যাস্পিরিনের বড়ি গিলে শুয়ে থাকবো? এ হলো পি-আর-এস, পি-এইচ-ডির মাথা! সে-মাথাধরা কি ডাক্তার না ডাকলে সারে? যাও, বিধান রায় কিম্বা নলিনী সেনকে কল্ দাওগে।"

ডাক্তার অবশ্য দু'দিন পরে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু তখন না ডাকলেও কোনো ক্ষতি ছিল না। ডাক্তার দেখে যাওয়ার ঘণ্টা পাঁচেক পরেই ম্যানিনজাইটিসে জীবনে ব্যর্থকাম, অক্ষম ও অযোগ্য স্বামী গৌরমোহনের জীবনান্ত ঘটল।

ভাগ্যের এমনই পরিহাস! তাঁর মৃত্যুর পরদিন সকালে ক্যালকাটা গেজেটে দেখা গেল, গৌরমোহনকে গভর্নমেন্ট এক ট্রাইবুন্যালের জজ নিযুক্ত করেছেন!

মান্নামাসির হৃদয়ে অনুতাপের বদলে ক্ষোভ দেখা দিল। মরার ব্যাপারেও গৌরমোহন কিছুমাত্র বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারলেন না। লোকটা এমন অপদার্থ ই বটে।

অতীত স্মৃতি সিনেমার ছবির মতো মান্নামাসির মনের পর্দায় দেখা দিয়ে পুরাতন বেদনাকে আর একবার নাড়া দিয়ে গেল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি প্রেক্ষাগারের দিকে ফিরে চললেন। যেতে যেতে ভাবলেন,—জীবনের কোনো সাধ, কোনো আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হয় নি। এখন মেয়েটাকে একটি কৃতী পাত্রের হাতে দিতে পারলে হয়তো অতীতে স্বামীগৌরবের অভাব ভবিষ্যতে জামাতাগর্বের দ্বারা কিছুটা পূরণ হতে পারে। কিন্তু তারই বা সম্ভাবনা কোথায়?

"মান্নামাসি যে, কেমন আছেন?"

মান্নামাসি মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন, সামনে দাঁড়িয়ে সত্যসিন্ধু। বললেন, "ভালো আছি বাবা, তুমি কেমন? অনেক দিন দেখি নি যে?"

সত্যসিন্ধু সে-কথার জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলেন, "কৈ, মুখ দেখে তো খুব ভালো মনে হচ্ছে না। অসুখ-বিসুখ করে নি তো?"

মান্নামাসি উত্তর করলেন, "না অসুখ নয়, তবে মনটা তেমন ভালো নেই।"

"বুঝেছি, মেয়ের বিয়ে তো? তার জন্যে অত ভাবনা কেন?"

ম্লান হেসে মান্নামাসি উত্তর দিলেন, "মেয়ের মা তো হও নি?"

সত্যসিন্ধু মৃদু হেসে বললেন, "না, সেটা ইচ্ছে থাকলেও আর হওয়া সম্ভব নয়।" তারপর মৃদু কণ্ঠে বললেন, "মান্নামাসি, কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা বলি। সংসারে সব কাজেই ধৈর্যের প্রয়োজন আছে। ডিমকে ভেঙ্গে ফেললেই তো তা থেকে তাড়াতাড়ি বাচ্চা বেরোয় না। তাতে অনেকদিন ধরে তা দিতে হয়।"

একটু চিন্তা করে মান্নামাসি বললেন, "হয়তো তোমার কথাই ঠিক। সংসারে যখন যা হওয়ার, ঠিক তখনই তা হবে, তার আগে নয়। আমি উতলা হয়ে কী করব?" একটু হেসে যোগ করলেন, "ঐ যে তোমাদের ইংরাজী প্রবাদ আছে, তাই মনে হয়,—মান্নামাসি প্রপোজেস্—"

"মলী সেন ডিস্‌পোজেস্। এই তো? আপনি চমকে উঠবেন না। হ্যাঁ, সমস্তটা না জানলেও আমি অনেকটাই অনুমান করতে পারি। আমার কথা শুনুন মিসেস

সেনকে আমি আপনার চেয়ে অনেক বেশী জানি। আপনি অনর্থক ভয় পাবেন না। এমন অনেক লোককে দেখেছি যারা নিজেরা মাছ খায় না কিন্তু ছিপ ফেলে মাছ ধরতে ভালোবাসে। তারা আমিষাশীদের পক্ষে ভয়ের পাত্র নয়, কৌতুকের পাত্র।”

মান্নামাসি কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এমন সময় যাঁর সম্পর্কে আলোচনা সে-ব্যক্তিটিই সশরীরে হাজির হলেন সেখানে। স্বয়ং মলী সেন। বললেন, “মান্নামাসি, তুমি যদি ড্রেসিং-রুমে বসে ছোট ছোট মেয়েগুলির চুলটা একটু বেঁধে দাও তো বড় উপকার হয়।”

সম্মত হয়ে মান্নামাসি প্রস্থান করতেই মলী সেন সত্যসিন্ধুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “কী, বড় যে পালিয়ে বেড়াচ্ছ?”

সত্যসিন্ধু জবাব দিলেন, “শুনেছি ছায়াকে তার পিছনে ছুটে ধরা যায় না, বরং পিছন ফিরে উল্টো দিকে চলতে থাকলেই নাকি সে পিছু নেয়।”

মলী সেন বললেন, “হেঁয়ালী রাখ। বল, এতদিন কোথায় ছিলে?”

“কোথায় আবার, এখানেই।”

“মিছে কথা, তবে দেখি নি কেন?”

“দেখা তো শুধু দেখার বস্তুর উপর নির্ভর করে না। আকাশে তারা সারাক্ষণই থাকে। দিনের আলো না নিবলে কি তা চোখে দেখা যায়?”

"বেশ তো, আমার চোখ না হয় সূর্যকিরণে ঝলসে আছে, তুমি একদিনও আস নি কেন ?"

"আমি টাইম-লিমিট মানি। রিটায়ারমেণ্টের পরেও যে রি-এমপ্লয়মেণ্ট চায় সে অশ্রদ্ধেয়। শুধু গভর্নমেণ্টের দপ্তরে নয়, জীবনের কারবারেও।"

মলী সেন খানিক চুপ করে থেকে প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা সিন্ধু, আমরা কি পরস্পরের বন্ধু হয়ে থাকতে পারিনে ?"

"না। স্ত্রী-পুরুষের বন্ধুত্বে আমি বিশ্বাস করিনে। সেটা হয় বাড়তে বাড়তে অনুরাগের কোঠায় পৌঁছয়, নয় তো কমতে কমতে পরিচয়ের পর্যায়ে নামে। অনাত্মীয় নরনারীর মধ্যে মাত্র দুটি সম্পর্ক সম্ভব। হয় ভদ্রতার, নয় তো প্রেমের।"

মলী সেন বললেন, "আমি যা নই তা ভেবে তুমি একদিন আনন্দ পেয়েছিলে। তাতে আমার হাত ছিল না। তারপর হঠাৎ একদিন যদি তোমার জ্ঞান হয়ে থাকে যে, তুমি যা ভেবেছ আমি তা নই, সে কি আমার অপরাধ ?"

সত্যসিন্ধু বললেন, "কিছুমাত্র নয়। আমি তো তোমাকে কখনও দোষী করি নি। নোট ডবল করার কাহিনী জানো তো ? একদল লোক আছে যারা এক শ' টাকার নোট দু' শ' টাকা হবে আশা করে যখন দেখে নোট নিয়ে লোকটা উধাও, তখন তাকে গাল দিয়ে বলে, জোচ্চোর। তাদের একবারও মনে হয় না যে, নোট ডবল করা সম্ভব এ-কথা যারা বিশ্বাস করে মূর্খতাটা তাদেরই। আমি জানি, ধিক্কারের পাত্র যদি কেউ থাকে, তবে সে তারা নিজে।"

মলী সেন আহত হলেন।

কিন্তু প্রতিঘাত না করে বললেন, "আমার হাত থেকে তুমি গভীর দুঃখ পেয়েছ তা জানি, সিন্ধু।"

সত্যসিন্ধু বললেন, "দেখ মলী, ভগবান সব জিনিষেরই একটা শেষ দিয়েছেন। তাঁর নিয়মে মানুষের জীবন-কালেরও একটা সীমা নির্দিষ্ট আছে। দুঃখ যত গভীরই হোক দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই একদিন তারও সমাপ্তি ঘটে। তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করতে নেই।"

"আমি যে তোমার জন্যে সত্যি সত্যিই ভাবি, সে-কথা হয়তো আজ আর তুমি বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমিও যে ব্যথা পাই, আর যাই হোক, আমারও যে হৃদয় আছে, এ-কথা কি তোমার একবারও মনে হয় না?"

সত্যসিন্ধু করজোড়ে বললেন, "দোহাই তোমার। এ-সব গভীর কথা আমাকে শুনিও না। আমি ডাক্তার মানুষ। স্টেথিস্কোপ দিয়ে হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে অভ্যস্ত। হৃদয়ের খবর রাখিনে। গ্রে'স এনাটমিতে তার উল্লেখ নেই।"

মলী সেন কিছুক্ষণ নীরব থেকে বেদনাভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, "একদিন ভাবতেম, আমরা দুজনে দুজনকে এত গভীরভাবে জানি যে, মুখ ফুটে না বললেও একজনের কথা আর একজন বুঝতে পারে। সে-ভুল ভেঙ্গেছে। তাই ঠিক করেছিলেম, তোমাকে সবটাই স্পষ্ট ভাষায় জানাব। এখন দেখছি, বৃথা। যে বুঝবে না বলেই পণ করে বসেছে, তা'কে

বোঝাবার চেষ্টা বিড়ম্বনা। বুঝেছি, আমাকে তুমি কোনো দিন ক্ষমা করতে পারবে না।"

সত্যসিন্ধু ব্যস্ত হয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, "ক্ষমার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমাকেও তুমি ভুল বুঝো না। গোলাপ তুলতে গেলে ফুলও জোটে, কাঁটাও ফোটে। কিন্তু ফুলের সৌরভ ভুলে গিয়ে যারা শুধু কাঁটার আঘাতটাই চিরকাল মনে জীইয়ে রাখে, আমি তাদের দলে নেই। কথাগুলি বোধ হয় অনেকটা কবিত্বের মতো শোনাচ্ছে। তা শোনাক। কিন্তু এর এক বিন্দুও মিথ্যে নয়। পরের দোষ মনে করে রাখায় সুখ নেই, একথা আমি পুঁথি থেকে নয়,—নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জেনেছি। অতীতের যে-দিনগুলি সরস, যে-কথাগুলি মধুর এবং যে মুহূর্তগুলি সুধায় পরিপূর্ণ, আমি সেগুলিই মনে রাখব; ব্যর্থতার, পরিতাপের বা তিক্ততারগুলি নয়। যথার্থ বলছি, একাউন্টেন্সী আমার পেশা নয়। জীবনের ট্রায়েল ব্যালেন্স কষা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। না, মিসেস মল্লী সেন, কী পাই নি তার হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজী।"

•

পূর্ব-পরিত্যক্ত আসনে ফিরে এসে বীরেশ্বর অর্ধ-সমাপ্ত ঘটচিত্রণ সম্পূর্ণ করতে লাগলেন। তুলি তুলে নিলেন হাতে।

রক্তাভ গৈরিক বর্ণের মৃৎ-কুম্ভটির গায়ে চিক্কণ শ্বেত রেখায় দুগ্ধ-ধবল একটি শঙ্খলতা এঁকে দিলেন ধীরে ধীরে। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, বহু বর্ষ আগে তাঁকে দিয়ে সুবালা ঠিক এমনি একটি শঙ্খলতার নক্সা আঁকিয়ে নিয়েছিলেন বালিশের ওয়াড়ে। সোনালী সিল্কের সুতায় তার উপরে স্বহস্তে রচনা করেছিলেন সুশ্রী সূচীশিল্প।

কলেজ-হোস্টেলের অপরিপাটি শয্যায় উপাধানগাত্রে এই সীবন-সৌকুমার্য বহুজনের মনোযোগ আকর্ষণ করে সহপাঠীদের মধ্যে প্রচুর কৌতুক পরিহাসের কারণ হয়েছিল।

বিস্মৃতির অন্ধকার গহ্বর থেকে ক্ষীণ ধারায় বয়ে আসে সুদূর অতীতের উজ্জ্বল আলোকোদ্ভাসিত দিনগুলির একটু-আধটু আভা। বৈশাখের অরণ্যপ্রান্তে বিগত বসন্তের দ্রুত বিলীয়মান মৃদু পুষ্পবাসের মতো।

বীরেশ্বরের বিয়ে হয়েছে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে। সে আজ অনেক বছর আগেকার কথা। ফুলশয্যার পরদিন দুপুর বেলা নববধূসহ শ্বশুরালয় থেকে গৃহে প্রত্যাগমন করছিলেন। বিদায়ের ক্ষণে মেয়ে যত কাঁদে, মেয়ের বাপ তার চেয়ে বেশী। নতুন জামাতাকে জড়িয়ে ধরে বার বার করে বললেন,—"সুবি আমার মা-মরা মেয়ে, বড্ড চাপা। মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলবে না। ওর মুখ দেখে তোমাকে বুঝতে হবে ওর কখন কী চাই।"

বীরেশ্বর তখন থার্ড ইয়ারের ছাত্র। মনে মনে হেসে ভেবেছিলেন, সে আর এমন শক্ত কী?

বোধ হয়, শক্ত হতোও না। কিন্তু বিপর্যয় ঘটল অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে। ছেলেবেলা থেকেই ছবি আঁকার হাত ছিল বীরেশ্বরের। পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাসকালে শ্লেটে দিবানিদ্রারত পণ্ডিত মশায়ের প্রতিকৃতি অঙ্কনের দ্বারা সহপাঠীদের কৌতুক ও অধ্যাপকের ক্রোধ উদ্রেক করেছেন অনেক দিন। বাল্যকালের নানাবিধ বায়ুরোগ উপশমের বহুপরীক্ষিত চিকিৎসা—প্রচুর তিরস্কার ও প্রচুরতর কর্ণমর্দন—হলো নিষ্ফল। গুরুজনের মুষ্টিযোগ ব্যর্থ করে চিত্ররোগ অনড় হয়ে রইল বীরেশ্বরের প্রকৃতিতে।

অগ্নিদাহের সঙ্গে চিরকাল যুক্ত হয় বায়ুবেগ; উচ্ছৃঙ্খল ধনীনন্দনের সঙ্গে বন্ধু। বীরেশ্বরের সঙ্গে যোগ দিলেন তার এক আত্মীয়া। কলেজের ছুটিতে বেড়াতে এসেছিলেন তাদের বাড়ি। বীরেশ্বরের অঙ্কনচাতুর্যে মুগ্ধ হয়ে মুখে দিলেন উৎসাহ, হাতে দিলেন উপহার,—ছবি আঁকার এক প্রস্থ রং এবং এক গুচ্ছ তুলি।

অতঃপর বীরেশ্বরকে সংযত রাখা আর কোনো মতেই সম্ভব হলো না। স্কুলের খাতা, অঙ্কের বই, মায় সংসারের ধোবার হিসাব ও দাদামশায়ের জমাখরচের জাবেদা বিভিন্ন রেখায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠল। ঘরের দেয়াল, আলমারীর কপাট, এমন কি, গৃহপালিত মার্জারশাবকগুলি পর্যন্ত বিচিত্র রং-এর প্রলেপন থেকে রক্ষা পেল না।

ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করে বীরেশ্বর এলেন কলেজে। কলকাতায়। হোস্টেলের অন্য ছেলেরা যখন গ্রিয়ার গার্সন

ও চার্লস বোয়ের-এর জীবনী মুখস্ত করে কিম্বা ফুটবলের মাঠে রেফারীর কর্ণে কটূক্তি ও মস্তকে বিনাম[illegible] ব্যস্ত, বীরেশ্বর তখন নিজ কক্ষে আপন মনে তুলি দিয়ে ছবি এঁকেছেন নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগে দিনের পর দিন।

তারই কিছু সংখ্যক একত্র করে এক সহাধ্যায়ী কলেজের উৎসব-সভায় আয়োজন করল এক ক্ষুদ্র প্রদর্শনীর। কে জানত যে, তারই মধ্যে লুক্কায়িত ছিল একটি দাম্পত্য প্রেমের ভবিষ্যৎ সমাধি? গেব্রিলো প্রিনজিপ কি কখনও কল্পনা করেছিল যে সেরাজেভোয় তারই নিক্ষিপ্ত পিস্তলের গুলিতে অঙ্কুরিত ছিল ভার্দুনের লোকক্ষয়, কা[illegible]রের পতন ও ভার্সাই সন্ধি?

স্থানীয় মার্কিন কন্‌সাল জেনারেল এসেছিলেন উৎসবে। তিনি বীরেশ্বরের ছবি দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর চেষ্টায় এক মার্কিন সংস্কৃতি সমিতি বীরেশ্বরকে দিতে চাইলেন একটি বৃত্তি। ভারতবর্ষের যে-কোনো সরকারানুমোদিত চিত্রবি[illegible]য়ে চিত্রাঙ্কন শিক্ষার সুবিধার্থে।

ঐখানেই বিপদের সূত্রপাত।

ছয় শত ডলার। তখনকার দিনের মুদ্রামানে দু'হাজার টাকারও কম। তিন বৎসরের জন্যে। উল্লসিত [illegible]রেশ্বর আত্মহারা হয়ে বললেন, তিনি অধ্যয়ন পরিত্যাগ করে সুরু করবেন অনন্যচিত্তে শিল্পসাধনা। কলেজ ছেড়ে দিয়ে ভর্তি হবেন আর্ট স্কুলে।

শুনে বন্ধুরা ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, মাথা খারাপ।

অভিভাবকেরা ক্ষাপ্পা হয়ে গর্জন করলেন, "হতচ্ছাড়া কোথাকার ; ছবি এঁকে হবে কী ? তাতে পেট চলে কারো ?"

কিন্তু বীরেশ্বরকে তখন পটের নেশায় পেয়েছে, পেটের কথা ভাববার অবকাশ নেই।

বীরেশ্বরের বাবা বৃদ্ধ হয়েছেন। অনেক কাল রেলের স্টেশন মাস্টার। রেলের বর্তমান অনেক বড় সাহেবকে তিনি ছোট সাহেব-কাল থেকে জানেন। তাঁরাও অনেকে তাঁকে নাম ধরেই ডাকেন। সুতরাং আশা ছিল, কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে পুত্রকে অন্ততঃ শ'দেড়েক টাকা বেতনে সিগনেলাররূপে ভর্তি করে যেতে পারবেন। ব্যস্। মন দিয়ে খাটলে আস্তে আস্তে প্রমোশন পেয়ে সেও কি আর একদিন এ-রকম মাস্টার-বাবু হবে না ? কথায় বলে, বাপ্‌কা বেটা—।

কিন্তু বাপের বুদ্ধির সঙ্গে বেটার বুদ্ধি এ-যুগে খুব বেশী যে মেলে এমন প্রমাণ নেই। অন্ততঃ এ-ক্ষেত্রে মিলল না।

বীরেশ্বর তখন শিল্প-জীবনের কল্পনায় বিভোর। পুরোপুরি স্বপ্নরাজ্যে পদচারণা করছেন। সেখানে তিনি র‍্যাফেল ও লিওনার্ড দা ভিঞ্চির উত্তরসাধক, বটিচেলী ও পল্ গগাঁর সগোত্র, অবনী ঠাকুর ও নন্দলালের সতীর্থ। রূপার বোতাম-আঁটা সাদা জিনের কোট গায়ে টুলে বসে দিনের পর দিন ফাইভ আপ আর সিক্সটিন ডাউনের লাইন ক্লিয়ার দিচ্ছেন—নিজের জীবনে এমন দুর্ঘটনার কথা তিনি ভাবলেও শিউরে ওঠেন।

ভাবী মীশেল এঞ্জেলো মনে মনে বলেন, "হুঁঃ। শরৎচন্দ্র যদি রেঙ্গুনের একাউন্টস আপিসে কেরানীগিরি করে দেহপাত করতেন কিম্বা সমারসেট্ মম্ যদি সেন্ট টমাস হাসপাতালে রোগীর নাড়ী টিপে জীবন কাটাতেন, তবে পৃথিবীতে দুর্গতির আর সীমা থাকতো কি ?"

সুবালা তখন পিত্রালয়ে। সদ্যপ্রসূত পুত্রের জননী। বীরেশ্বরের কলেজ পরিত্যাগ ও চিত্রবিদ্যাভ্যাসের সংকল্প তাঁর কানেও এসে পৌঁচেছে। জনশ্রুতিতে। তিনি বিশ্বাস করেন নি। এর মূলে কিছুমাত্র সত্য থাকলে পত্রযোগে বীরেশ্বর সর্বাগ্রে জানাতেন তাঁকেই—পত্নীপ্রাণের এই সহজাত বিশ্বাসের দৃঢ়তায় সুবালা পরম নিশ্চিন্ত ছিলেন।

হঠাৎ এক দিন সংবাদ এল। দুঃসংবাদ বলাই ঠিক। সমস্ত শুভানুধ্যায়ীর সদুপদেশ অগ্রাহ্য করে বীরেশ্বর নিজের কলেজের পাঠ্যপুস্তক সহপাঠীদের বিলিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছেন বরোদায়। সেখানকার কলাভবনে সুরু হয়েছে শিল্পের সাধনা।

বর্ষীয়সী হিতকাঙ্ক্ষিণীর দল সুবালাকে অনেক পরামর্শ দিলেন। কেউ বললেন, চিঠি লেখো। কেউ বললেন, টেলিগ্রাফ। কেউ বা উপদেশ দিলেন, একেবারে বরোদায় সশরীরে উপস্থিতির। এমন কি, তাঁর শ্বশুরের ইচ্ছা ছিল পুত্রবধূ কঠোর তিরস্কারের দ্বারা বীরেশ্বরকে এই অপরিণামদর্শিতা থেকে নিরস্ত করুন। সে সমস্ত অগ্রাহ্য করে সুবালা স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

সকাতর অনুরোধ, সক্রোধ ভর্ৎসনা, সখেদ অশ্রুপাত দূরে থাকুক, কখনও পত্রে বা বাচনিক আলোচনায় এ-প্রসঙ্গের উল্লেখমাত্র করলেন না বীরেশ্বরের কাছে।

জীবনের এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিনে সুবালার কথা যদি বীরেশ্বরের মনে না পড়ে থাকে তবে তিনি কি উপযাচিকা হয়ে তাঁকে তা স্মরণ করাতে যাবেন? ছিঃ। যে-পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি আপন স্ত্রী এবং সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এমন মর্মান্তিকরূপে উদাসীন হতে পারে সেই দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তির সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হতেও তাঁর আত্মসম্মানে বাধে।

দুঃসহ দুঃখের সুতীব্র বেদনায় আপনার চতুর্দিকে অপরিসীম ঔদাসীন্যের এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর রচনা করলেন সুবালা। আপন অভিমানের যে দুর্ভেদ্য দুর্গে নিজকে তিনি অলক্ষ্যে অপসারিত করলেন তার প্রবেশদ্বার বীরেশ্বরের কাছে রুদ্ধ হয়ে গেল নিঃশব্দে। নিশ্চিতরূপে। চিরকালের জন্যে।

শিল্পশিক্ষার মধ্যপথে বীরেশ্বরের ভগ্নহৃদয় পিতা লোকান্তরিত হলেন।

সুবালার দাদারা দুজনেই কৃতী এবং সহোদরার প্রতি গভীর স্নেহপরায়ণ। তাঁদের আগ্রহ ছিল সপুত্র সুবালাকে নিজেদের সংসারে সমাদরে ও সসম্মানে গ্রহণ করা। সুবালা সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে ভর্তি হলেন ট্রেনিং কলেজে। বি-টি পাশ করে এক বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কর্ম সংগ্রহ করলেন সম্পূর্ণ আপন প্রচেষ্টায়।

আর্ট স্কুলে শিক্ষা সমাপনান্তে দীর্ঘ দিন বীরেশ্বরের অর্থাগমের পন্থা প্রশস্ত ছিল না। এদেশে চিত্রকরেরা যতটা নাম পায়, ততটা ইনাম পায় না। বক্তৃতা ও প্রবন্ধে তাঁদের সুখ্যাতি থাকে অজস্র। কিন্তু সে কেবলি শব্দ, তার পিছনে অর্থ নেই। ক্বচিৎ কদাচিৎ মাসিক পত্রে দু'একখানা ছবি মুদ্রণের দ্বারা যে উপার্জন হয় সেটা উচ্চারণ করতে বিনা রঙেই চিত্রকরের কর্ণদ্বয় রক্তিম হয়ে ওঠে।

বীরেশ্বরের জীবনেও সে-অধ্যায় গিয়েছে। সেই অসচ্ছলতার দিনে আপন উপার্জনের দ্বারা সংসারযাত্রাকে সুবালাই সচল রেখেছিলেন। বীরেশ্বর কখনও জানতেও পারেন নি কী ভাবে সংগৃহীত হয়েছে তার নিজের ভদ্রোচিত পরিচ্ছদ, পুত্রের সেণ্ট জিভিয়ার্সে অধ্যয়নের ব্যয়, কেমন করে ঘটেছে প্রাত্যহিক আহার্যের নিয়মিত আয়োজন, কোথা থেকে এসেছে রোগীর পথ্য, চিকিৎসকের দক্ষিণা এবং প্রয়োজন হলে বায়ু-পরিবর্তনের সমুদয় অর্থ।

ধীরে ধীরে বীরেশ্বরের ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছে। আজ তাঁর মাসিক উপার্জন অনেক বিলাত-প্রত্যাগত ব্যারিস্টারের পক্ষেও ঈর্ষার যোগ্য। অথচ সুবালার আচরণে কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নি। আজও তিনি তেমনি নির্বাক নৈপুণ্যে সংসার পরিচালনা করেন। দশটা বাজতে না বাজতে নিয়মিত বেঁটে ছাতা ও ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে ট্রামে চেপে স্কুলে যাত্রা করেন। পাঁচটায় ক্লান্ত দেহে ফিরে এসে ব্যবস্থা করেন বৈকালিক চা-পর্বের।

সচ্ছলতার দিনেও এই অনাবশ্যক কৃচ্ছ্রসাধনা থেকে সুবালাকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হয় নি। বীরেশ্বর মাঝে মাঝে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা দ্বারা সুবালা সে-আলোচনা এড়িয়ে গিয়েছেন সুকৌশলে।

বেশী পীড়াপীড়ি করার সাহস হয় না বীরেশ্বরের। সংসারের অন্য আর পাঁচ জনের সঙ্গে মিল নেই সুবালার, এ-কথা বীরেশ্বর পূর্ব অভিজ্ঞতা দ্বারা জেনেছেন। নিজের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থায় সবাই খুশি হয়, এটা প্রচলিত ধারণা। কিন্তু সুবালার সামান্য সহায়তার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখেছেন, শুধু বিরক্তির কারণ ঘটিয়েছেন। আশ্চর্য!

সেবার পূজার সময় একদিন মার্কেটে বীরেশ্বরের দেখা হয়ে গেল তাঁর এক দূর সম্পর্কিত ভগিনী ও ভগিনীপতির সঙ্গে। তাঁরা দুজনে পূজার সওদা করছিলেন। ভগিনী প্রশ্ন করল, "বউদির জন্যে এবার কী শাড়ি কিনলে, বীরেশ্বর দা'?"

বীরেশ্বর জবাব দিলেন, "বউদির শাড়ি? সে আমি কিনব কেন?"

"বাঃ, তুমি কিনবে না তো কিনবে কে?"

"কেন, তোর বউদি। আমাদের সবার জামা কাপড় তো সে-ই কেনে।"

বিস্মিত কণ্ঠে বোন বলে, "তোমাদের জামা কাপড় তিনি কিনতে পারেন। তা বলে তাঁর নিজেরটাও কি তিনি কিনবেন? আর যদি বা কেনেনও তা হলে আর

তোমার দিতে নেই নাকি? তুমি কি কখনও বউদিকে কিছু কিনে দাও না?"

"না তো। টাকা পয়সা তো সবই তার কাছে থাকে। তার যখন যা দরকার তা সে-ই কিনে নেয়। আমি তো মাসের শেষে পুরো মাইনেটা তার হাতে তুলে দিয়েই খালাস।" বলে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসেন বীরেশ্বর।

"এই তোমার বুদ্ধি? এমন না হলে আর আর্টিস্ট!" সহাস্যে মন্তব্য করলেন ভগিনীপতি।

একখানা বাঙ্গালোর সিল্কের শাড়ি নির্বাচন করে ভগিনী বীরেশ্বরের হাতে দিয়ে বললেন, "নাও, এই শাড়িটা নিয়ে যাও বউদির জন্যে। ফিকে নীলের উপরে ঘন নীল আর সোনালী জরির আঁচলা, ফর্সা রঙে বউদিকে খাশা মানাবে। তেষট্টি টাকা দাম আজকালকার হিসেবে খুব বেশী নয়। আচ্ছা, তোমার কাছে টাকা না থাকে তো, আমি দিচ্ছি। পরে পাঠিয়ে দিও, তা'হলেই হবে।"

কিন্তু যাঁর জন্যে শাড়ি তাঁর আচরণ একান্ত হতবুদ্ধিকর। খুশি হওয়া দূরে থাকুক, অত্যন্ত বিচলিত কণ্ঠে সুবালা বলে উঠলেন,—"শাড়ি কার জন্যে?"

"তোমার।"

"আমার? আমার জন্যে শাড়ি তোমাকে কে আনতে বলেছে?"

সত্য গোপন করে বীরেশ্বর বললেন, "কেউ বলে নি। আমি নিজেই কিনেছি। ব্লু রঙটা তোমাকে খুব চমৎকার—"

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সুবালা বাধা দিয়ে বললেন, “কেন, কেন তুমি শাড়ি কিনতে গেলে আমার জন্যে ?”

অপ্রস্তুত বীরেশ্বর শাড়ির প্যাকেটটা স্ত্রীর হাতে দিতে দিতে থেমে গেলেন।

ইতস্ততঃ করে বললেন, “কিছু অন্যায় হয়েছে কি ? আমি তো ঠিক বুঝতে পারি নি। রাণী আর ওর বর সীতেশের সঙ্গে দোকানে দেখা হয়েছিল। তারা বললে—তোমার কি পছন্দ—”

“অন্যায়, খুব অন্যায়। কোনো দিন যেন তুমি আর—” বলতে বলতে দরদর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ল সুবালার দুই নেত্র থেকে কপোলে, বক্ষে।

তিনি দ্রুতপদে প্রস্থান করলেন কক্ষান্তরে।

প্রত্যাখ্যাত শাড়ির প্যাকেটটার পানে তাকিয়ে হতবাক বীরেশ্বর দাঁড়িয়ে রইলেন একা। ইতিপূর্বে সুবালার চক্ষে জল দেখেন নি তিনি কখনও। সুতরাং তার মনোবেদনার পরিমাণ অনুমান করতে পারলেন। কিন্তু হেতু খুঁজে পেলেন না। সংসারে অন্য লোকের স্ত্রীরা শাড়ির জন্যে বায়না ধরে, শুনেছেন। শাড়ি উপহার দিলে আহত হয়ে অশ্রুপাত করে কোন রমণী ?

বীরেশ্বর শিল্পী। কল্পনাপ্রবণ তাঁর মন। অনেক দিন রাত্রিতে অকস্মাৎ ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে। শয্যা ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী কক্ষে এসে দেখেছেন,—স্ত্রী গভীর নিদ্রামগ্ন। ক্ষীণ সুঠাম দেহটি উৎসব অবসানে কণ্ঠচ্যুত পুষ্পমালিকার মতো

পালঙ্কের একপ্রান্তে অনায়াসে বিন্যস্ত। কপোলে কবরীবন্ধনবিমুক্ত কুন্তলদলের গুটি কয় শীর্ণ গুচ্ছ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। শ্বাস-প্রশ্বাসের ভারে বক্ষঃস্থল নিয়মতি তালে মৃদু আন্দোলিত।

নিদ্রিতা পত্নীর অবগুণ্ঠনহীন মুখের পানে তাকিয়ে বীরেশ্বর ভেবেছেন, সুবালা যেন বাতায়নপথে দৃষ্ট কৃষ্ণচূড়া বৃক্ষের পুষ্পিত শাখার অন্তরালে সদ্যোত্থিত ঐ অষ্টমীর চাঁদের মতো। দেখে মনে হয়, হাত বাড়ালেই নাগাল পাওয়া যায় বুঝি বা। কিন্তু আসলে লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে। কাছে থেকে দূর রচনা করছে সে। সে যেন ভাদ্রদিনে খরস্রোতা তটিনীর তরঙ্গশীর্ষে প্রভাত-সূর্যের কম্পিত আলোক-শিখাটি। দেখা যায়, ছোঁয়া যায় ; কিন্তু ধরা যায় না।

সিদ্ধনাথকে ভগবান এক জোড়া পা দিয়েছেন। পাখা দেন নি। তাই গতি দ্বারা তিনি সৃষ্টিকর্তার সে ভুল সংশোধনের চেষ্টা করেন। তাঁর অকস্মাৎ আগমন ও নির্গমন মাটিতে হেঁটে চলার চাইতে আকাশে উড়ে যাওয়ার সঙ্গেই বেশীটা মিলে।

দ্রুত প্রবেশ ও দ্রুততর ভাষণের দ্বারা মিনিট পাঁচ ছয়

ব্যাপী সিদ্ধনাথ যে-উদ্বেগ প্রকাশ করলেন, তার সংক্ষিপ্ত সার এই যে, অভিনয় সুরু হওয়ার সময় এগিয়ে আসছে অথচ অভিনেতা অভিনেত্রীদের সাজসজ্জার এখনও অনেক বাকী।

অভিনয়ে প্রধান ভূমিকা মলী সেনের। প্রথম দৃশ্যে যবনিকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর পার্ট। তিনি সলজ্জে স্বীকার করলেন, ত্রুটিটা তাঁরও। আশ্বাস দিলেন, তাঁর প্রস্তুত হতে বিলম্ব হবে না।

নিজের নির্দিষ্ট প্রসাধন কক্ষটিতে প্রবেশ করে মলী সেন খুশি হলেন।

অতি পরিপাটি ব্যবস্থা। ড্রেসিং টেবিলের উপরে নিপুণভাবে সাজানো ভেসেলীন, পেইন্ট, গ্রীজ, পাউডার, গ্লিসারীন, সফ্‌ট টিস্যু, প্যানকেক, ম্যাস্‌কারা, আইব্রো পেন্সিল ইত্যাদি মেক-আপের নানাবিধ সরঞ্জাম। কেশবিন্যাসের চিরুণী, ব্রাস, ফিতা, ট্যাসল্‌। আলনায় অভিনয়ের বিভিন্ন অঙ্কে বা গর্ভাঙ্কে ব্যবহারের জন্যে বিভিন্ন ধরনের জামা কাপড় পৃথক ভাবে ভাঁজ করা। রাজকন্যা মঞ্জুশ্রী ঠিক কোন দৃশ্যে কোন বস্ত্র এবং অঙ্গাবরণটি পরিধান করবেন, সুস্পষ্টাক্ষরে লেখা ছোট কাগজের লেবেল দিয়ে তা চিহ্নিত। ছোট টেবিলটার উপরে অলঙ্কারগুলি থাকে থাকে অনুরূপ সুবিন্যস্ত। এক কোণে একটি ইজিচেয়ার, বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যকালীন অবসর ক্ষণে ক্লান্ত মলী সেন যাতে দেহ এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করতে পারেন।

অন্য সময়ে অব্যবহৃত এ-ঘরটাতে পাখার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। গরমে ঘামে মুখের মেক-আপ গলে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা। তাই জানালার ভেতর দিয়ে তার গলিয়ে দূরবর্তী প্লাগের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে ছোট একটি টেবিল ফ্যান। অন্য কোণে স্পিরিট স্টোভে ফুটছে ছোট কেটলীতে গরম জল। টিপাইর উপরে ফ্লাস্কে ভরা গরম দুধ, নাকে দেওয়ার মিস্টল, গলার জন্যে স্প্রে, অডিকলোনের বোতল, থ্রোট পেস্টিলস্ ও এ্যাস্পিরিনের শিশি ইত্যাদি স্নায়ু ও কণ্ঠ সতেজ রাখার অতি পরিচিত বিবিধ ডাক্তারী আয়োজন।

মনে মনে ধীরার নিপুণ ব্যবস্থার যথেষ্ট সুখ্যাতি করে প্রসন্ন চিত্তে মলী সেন অভিনয়ের জন্যে সজ্জাবিন্যাসে ব্যাপৃত হলেন। বাঁ হাতের ঘড়িটা খুলে রাখলেন ড্রেসিং টেবিলের উপরে। ডান হাতের চুড়ি ক'গাছা, গলার মফচেন ও কানের দুল দুটি রেখে দিলেন টেবিলের দেরাজে। একটা ড্রেসিং গাউন জড়ালেন গায়ে। কপালের ঠিক উপর থেকে একখানা তোয়ালে জড়িয়ে মাথার চুলগুলি ঢেকে দিলেন এমনভাবে যাতে মেক-আপের পেইণ্ট বা পাউডারের ছোপ না লাগে। ডান হাতের তর্জনী দ্বারা শ্বেত চীনেমাটির জার্‌টা থেকে অনেকখানি ক্রীম তুলে নিয়ে দু'হাতে মাখতে সুরু করলেন কণ্ঠে ও কপোলে।

আগন্তুকের ছায়া পড়ল সম্মুখের দর্পণে।

"কে, ধীরা? ইস্ একেবারে পরীর মতো সেজেছিস যে! দেখে মাথা খারাপ হবে যে ছেলেদের।" বললেন মলী সেন।

প্রশংসায় প্রীত ধীরা বলল, "যাও!"

"সত্যি বলছি, শাড়িটা খাসা। আমারই পরতে লোভ হচ্ছে। মা দিয়েছেন বুঝি?"

"তুমি বেশ লোক যা হোক! মা দিতে যাবেন কেন? তুমিই তো কিনে দিয়েছ। দেখে চিনতে পারছ না?"

প্রায় প্রতি সপ্তাহেই নূতন শাড়ি কেনা অভ্যাস যাঁর, তাঁর পক্ষে সব শাড়ি মনে রাখা সম্ভব নয়। মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কিনে দিয়েছি? কৈ মনে পড়ছে না তো?"

"মা গো, কী ভুলো মন তোমার! গেল পূজোর আগের পূজোয় তুমি আর আমি এগজিবিশানে যাই নি? মনে নেই, সেই যে হঠাৎ সুধাংশু মামাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল? তুমি দুটো শাড়ি কিনে একটা দিলে সুধাংশু মামার বউকে, আর একটা আমাকে!"

"হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে। সে কি এই শাড়িটে? তখন তো এত সুন্দর মনে হয় নি। তুই পরেছিস বলেই বোধ হয় এখন এত ভালো দেখাচ্ছে।"

ধীরা সলজ্জ হাসি হেসে চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা সুধাংশু মামা আজ আসবেন না থিয়েটার দেখতে?"

"কী জানি, হয় তো আসতেও পারেন।"

"তিনি অনেক দিন আসেন নি কিন্তু, না মলী মামী?" মন্তব্য করল ধীরা।

মলী সেন সে-প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর কি সুধাংশু মামার জন্যে মন কেমন করছে না কি ?"

"না, মন কেমন করবে কেন ? তবে তিনি এলে বেশ হতো। তিনি এর মধ্যে থাকলে থিয়েটার নিশ্চয় আরও অনেক ভালো হতো।"

সে-কথা মলী সেনের অজানা ছিল না। গান, বাজনা, অভিনয়, চড়ুইভাতি সব কিছুই সুধাংশুর উপস্থিতিতে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

মলী সেন চুপ করে রইলেন। নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। ধীরাকে যাই কেন না বলুন, তিনি নিজে নিশ্চিত জানেন, সুধাংশু আজ আসবে না। শুধু আজ নয়, আর বোধ হয় কোনো দিনই সে আসবে না। এ-সব উৎসব-আয়োজনের সঙ্গে চিরদিনের মতোই সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে তার। অথচ এমন একদিন ছিল—।

থাক, সে-কথা স্মরণ না করাই ভালো। যে যায় সে এমন করেই যায়! ছিন্নমালার ভ্রষ্ট কুসুম ফিরে কুড়োতে যাবেন না মলী সেন। যা ফুরায়েছে তাকে ফুরোতে দেওয়ার নীতিতে তিনি বিশ্বাস করেন। কবিগুরুর কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে 'ক্ষণিকা'ই তাঁর সর্বাধিক প্রিয়।

মলী সেনের চিন্তায় বাধা পড়ল।

"মলী মামী, এক জন লোকের সঙ্গে একবার কথা বলবে ?"

অকস্মাৎ এমন ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল ধীরা যে, স্পষ্টই বোঝা

গেল, কথাটা নিয়ে মনে মনে অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্বের পরে হঠাৎ কোনো রকমে সে মুখ থেকে বের করেছে।

মুখে ক্রীম মাখতে মাখতে মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "কে সে?"

"আমার একজন বন্ধু, মানে—ইয়ে—একটি চেনা ছেলে।"

মলী সেন পিছন ফিরে ধীরার পানে তাকালেন। বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "বন্ধু?"

অত্যন্ত বিব্রতভাবে মাটির দিকে চোখ রেখে ধীরা বলল, "না, ঠিক বন্ধু নয়, মানে, আমার সঙ্গে পড়ে একটি মেয়ে, তারই দাদা।"

মলী সেন ঈষৎ হাস্য করে সকৌতুক কণ্ঠে বললেন, "বটে! হাঁউ মাঁউ খাঁউ, রোমান্সের গন্ধ পাঁউ। বন্ধু নয়, বন্ধুর দাদা! ব্যাপারটা খুলে বল্ দিকিন, শুনি।"

"বাঃ রে, খুলে বলার আবার কী আছে এর মধ্যে?"

"কিছুই নেই? উহুঁঃ, এ যে মনে হচ্ছে, ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে।"

এ-যুগের মামীরা ভাগিনেয়ীদের সঙ্গেও পরিহাস করতে ছাড়েন না। বিশেষতঃ হৃদ্যতাটা যদি প্রগাঢ় হয়।

"তুমি ও-রকম দুষ্টুমি করলে আমি চলে যাব কিন্তু।"

ধীরা প্রস্থানোদ্যোগ করতেই মলী সেন সহাস্যে বললেন, "আরে শোন্, শোন্, কোথায় যাচ্ছিস্? আমাকে সবটা বললে লাভই হবে। যুদ্ধে এবং প্রেমে 'এ্যালাই' থাকা ভালো। জানিস্ তো, তোর মা আমার কথা কেমন মানেন?

আমার সুপারিশ আঁচলে বেঁধে, চাই কি, একেবারে নির্বিঘ্নে বাসরঘর অবধি পৌঁছতে পারবি।”

“যাঃ।” ধীরা লজ্জায় একেবারে রাঙা হয়ে উঠল।

মলী সেন সস্নেহে ধীরাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, “যাঃ কি রে? দেখি, দেখি, মুখ তোল্। ও মা, তাই তো, ধীরা আমাদের সে ধীরা আর নাই তো! সত্যি, বেশ বড় হয়ে উঠেছিস যে। ঠাট্টা নয়। আমাকে কিছু লুকোসনে।”

কিছুটা ধীরার সলজ্জ ও স্বতঃপ্রবৃত্ত স্বীকৃতিতে, কিছুটা বা মলী সেনের সহৃদয় জিজ্ঞাসায় বিষয়টা ধীরে ধীরে প্রকাশিত হলো। সমীর লাহোর মেডিক্যাল কলেজে পড়ে। ধীরার সহপাঠিনী তার মাসতুতো বোন। তাদের বাড়িতেই ধীরার সঙ্গে প্রথম দেখা।

দেখতে? ছাই, হাত-পাগুলি চোয়াড়ের মতো। একটা আস্ত গুণ্ডা বললেই হয়। পদ্য লেখা? রামচন্দ্র! দু'লাইন বাংলায় চিঠি লিখতেই প্রাণ বেরিয়ে যায়। শুধু খেলা নিয়ে পাগল। কলেজ কামাই করে অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলার কমেণ্ট্রী শুনবে রেডিওতে। সিনেমা? না, সিনেমায় তারা যায় নি কখনও। হ্যাঁ, দু'দিন বেড়াতে গিয়েছে বটে। বিকেলে, গঙ্গার ধারে।

মলী সেন পরিহাসতরল কণ্ঠে মন্তব্য করলেন, “এ্যাঁ, দুজনে লুকিয়ে নদীর ধারে? একেবারে ধীরা-সমীরে যমুনারই তীরে—?” তার পর স্নেহপূর্ণ প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন, “আমাদের অভিনয় দেখতে এসেছে বুঝি? যা, ডেকে নিয়ে

আয়। আগে দেখি, রোমিও মশাই আমাদের জুলিয়েট ঠাকরুণের যোগ্য কি না।”

ছেলেটি সত্যি সুদর্শন। দীর্ঘ, সুঠাম গড়ন, সর্বাঙ্গে স্বাস্থ্যের দীপ্তি, মুখে বুদ্ধির আভা। ঘরে দ্বিতীয় চেয়ার ছিল না; জামা কাপড়ের ওয়ার্ড্রোব-ট্রাঙ্কটার উপরে বসতে দিয়ে মলী সেন আলাপ করতে লাগলেন।

ধীরা মলী সেনের অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী। তার কল্যাণ মলী সেনের বিশেষ কাম্য। তিনি কথাচ্ছলে অতি নিপুণতার সঙ্গে সমীরের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত বহু তথ্য সংগ্রহ করলেন। তার পড়াশুনা, খেলাধুলা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক উৎসাহ দিলেন।

সমীর বিদায় নিতে চাইলে ধীরাকে বললেন, “কিছু খেতে-টেতে দিয়েছিস ওকে? সে কী রে? এই বুঝি তোর হস্‌পিট্যালিটি? এক্ষুণি উপরে আমার বসার ঘরে নিয়ে যা। ফ্রীজে আইসক্রীম আছে। না না, তোমাকে অত লজ্জা করতে হবে না। খেতে পারবে না বৈ কি? খুব পারবে। জানো তো, সুশীল ও সুবোধ বালক যাহা পায় তাহা খায়।” মলী সেন কৌতুকোচ্ছল সস্নেহ দৃষ্টিতে সমীরের দিকে তাকালেন।

বোঝা গেল, পাত্রটি পছন্দ হয়েছে মলী মামীর।

সজ্জাকক্ষ থেকে বেরিয়ে দোতলার ড্রয়িং-রুমে বসে মলী সেনের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সমীর। বাস্তবিক অনেক কিছু জানা শোনা আছে ধীরার মামীমার। ঠিক

বলেছেন, আজকাল জেনারেল প্র্যাকটিশনারদের পসার নেই। লোকে ভাবে, জ্যাক অব অল ট্রেড। স্পেশিয়েলিস্ট না হলে রোগীরা ডাকে না। হ্যাঁ, বিলাতে গিয়ে সে গাইনেকলজি অ্যাণ্ড অবস্টেট্রিক্সে স্পেশিয়েলিস্টই হবে।

ভারি চমৎকার কথা বলতে পারেন কিন্তু মলী মামী। নিখুঁত এ্যাকসেন্ট, বিলেতী মেমসাহেবের মতো। সাধারণ কলেজে পড়া বাঙ্গালী মেয়েদের মতো হিস্টরিক্যাল বলেন নি একবারও; সেকেণ্ড সিলেবল-এ জোর দিয়ে বলেছেন, হিস্‌ট্রিক্যাল। ধীরা লক্ষ্য করেছে কী?

আর ক্রিকেটেরই বা কত খবর রাখেন! বললেন, এদেশে পেস্ বোলারের অভাব। সে যদি বল ভালো সুইং করাতে শেখে, তবে হয়তো বছর কয়েক পরে টেস্ট ম্যাচে চান্স পেতেও পারে। সত্যি তো, এ-কথাটা তো সমীর কখনো ভাবে নি!

ফটোগ্রাফিতেও মলী মামীর যথেষ্ট উৎসাহ আছে! আশ্চর্য! লাইকার নাম করতেই কেমন বলে দিলেন, ওতে প্রত্যেকটি ছবি এনলার্জ না করালে সুখ নেই, বড্ড বেশী খরচ। তার চাইতে রোলীকর্ড বা রোলীফ্লেক্স ভালো। সমীরের এ্যালবামটা দেখতে চেয়েছেন। কালই তাঁকে সেটা এনে দেখালে—

হঠাৎ খেয়াল হলো সমীরের, সে একাই কথা বলে যাচ্ছে।

শ্রোত্রীটির কাছ থেকে কোনো সমর্থনসূচক সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না তো!

একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "মলী মামী নিজেও ফটো তোলেন বুঝি?"

"জানিনে।"

ধীরার কণ্ঠের নিস্পৃহতায় সমীরের বিস্ময় বৃদ্ধি পেল। কিন্তু সে-সম্পর্কে আর কোনো প্রশ্ন না করে আইসক্রীমের প্লেটটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "প্লেট একটা কেন? তুমি খাবে না?"

"না।"

"সে কি হয়? তুমি না খেলে আমিও খাচ্ছিনে। আইসক্রীম তো তুমি খুব পছন্দ—"

অসহিষ্ণু স্বরে বাধা দিয়ে ধীরা বলল, "আঃ, কেন মিছে বকাচ্ছ? তোমার খেতে ইচ্ছা হয় খাও, না হয়, বাইরে ফেলে দাও।"

ধীরার এই অহেতুক উষ্মায় হতবাক্ সমীর মিনিট খানেক তার মুখের পানে তাকিয়ে রইল। সে ভেবেই পেল না, হঠাৎ কোথায়, কখন এবং কী তার অপরাধ ঘটেছে।

সমীর প্রেক্ষাগারে ফিরে গেলে ধীরা চুপ করে ড্রয়িং-রুমেই বসে রইল। তীব্র অসন্তোষ ও ক্রোধে তার মন দগ্ধ হতে লাগল। কিন্তু কেন এই বিরক্তি, কার উপরে এই রাগ, তার কোনো হদিস খুঁজে পেল না।

সমীরের দোষ কী? সে তো কথা উঠলেই ঠাট্টা

করেছে। ধীরা নিজেই তো তাকে এক রকম জোর করে মলী সেনের কাছে নিয়ে গেছে। সমীর মলী সেনের প্রশংসা করেছে? তাতে রাগ করার কী আছে? মামীর প্রশংসা সে নিজে যতখানি করে, এত আর করে কে? এর আগে সমীর কি তাকে মলী মামীর পাবলিসিটি অফিসার বলে কম পরিহাস করেছে? ধীরা কোনো সঙ্গত কারণ ভেবে পায় না।

তার রূঢ়তায় আহত সমীরের মুখে সুস্পষ্ট বেদনার ছায়া ও ভীত অপরাধীর মতো ঘর থেকে তার নিঃশব্দ প্রস্থান স্মরণ করে ধীরার বুকে ছুঁচ ফুটতে থাকল। অথচ তার প্রতি উদ্যত অভিমানকেও কোনোমতেই সে মন থেকে তাড়াতে পারল না।

মলী মামী তাকে কত গভীর স্নেহ করেন, তা সে জানে। সমীরকে তিনি অবজ্ঞা করলে ধীরা নিশ্চয়ই ক্ষুন্ন হতো। তিনি যে সমীরকে যথেষ্ট সমাদর করেছেন তাতেও সে প্রসন্ন হতে পারল না। তার মনে অযথা অভিযোগ খচখচ করতে লাগল। নিজের হৃদয়ের এই দুই বিপরীত ভাবধারার কঠিন ঘাত প্রতিঘাতে সে কণ্টকারণ্যে মৃগশিশুর ন্যায় অবিরত ক্ষত বিক্ষত হতে থাকল।

অন্ধকার রাত্রির নির্জন গ্রাম্য পথে একক যাত্রীর মনে অজ্ঞাত আশঙ্কার মতো কি যেন এক অনিশ্চিত অমঙ্গলের ছায়া আচ্ছন্ন করল ধীরার মন। কিছুতেই সে ভেবে পেল না, কেন যে ঝড়ের রাতে উত্তাল সমুদ্রতরঙ্গের মতো তার

বুকের কাছে দুর্নিবার কান্নার ঢেউ ক্ষণে ক্ষণে কেবলি উদ্বেল হয়ে উঠছে।

"কী হে বীরেশ্বর, তুলি হাতে নিয়ে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আছ যে? কার ধ্যান করছ? কলালক্ষ্মীর, না, গৃহলক্ষ্মীর?" বলে সিদ্ধনাথ সহাস্যে পাশে এসে দাঁড়ালেন।

বীরেশ্বর চমকে উঠে পুনরায় অঙ্কনকার্যে মনোনিবেশের উদ্যোগ করলেন। বাম হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা ঈষৎ চাপ দিয়ে টিউব থেকে তুলির উপরে রং মাখিয়ে নিতে নিতে সলজ্জে উত্তর দিলেন, "দাদা, এ-বয়সে কি আর কোনো লক্ষ্মী বর দেবেন যে, ধ্যান করব?"

"ঠিক বলেছ ভায়া। আমাদের বয়সে লক্ষ্মী সরস্বতীকে ডেকে আর কাজ নেই। তার চেয়ে বরং নন্দী মামাকে ভজনা করা ভালো। খুশি হয়ে যদি দু'চার হন্দর সিদ্ধি পাঠিয়ে দেন তো এই কন্ট্রোলের দিনে ব্ল্যাক মার্কেট করে কিছু গুছিয়ে নিতে পারি। হাঃ হাঃ হাঃ।" সিদ্ধনাথের অট্টহাস্য প্রায় সিকি মাইল দূর থেকে শোনা যায়।

বীরেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায় সিধুদা'? আমাদের পাবলিসিটি অফিসার লাহিড়ী যে চারদিকে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।"

"ওঃ, তাই নাকি? আর বল কেন ভাই, গিন্নী সেই থিয়েটারের নাম শোনা ইস্তক আজ একমাস ধরে রোজ দু'বেলা শাসাচ্ছেন, তিনি অভিনয় দেখতে আসবেন। যত বলি, আমার দু'লাইনের পার্ট, প্রায় মৃত সৈনিকের ভূমিকা বললেই চলে। সে আর দেখে কী হবে? তত জেদ বাড়ে। মনে মনে বোধ হয় ঠাউরেছেন যে, নিশ্চয়ই রাজপুত্র-টুত্র সেজে এই বৃদ্ধ বয়সে কোনো সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে প্রেম করব, তাই তাঁকে দেখতে দিতে চাইনে। হোঃ হোঃ হোঃ" বলে আর একদফা উচ্চ হাস্য করলেন সিদ্ধনাথ।

তুলির রেখার উপরে দৃষ্টি রেখে অঙ্কনরত বীরেশ্বর বললেন, "বেশ তো, আসুন না।"

"তুমি তো ভায়া বলেই খালাস। এদিকে আমাকে যে এখানকার ব্যবস্থা ফেলে রেখে ছুটতে হয়েছে বাড়িতে। এত করে বললেম, পাশের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে এসো। না, আমাকে নিজে গিয়ে নিয়ে আসা চাই। বলেন, অন্য কোনো সাধারণ সিনেমা, থিয়েটারে আর কাউকে নিয়ে যেতে আপত্তি নেই। কিন্তু এখানে আমার বন্ধু-বান্ধবদের ব্যাপার, আমার সঙ্গে না এলে নাকি তাঁর সম্মানের হানি ঘটে! কী আর করি? হুজুরাণীর হুকুম তো না মেনে রক্ষে নেই।" বলে সিদ্ধনাথ অসহায় কাতরতার ভঙ্গি করলেন।

কিন্তু এই কপট অভিযোগের অন্তরালে স্ত্রীর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ও প্রীতির যে সুনিশ্চিত প্রমাণ তাঁর কণ্ঠস্বরের

মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হলো, সেটা বীরেশ্বরের মতো অমনোযোগী মানুষের পর্যন্ত দৃষ্টি এড়ায় না।

"তোমার শ্রীমতী আসছেন কখন?" সিদ্ধনাথ জিজ্ঞাসা করলেন।

বীরেশ্বর সংশয়ের স্বরে বললেন, "কী জানি, আসবেন কি না—"

"আসবেন কি না কী হে? বলেন নি তোমায় কিছু? অবাক করলে। দেখছি, ছবিতে যত রাজ্যের সুন্দরীর মুখ এঁকে এঁকেই গেলে, নিজের স্ত্রীর মুখের পানে তাকাবার বুঝি আর সময় পেলে না? ওহে, বুড়োমানুষের কথাটা মনে রেখো, বাড়ির গিন্নীটি সবার আগে। ও-সব বান্ধবী-টান্ধবী হচ্ছে বিলাতী ডিনার স্যুট। ফিটফাট, ধোপ দুরস্ত। সন্ধ্যেবেলা পরে ক্লাবে, পার্টিতে যেতে মন্দ নয়। স্ত্রী হলো আমাদের সেকেলে দোলাই। কাট, ছাট, ইস্তিরির জৌলুস নেই বটে, কিন্তু এমন কাজের জিনিষ আর নেই ভাই। গ্রীষ্মে কাঁধে চাপালে, শীতে গায়ে জড়ালে, রোদে-বৃষ্টিতে মাথায় বাঁধলে।" বলে নিজের রসিকতায় নিজেই উৎফুল্ল হয়ে আর এক প্রস্থ অট্টহাস্য করলেন সিদ্ধনাথ।

বীরেশ্বরকে আর কিছু বলার অবকাশ না দিয়েই কণ্ঠস্বরে যথাসম্ভব গাম্ভীর্য আরোপ করে উপদেশ দিলেন সিদ্ধনাথ ;—

"না হে, যা বলছি শোনো। এক্ষুণি বাড়ি চলে যাও, বউমাকে নিয়ে এস। বুঝেছি, একটু মনান্তর হয়েছে আর কি। সে কিছু নয়। এক সঙ্গে ঘর করতে গেলে অমন

হয়েই থাকে। এই আমারই দেখ না, গিন্নীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি তো এক রকম লেগেই আছে। তা বলে একজনকে বাদ দিয়ে আর একজনের চলে কি? এক দণ্ডও না। শাস্ত্রকারেরা তো বলেই গেছেন,—অজা যুদ্ধে ঋষি শ্রাদ্ধে—কী হে পুরো কথাটা?"

সিদ্ধনাথ ব্যস্ত মানুষ। বেশীক্ষণ এক স্থানে স্থির হয়ে থাকা তাঁর স্বভাবে নেই। ইতস্ততঃ ছুটোছুটি না করলে তাঁর মনে স্বস্তি থাকে না। "যাই দেখিগে এদিকে অর্কেস্ট্রার দল ঠিকমতো এসে পৌঁচেছে কি না। মিসেস সেন যা উতলা মানুষ। হয় তো বা এরই মধ্যে গাড়ি নিয়ে ছুটেছেন তাদের তল্লাসে।" বলে দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

বীরেশ্বরের হলো কী? তার হাতের তুলি চলতে চায় না কেন? মালতীর পদশব্দে তার খেয়াল হলো, প্রায় মিনিট দশেক তিনি তুলি রেখে দিয়ে নিঃশব্দে নিষ্ক্রিয় বসে আছেন। আত্মস্থ হয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তাই তো, বাড়ি গিয়ে নিজে সুবালাকে নিয়ে এলে হয়। কী আশ্চর্য, এ-কথাটা তো এর আগে খেয়াল হয় নি।

অসমাপ্ত অঙ্কনকার্যের ভার মালতীর হস্তে ন্যস্ত করে তিনি চললেন মলী সেনের সন্ধানে।

বেশী দূর যেতে হলো না।

মলী সেন বুঝি বীরেশ্বরের খোঁজেই আসছিলেন। বীরেশ্বর বললেন, "মিসেস সেন, আমাকে একবার বাড়ি যেতে—"

বাক্য সমাপ্ত করার অবকাশ পেলেন না। মলী সেনের

মুখের পানে তাকিয়ে অর্ধ পথেই থেমে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কী মিসেস সেন? কী হয়েছে?"

"এই দেখুন কাণ্ড" বলে মলী সেন বীরেশ্বরের দিকে একটি পুস্তিকা এগিয়ে দিলেন।

অভিনয়ের প্রোগ্রাম।

অভিজাতগণের অভিনয়োৎসবে অভিনয়ের পরিচয় পুস্তিকা—প্রোগ্রামটি—একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। অবশ্য তাতে অভিনয় সংক্রান্ত তথ্য অতি সামান্যই থাকে। এক পৃষ্ঠায় বিভিন্ন ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন, কোনোটা জড়োয়া গহনার, কোনোটা বিলাতী প্রসাধন দ্রব্যের, কোনোটা বা সিগারেট বা চা বিক্রেতার। অপর পৃষ্ঠায় প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পনির্দেশক ইত্যাদির নাম। পৃষ্ঠান্তরে অভিনয়ের কোনো বিশেষ দু'একটি দৃশ্যের আগের ভাগে তোলা ফটোগ্রাফ এবং নায়ক-নায়িকাদের ছবি।

এ-ধরনের অভিনয় যাঁরা হামেশাই দেখেন, তাঁরা জানেন, প্রোগ্রামের মুদ্রিত বেশীর ভাগ মহিলার ফটোগ্রাফস্থ তন্বীদেহের সঙ্গে তাঁদের বর্তমান মেদবহুল বপুর মিল অতি সামান্যই থাকে। সেটা আশ্চর্য নয়। কারণ সেগুলি অন্ততঃ সাত-আট বৎসর আগে তোলা ফটোগ্রাফ। প্রোগ্রামে মুদ্রণের জন্যেই সযত্নে নির্বাচিত। আসলে সেগুলি—মা যাহা ছিলেন; মা যাহা হইয়াছেন নয়।

মুদ্রণ পারিপাট্যে ও গঠন সৌষ্ঠবে এ-সব ক্ষেত্রে অভিনয়ের চাইতে অভিনয়ের প্রোগ্রামটিই অধিকতর দৃষ্টি

আকর্ষক হয়; আধুনিক ইভিনিং পার্টিতে অধিকাংশ মেয়ের রূপের চাইতে পোষাকের মতো।

এই অভিনয়েরও একটি মনোহারিণী পরিচয় পুস্তিকা রচনার জন্যে মলী সেনের ব্যগ্রতার অবধি ছিল না। বহু দিন বীরেশ্বরের সঙ্গে তার পরিকল্পনা, আকৃতি ও মুদ্রণ সম্পর্কে তিনি বহু জল্পনা কল্পনা করেছেন। মলী সেনের আশা ছিল, বহু বর্ণে চিত্রিত ক্রিস্‌মাস্ কার্ডের মতো এক টাকা মূল্যের এই সুদৃশ্য প্রোগ্রামটিও অভিনয়ান্তে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যে দর্শকজনের ড্রয়িং-রুমে মেণ্টেলপীসের শোভা বর্ধন করবে। হায়, তার পরিণতি দেখে মলী সেনের প্রায় দুঃখে কান্না পাওয়ার উপক্রম। ক্রোধে বীরেশ্বরের বাক্‌রোধ।

বহু ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত অতি পুরাতন আংশিক ভগ্ন টাইপে মুদ্রিত, মফঃস্বল আদালতের নীলাম ইস্তাহারের মতো অস্পষ্ট, অপরিচ্ছন্ন। অভিনেতা, অভিনেত্রীগণের ছবিগুলি বিকৃত ও মসীলিপ্ত। অতি নিকট আত্মীয়গণের পক্ষেও এই ছবি থেকে ছবির পাত্রপাত্রীদের সনাক্তকরণ দুঃসাধ্য। কাণ্ডই বটে। প্রায় লঙ্কাকাণ্ড বললেই হয়।

ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বীরেশ্বর বললেন, "প্রেসের ম্যানেজারকে ধরে চাবকানো দরকার। এ তো সিলকেশান—আসল আর্ট পেপারই নয়। ইমিটেশান। এই কাগজে আর্ট প্লেট ছাপা চলে!"

মলী সেন এ-সব টেকনিক্যাল ব্যাপার সামান্যই বোঝেন। তিনি মিনতি করে বললেন, "এ প্রোগ্রাম তো

কারো হাতে দিতে পারব না। যা হয় একটা উপায় করুন, বীরেশ্বর-বাবু।”

বীরেশ্বর বললেন, “সে-কথা ঠিক। কিন্তু আমাকে যে এখন একবার বাড়ি যেতে হচ্ছে মিসেস সেন।”

“বাড়ি এখন থাক, বীরেশ্বর-বাবু, আপনি একবার না হয় প্রেসেই গিয়ে দেখুন, যদি কিছু করা যায়।”

“প্রেসে অন্য কাউকে পাঠালে হয় না? সুবালাকে—মানে আমার স্ত্রীকে একবার—”

বাধা দিয়ে কাতর কণ্ঠে মলী সেন বললেন, “অন্য আর কাউকে দিয়েই এ-কাজ হবে না। দোহাই আপনার বীরেশ্বর-বাবু। এক্ষুণি একবার গাড়িটা নিয়ে যান, এই প্রোগ্রাম নিয়ে কাউকে আমি আর মুখ দেখাতে পারব না। আর দেরী করবেন না। প্লীজ।”

ঊর্ধ্বশ্বাসে বীরেশ্বরকে ছুটতে হলো ছাপাখানার উদ্দেশে।

নিশ্চিন্ত মনে বেশ-বিন্যাসের সুযোগ যেন আর কিছুতেই মিলবে না মলী সেনের। তাঁর প্রসাধন কক্ষের দ্বারে মৃদু করাঘাত শোনা গেল।

মুখে ফাউণ্ডেশান লোশান লেপনে ব্যস্ত মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, “কে?”

বাইরে থেকে যে-নাম উচ্চারিত হলো, তা স্পষ্ট শুনতে পাওয়া না গেলেও বোঝা গেল, নারীকণ্ঠ।

মলী সেন ভিতরে আসতে বললেন।

দোর ঠেলে প্রবেশ করলেন নীরজা।

"এ কী, তুমি এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছ? সাজতে হবে না? ওঃ তাই তো, তোমার তো পার্ট একেবারে চতুর্থ অঙ্কে। তেমন তাড়া নেই।" বললেন মলী সেন।

নীরজা নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "কিছু চাই কি?"

"না।"

যদিও বিনা প্রয়োজনে মলী সেনের প্রসাধন কক্ষে নীরজার প্রবেশ কিছু একটা অভাবনীয় অঘটন নয়, তবুও মলী সেনের মনে হলো, উত্তরটা যথার্থ নয়।

নীরজা সমীরের পরিত্যক্ত আসন ওয়ার্ড্রোব-ট্রাঙ্কটার উপরেই চেপে বসলেন। খানিক চুপ করে থেকে বললেন, "মলীদি, তোমাকে একটা কথা বলব। রাগ করবে না, বলো?"

মলী সেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নীরজার পানে তাকালেন। কিন্তু নীরজা মলী সেনের দৃষ্টি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নির্বাক বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তার পর আর্তকণ্ঠে হঠাৎ বলে উঠলেন, "আমাকে তুমি মেরে ফেলো না, মলীদি।"

বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করে মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "মানে?"

চকিতে আসন থেকে উঠে এসে নীরজা নতজানু হয়ে মলী সেনের হাত দুটি চেপে ধরলেন। বললেন, "মিস্টার রয়কে তুমি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিও না, দোহাই তোমার, তাঁকে তুমি ছেড়ে দাও।"

সকাতর প্রার্থনার ভারে কণ্ঠ তাঁর করুণ, দুর্দমনীয় আবেগে দেহ তাঁর কম্পিত। মলী সেনের কোলের মধ্যে মাথা রেখে মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বারংবার বলতে লাগলেন, "দয়া কর, আমাকে দয়া কর, মলীদি।"

স্বভাবতঃ শান্তস্বভাব নীরজার এই অপ্রত্যাশিত আচরণে অভিভূত মলী সেনের যেন আর বাকশক্তি রইল না। কঠিন আঘাতে হতচেতন ব্যক্তির মতো তিনি নিশ্চল নিস্তব্ধ বসে রইলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নীরজা আত্মসংবরণ করে উঠে দাঁড়ালেন। আপন অঞ্চলে অশ্রুসিক্ত দুই চক্ষু মার্জনা করে নিজের আসনে ফিরে গেলেন। ম্লান হেসে বললেন, "আমাকে নিশ্চয় পাগল ভাবছ। অন্যায় নয়। উন্মাদ না হলে এমন অসম্ভবের পানে আমি হাত বাড়াব কেন? কিন্তু আমার সব কথাও আজ তোমাকে শুনতে হবে।"

চিত্রার্পিতের মতো নির্জীব মলী সেন যেন বহু আয়াসে শক্তি সঞ্চয় করে উচ্চারণ করলেন, "বেশ, বলো।"

নীরজা বিদুষী নয়। কথোপকথনেও তার তেমন দক্ষতা নেই। কিন্তু জগতে সত্য মাত্রেরই একটি অনাড়ম্বর অথচ অপ্রতিরোধনীয় আবেদন আছে। অতি অকিঞ্চিৎকর

কাহিনীও তার প্রভাবে হৃদয়স্পর্শী হয়ে ওঠে। নীরজার মুখে নিরলঙ্কার বর্ণনায় সত্যের সেই ঋজু, সহজ রূপটি তার অকিঞ্চিৎকর জীবন কাহিনীকেও একটি কমনীয় মাধুর্য দান করল।

কন্যা জন্মের পূর্বেই নীরজার পিতা লোকান্তরিত হন। তিন বছর বয়সে মাও মারা গেলেন। মামার বাড়িতে মানুষ নীরজা জ্ঞান হওয়া মাত্রই শুনেছে, সে দেখতে অত্যন্ত কুৎসিত, তার বিয়ে হওয়া দায়।

আশঙ্কাটা মিথ্যা নয়। তার গায়ের রং মিশ কালো, হাত দুটি সরু সরু, কপালটা মস্ত এবং দাঁতগুলি মারাত্মকরূপে অসমান! মামী রাগ করে বলতেন, দিনের বেলায়ও নাকি নীরজাকে দেখে ছোট ছেলেরা আঁতকে উঠতে পারে।

কিন্তু বিয়ের দুর্ভাবনা দেখা দেওয়ার অনেক পূর্বেই মাতুল ও মাতুলানী গ্রামের মড়কে মরলোক থেকে পরলোকে পাড়ি দিলেন। এক দল খৃস্টান মিশনারী এসেছিল ঔষধপত্র নিয়ে মহামারী নিবারণে। তাঁদের মধ্যে এক সন্তানহীনা মহিলা নীরজাকে নিয়ে গেলেন কলকাতায়। তাঁরই অনুগ্রহে নীরজা ম্যাট্রিক পাশ করলেন। ততদিনে নীরজার বুদ্ধি হয়েছে। বুঝেছেন, রূপহীনা মেয়েদের কপালে বর নিয়ে ঘর করার সম্ভাবনা অল্প। তাদের খেটে খেতে হয়।

কিন্তু চাকরির বাজারেও স্টেনোগ্রাফার নির্বাচনে অফিসারেরা স্পিডের সঙ্গে চান অন্ততঃ চলনসই চেহারা। শিক্ষয়িত্রী নিয়োগেও স্কুল-কমিটি এম. এ. বি. টি-র মুখ না

দেখে ভর্তি করেন না। স্ত্রী জাতীয় পেশার মধ্যে বাকী থাকে নার্সিং। তু'বছর ট্রেনিং নিয়ে নীরজা নার্স হলেন।

বসন্ত দিনের পুষ্পবনে যখন প্রজাপতির মেলা বসে, তখন পথের ধারে নাম-গোত্রহীন অনাদৃত ফুলের চার পাশেও নাকি ভ্রমরের আনাগোনা ঘটে। আশ্চর্য নয়। শ্রীহীনা নীরজার তুয়ারেও একদিন ভক্তের পুষ্পাঞ্জলি প্রসারিত হলো।

লোকটা হাসপাতালেরই একজন তরুণ ডাক্তার। তাঁর স্তুতি শুনে নীরজার প্রথম জ্ঞান হলো,—তিনিও নারী; যুগযুগান্ত হতে পুরুষের আরাধনার ধন। ভুলে গেলেন, তিনি কুদর্শনা। মনে হলো, অনুরাগের চন্দনতিলক ললাটে ধারণ করে জগতের সমস্ত কবিজনের কল্পলোকবিহারিণী তিলোত্তমা, হেলেন ও ক্লিওপেট্রাদের রাজ্যে এই সামান্ত নীরজারও একটি অসামান্ত পরিচয় আছে।

তারপর একদিন পূজা হলো সাঙ্গ। পূজারী হলেন নিখোঁজ। স্বর্গলোকচ্যুত দেবী তাঁর মাটির মূর্তিতে ফিরে এসে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পড়লেন ধূপহীন, দীপহীন, ক্ষান্তস্তব, স্তব্ধপাঠ, পরিত্যক্ত মন্দিরের শোকাবহ দীনতার মধ্যে। সেই কলঙ্কিত পরাভবের তুরপনেয় লজ্জায় নিজের কুরূপ নিজের কাছে দ্বিগুণিত কদর্যতায় আবার নতুন করে প্রকট হলো।

অশ্রুমোচন করে নতুন হাসপাতালে কর্ম সন্ধান করলেন নীরজা। সেখানেই একদিন এ্যাম্বুলেন্স বহন করে আনল বসন্ত রোগাক্রান্ত মরণোন্মুখ নিখিলকে। তার আরোগ্যের আশা মাত্র ছিল না কারো মনে।

এ-রোগে চিকিৎসার সুযোগ সামান্য। পরিচর্যাই প্রধান। প্রত্যহ শত শত পীড়িত লোক নিয়ে যাদের কারবার, তাদের কাছে কোনো বিশেষ লোকের প্রতি সবিশেষ মনোযোগ প্রত্যাশা করা বৃথা। হাসপাতালে একজন নতুন রোগী আর একটি নতুন 'কেস' মাত্র। আর কিছু নয়। কেন যে এ-রোগীটির প্রতি নীরজার মনোযোগ আকৃষ্ট হলো, তা আজও তার কাছে অজ্ঞাত। ভয়াবহ, ছোঁয়াচে ব্যাধির সমস্ত বিপদ অগ্রাহ্য করে প্রাণপাত পরিশ্রম ও পরিচর্যা দ্বারা নীরজা নিরাময় করে তুললেন নিখিলকে।

সে-ঋণ নিখিল জীবনে ভোলেন নি।

আরোগ্যান্তে নার্সদের পুরস্কার দেওয়ার রীতি নতুন নয়। সত্যি সত্যি প্রাণদান করেছেন যিনি, কৃতজ্ঞ নিখিল তাঁকে স্ফীত অঙ্কের চেক লিখে দিলেন। নীরজা সে-টাকা মাথায় ঠেকিয়ে সযত্নে বাক্সে তুলে রাখলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, কোনো দুর্দিনে এর একটি কপর্দকও স্পর্শ করবেন না।

বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে চৈত্রের খর রৌদ্রে বিশুষ্ক জলাশয়ের কোন প্রান্তে যে কলমীলতার মূল সঙ্গোপনে লুকিয়ে থাকে, তা কেউ জানে না। নবীন আষাঢ়ের প্রথম ধারা বর্ষণেই সেই অদৃশ্য লতার নব পত্রোদ্গম ঘটে। নীরজার হৃদয়ের যে-ভাবাবেগ একদা প্রবঞ্চনার অগ্নিদাহে নিঃশেষে ভস্মীভূত হয়েছে বলে তাঁর ধারণা ছিল, অলক্ষিত জলসিঞ্চনে কখন যে তার আবার নতুন অঙ্কুর দেখা দিয়েছে, সে-সন তারিখ তাঁর নিজেরও জানা নেই।

রেসিডেন্ট ফিজিসিয়নের সঙ্গে ঝগড়া করে হাসপাতালের কাজ ছেড়ে দিতে হলো নীরজাকে।

খবর পেয়ে নিখিল এসে প্রস্তাব করলেন, তাঁর অসুস্থ পিসিমাকে প্রত্যহ নিয়মিত দেখা শোনা করার। নীরজা বুঝলেন, পিসিমা উপলক্ষ মাত্র। লক্ষ্য, যতদিন তার অন্যত্র কর্মসংস্থান না ঘটে ততদিন পরোক্ষে অর্থসাহায্য।

এ-পক্ষেও টাকাটা গৌণ, মুখ্য নিখিলের সান্নিধ্য। মাইনে একবেলার, কিন্তু নীরজা দু'বেলাই নিখিলের বাড়ি আসতে লাগলেন।

পিসিমার পরিচর্যার প্রয়োজন সামান্যই ছিল। দেখা গেল, নার্সেরও রোগীর চাইতে সুস্থ লোকের প্রতিই দৃষ্টিটা যেন বেশী প্রখর। নিখিল দেখেন, আজকাল তার আহার্যে নিত্য নতুন ব্যঞ্জন, রুমালে মনোরম সূচীশিল্প, আলমারীতে হাতে বোনা সুদৃশ্য পুলোভার।

এক বন্ধু ডাক্তার নতুন ক্লিনিক খুলছিলেন। নিখিল সুপারিশ চিঠি দিয়ে নীরজাকে পাঠালেন তাঁর কাছে। নীরজা রাস্তায় চিঠিখানা খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন ডাস্টবিনে। পরদিন এসে নিখিলকে বললেন, ডাক্তার আগেই অন্য নার্স নিযুক্ত করেছেন। চাকরি খালি নেই আর।

ভক্তিমতী গৃহিণীরা পাথরের ঠাকুর পূজা করেন পরম নিষ্ঠায়। নানা উপচারে নৈবেদ্য সাজিয়ে ধরেন তাঁর সামনে। ঠাকুর প্রসন্ন হন কিনা, কে জানে? নীরজার মনেও সংশয় জাগে। তাঁর অর্ঘ্য কি সমস্তই বৃথা?

অবশেষে পাষাণেও চাঞ্চল্য দেখা গেল। বৈজ্ঞানিকেরা জানেন, সিসমোগ্রাফ যন্ত্রে সহস্র যোজন দূরবর্তী ভূখণ্ডের মৃদুতম কম্পনটুকু পর্যন্ত রেখাপাত করে। তার চাইতেও বহুগুণ স্পর্শকাতর তন্ত্রী আছে মানুষের হৃদয়ে। দৃষ্টির অগোচর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্তনের সামান্য আভাষটুকু পর্যন্ত ধরা পড়ে তাতে। নীরজা আবিষ্কার করলেন, ক্লাবের প্রতি সম্প্রতি নিখিলের মনোযোগটা বৃদ্ধি পেয়েছে। সভয়ে অনুমান করলেন, আকর্ষণটা কেবলমাত্র তাস বা টেনিস বলের মতো নির্জীব বস্তুর প্রতি নয়।

নিখিলের সহায়তায় ক্লাবে ভর্তি হওয়া নীরজার পক্ষে কঠিন নয়। সেখানে প্রথম পদার্পণেই বুঝতে পারলেন, কোথায় আছে নিখিলের আনন্দের উৎস, কার হাতে আছে নীরজার মৃত্যুবাণ। অনুরক্ত নারীর চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন। তার দৃষ্টি দূরবীক্ষণের মতো সন্ধানী, অণুবীক্ষণের মতো তীক্ষ্ণ।

নীরজার আত্মকাহিনী সমাপ্ত হলে মলী সেন কয়েক মিনিট অধোমুখে চুপ করে রইলেন। তারপর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি আশা করো, মিস্টার রয় তোমাকে বিয়ে করবেন।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় চমকিত নীরজা উত্তর দিলেন, "না। আমি জানি, সে কোনো দিন সম্ভব নয়।"

"তিনি তোমাকে ভালোবাসেন?"

"জানিনে।"

"মিথ্যে কথা। পুরুষের ভালোবাসা টের পায় না এমন মেয়ে জগতে নেই। তুমি ভালো করেই জানো, তোমার প্রতি তাঁর আকর্ষণ নেই।" দৃঢ় কণ্ঠে বললেন মলী সেন।

এক মুহূর্ত নীরব থেকে নীরজা বললেন, "হয়তো তোমার কথাই ঠিক।"

"তবে?"

সত্যি তো, তবে? এই তবের কোনো জবাবই নেই নীরজার। কী কামনা করেন তিনি? কিসের প্রত্যাশা তাঁর? কেন এই ঈর্ষাভারাক্রান্ত হৃদয়ের নিরন্তর আকুলি-বিকুলি?

নীরজা বললেন, "মলীদি, যুক্তি দিয়ে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না। সত্যি বলছি তোমাকে, এতদিন ভাবতেম আমার মনে ঝাপ্‌সা কিছুই নেই। জানতেম, মিস্টার রয় চিরকাল একেলা থাকবেন না। একদিন তাঁর ঘরে সত্যিকার গৃহকর্ত্রী আসবে; মাইনে-করা নার্সের নকল গৃহিণীপনার আর প্রয়োজন থাকবে না। সে-দিন দুঃখ করব না। যথার্থ অধিকারীর হাতে আমার গায়ে-পড়া দায়িত্বভার তুলে দিয়ে সহজ-ভাবেই আমি বিদায় নেবো। কিন্তু সম্প্রতি বুঝেছি, সে-সমস্তই ভ্রান্তি। বুঝেছি নিজের মনকেও মানুষ সব সময়ে ঠিক বুঝতে পারে না।"

মলী সেন মুরুব্বীয়ানার ভঙ্গিতে বললেন, "সে-জন্যেই আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োজন।"

নীরজার কানে এ-কথা আদৌ প্রবেশ করল কি না সন্দেহ। তিনি আপন বক্তব্যেরই অনুবৃত্তি করে বলতে

১০

লাগলেন, "কতদিন কল্পনা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি যে, যতটুকু পাওয়া সম্ভব, তার বেশীতে আমার লোভ নেই। বাস্তবের প্রথম আঘাতেই সে-ভুলের ঘোর ভেঙ্গেছে। যাঁকে আমার হাতে পাই নি, তাঁকে তোমার হাতে হারাবার শঙ্কাতে আজ আমি অস্থির। বুঝেছি, নাটক উপন্যাসের মহীয়সী নায়িকার মতো নিঃস্বার্থ প্রেমের গৌরব ঘোষণা করা আমার সাধ্য নয়। যে বলে, ভালোবেসেই সুখী, প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখিনে, না মলীদি, সে-মেয়ে আমি নই।"

মলী সেন এমন সতেজ-সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তির জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কী চাও?"

"আমি মন দিতে চাই, মন নিতে চাই।"

মলী সেন কিছুটা বিদ্রূপ কিছুটা বা যুদ্ধের ভঙ্গিতে জবাব দিলেন, "বটে? কিন্তু মাই ডার্লিং, ভালোবাসা তো ক্রিস্‌মাস্‌ প্রেজেণ্ট নয়। স্যাণ্টাক্লস মোঁজায় ভরে' তা কারো জন্যে বয়ে আনে না। সেটা জয় করার ধন; ভিক্ষে করার নয়।"

"আমি বুঁঝেছি। কিন্তু তোমার এ-চ্যালেঞ্জের কোনো বাহাদুরী নেই, মলীদি! প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে সমানে সমানে। তুমি আর আমি কি এক? তোমার অসামান্য রূপ, তোমার প্রখর বুদ্ধি, তোমার অগাধ ঐশ্বর্য। তোমার সমস্ত সামাজিক প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা নিয়ে তুমি দাঁড়িয়েছ অতি কুরূপা, কুলহীনা, বিত্তহীনা, নগণ্য এক নারীর বিরুদ্ধে। এ যে

মোহনবাগানের সঙ্গে নেবুতলার ম্যাচ্। এই জয়ের বড়াই কর তুমি? ধিক!"

মলী সেন ড্রেসিং টেবিলের উপরে ঘড়িটার পানে তাকিয়ে বললেন, "অভিনয় সুরু হওয়ার আর বেশী দেরী নেই। আমাকে তৈরী হতে হবে, নীরজা। এ-প্রসঙ্গ থাক। সেকালে স্বামী নিয়ে ঝগড়া হতো সতীনে সতীনে। কিন্তু একালে সখা নিয়ে কলহ চলে না কারো সঙ্গে। অন্ততঃ নার্সের সঙ্গে তো নয়ই।"

কঠিন অপমানের তীব্র আঘাতে মুহূর্তের জন্যে নীরজার সমস্ত দেহ যেন অসাড় হয়ে গেল। চোখে অন্ধকার দেখলেন। দুই হাত দিয়ে ওয়ার্ড্রোবটার প্রান্ত দুটি সবলে চেপে ধরে কোনোমতে যেন নিজকে পতন থেকে রক্ষা করলেন। কিছুক্ষণ পরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "তুমি আমার চেয়েও অযোগ্য তোমাকে ঈর্ষা করব না, করুণা করব।"

ধীর, শান্ত, সংযত পদক্ষেপে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন নীরজা। দীনার মতো সঙ্কোচে নয়, রাণীর মত গৌরবে।

"এ কী, আপনি এখানে?"

প্রশ্ন শুনে শিবনাথ পিছনে তাকিয়ে দেখলেন, সত্যসিন্ধু। একটু হেসে বললেন, "অবাক হচ্ছেন কেন? এখানে কি আমার অনধিকার প্রবেশ?"

সত্যসিন্ধুও পরিহাসতরল কণ্ঠেই বললেন, "তা জানিনে। তবে আপনাকে ঠিক প্রত্যাশা করি নি। রেসকোর্সে কি কেউ পাদ্রীদের দেখবে আশা করে বা স্টক এক্সচেঞ্জে স্বামীজীদের ?"

শিবনাথ বললেন, "সে কী কথা ? আপনি কি এখনও আজকের বিশ্ববার্তা দেখেন নি ? প্রচারসচিব সুরেন লাহিড়ী শুনতে পেলে যে আপনার আর মুখদর্শন করবেন না।"

"বটে ? লাহিড়ী তাঁর প্রচার পত্রিকায় আপনাকে আজকের অভিনয়ে প্রধান অভিনেতা বলে উল্লেখ করেছে নাকি ?"

"না, অতখানি জলজ্যান্ত মিথ্যা বোধ হয় তাঁর কলমেও আটকায়। বলেছেন,—প্রয়োগকর্তা।"

"বুঝেছি, আমাদের সংবাদপত্রের মালিক-সম্পাদকদের মতো,—ডামি। ক্ষুণ্ণ হবেন না। নিয়ম রক্ষার জন্যে ওটা দরকার। জানেন তো, আমাদের ছেলেমেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণপত্রে নিবেদকের নাম দিতে হয় বাড়ির সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির, যদিও হয়তো সরিকী ঝগড়ার ফলে অন্য সময়ে তাঁর সঙ্গে মুখ দেখা-দেখি পর্যন্ত বন্ধ।" সত্যসিন্ধু হাস্য করলেন।

শিবনাথও না হেসে পারলেন না। একটু থেমে বললেন, "নাটকে আপনার পার্ট কি, ডাক্তার ঘোষ ?"

সত্যসিন্ধু জবাব দিলেন, "একমাত্র বিদূষকের ভূমিকা ছাড়া আর কিছুতেই আমাকে মানায় না। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই যে, আজকাল নায়কেরাই প্রায় বিদূষকের মতো আচরণ করে। তাই আলাদা করে নাটকে ও-পার্টটা আর থাকে না।"

শিবনাথ হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "তা হলে আপনি আমারই দলে, শুধু দর্শক।"

সত্যসিন্ধু আধা পরিহাস ও আধা গাম্ভীর্যের স্বরে বললেন, "দর্শক সে-কথা ঠিক। তবে আপনার সগোত্র বললে বোধ হয় সত্যের অপলাপ হবে।"

"কেন ?" বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন শিবনাথ।

"আসলে আপনিও অভিনেতাদেরই দলে। আজকের নাটকের কুশীলবদের সঙ্গে আপনার তফাৎ শুধু এই যে, যবনিকা পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের পালা শেষ। আপনার পালা চলছে অহোরাত্র। না, শিবনাথবাবু, আপনার অদৃষ্টকে ঈর্ষা করিনে। গ্রীন-রুমটা স্টেজের সঙ্গেই ভালো। সেটাকে সত্যিকার জীবনে টেনে আনলে দুর্গতির আর সীমা থাকে না। ও কী ? হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠছেন যে ! না, না, আমার কথায় অনাবশ্যক গুরুত্ব দেবেন না যেন। ও-সব আমার স্বগতোক্তি মাত্র। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থেকে যে আমরা মঞ্চশিল্পীর স্টেজ সাজানোর ব্যাপারে বড়ই অসুবিধা ঘটাচ্ছি। চলুন ঐ দিকটায়।"

বীরেশ্বর এসে বললেন, "মিসেস সেন, আমি একটু আমার বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি।"

মলী সেন বললেন, "অভিনয় সুরু হতে আর আধ ঘণ্টাও বাকী নেই। এখন বাড়ি যাচ্ছেন কী রকম?"

"অভিনয়ে আমার যা কাজ তা সবই শেষ হয়েছে।"

"শুধু সীন, সিনারি আঁকা শেষ হলেই আর্ট ডিরেক্টারের কাজ ফুরোয়, ভেবেছেন বুঝি?"

"সেগুলি যাতে ঠিক মতো যথাসময়ে ব্যবহার হয়, তার ব্যবস্থাও করেছি। প্রথম দৃশ্যের জন্যে স্টেজ সেট করাই আছে। পরের দুটো দৃশ্যের সাজসরঞ্জামও জড়ো করা হয়েছে। এখন যবনিকা তুললেই হয়।"

মলী সেন মাথা নেড়ে বললেন, "না, হয় না। আপনি নিজে সর্বক্ষণ সামনে দাঁড়িয়ে না থাকলে দেখবেন কোনো কিছুই নির্ভুল হবে না।"

এ-বিষয়ে অবশ্য বীরেশ্বরের মনেও কিছুটা শঙ্কা ছিল। যদিও তিনি সহকর্মীদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন, তবুও তাঁর ভয়, হয়তো পটোত্তোলনের পরে দেখা যাবে কুঞ্জবনের দৃশ্যে রাজপথের চিত্র, অথবা রাজসভার দৃশ্যে জলের প্রস্রবণ।" বললেন, "আমি সেই কাল বিকেল থেকে এখানেই আছি। এখন একবার বাড়ি না গেলে—"

"আপনার স্ত্রী ভাববেন যে, হয় হারিয়ে গেছেন, নয়তো ছেলেধরায় ধরেছে!" কৌতুকমিশ্রিত কণ্ঠে মন্তব্য করলেন মলী সেন।

বীরেশ্বর হেসে বললেন, "না, তা ঠিক নয়। তবে স্ত্রীর কারণেই বাড়ি যেতে হচ্ছে সেটা ঠিক।"

"ব্যাপার কী ?"

"তাকে অভিনয় দেখতে নিয়ে আসতে যাচ্ছি।"

"সে-জন্যে আপনার যাওয়ার প্রয়োজন কী ?" আমি এক্ষুণি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"না, গাড়ি পাঠালে হবে না। আমিই যাব।"

"কেন বলুন তো ?"

একটু ইতস্ততঃ করে বীরেশ্বর বললেন, "সুবালা, মানে আমার স্ত্রী, একটু—ইয়ে—যাকে বলে রিজার্ভড। আমি নিজে সঙ্গে করে নিয়ে না এলে, হয়তো আসবেনই না।"

মলী সেন জানেন, মঞ্চসজ্জার সমুদয় আয়োজন একেবারে ত্রুটিলেশহীন না হওয়া পর্যন্ত বীরেশ্বরের ক্ষান্তি নেই। তাঁর দিক থেকে অভিনয়ের সমুদয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ না করে তিনি স্টেজ থেকে একদণ্ডও অন্যত্র যাবেন না। সুতরাং কিছুক্ষণের জন্যে বীরেশ্বরের অনুপস্থিতিতে মলী সেনের বিশেষ আপত্তি ছিল না। তিনি বীরেশ্বরের অনুরোধে সম্মত হতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বীরেশ্বরের স্ত্রীর উল্লেখ মাত্রই মলী সেনের মত পরিবর্তন ঘটল।

সুবালাকে তিনি কখনও দেখেন নি। তাঁর সম্পর্কে কিছু জানেনও না। তবুও মলী সেনের মনে হলো, এই অজ্ঞাত অপরিচিত মহিলাটি অন্তরালে থেকে অভ্রভেদী ঔদ্ধত্যে তাঁকে যেন দ্বন্দ্বে আহ্বান করেছে। বীরেশ্বরের গতিবিধি নিয়েই যেন দু'পক্ষের ক্ষমতার পরীক্ষা। বীরেশ্বরকে এই দণ্ডে বাড়ি যাওয়া থেকে নিবৃত্ত না করতে পারলেই যেন এই টেস্টে মলী

সেনের ইনিংস ডিফিট! তিনি শক্ত হয়ে বললেন, "কিন্তু এখন তো আপনার এখান থেকে নড়া সম্ভব নয়, বীরেশ্বর বাবু!"

"আমার বেশী বিলম্ব হবে না। আমি ট্যাক্সি নিয়ে যাচ্ছি। খুব সম্ভব অভিনয় সুরু হওয়ার আগেই ফিরে আসতে পারব।"

"আমি জানি, পারবেন না। কিন্তু আপনি যখন মন স্থিরই করে ফেলেছেন তখন আর এ নিয়ে তর্ক করে কী ফল?"

বীরেশ্বর সঙ্কুচিত হয়ে বললেন, "একান্ত প্রয়োজন না হলে আমি কখনও, আপনি বিশ্বাস করুন—"

বিরস কণ্ঠে বললেন মলী সেন, "বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা এর মধ্যে কী আছে, বীরেশ্বর বাবু? আর এত অনুরোধ উপরোধেরই বা প্রয়োজন কী? আমি স্কুলের হেডমাস্টারও নই, এখানে কেউ আমার মাইনে-করা কর্মচারীও নয় যে, আমার অনুমতি না নিয়ে তারা কোথাও যেতে পারবে না। এই সাহায্য রজনীর উদ্যোগ করেছি আমি। নিমন্ত্রিত, অভ্যাগত ও দর্শকদের কাছে ভালো-মন্দ জবাবদিহির দায়ও আমারই। আপনারা দয়া করে আমাকে সাহায্য যতটুকু করেছেন, সে আপনাদের মহত্ত্ব। তার চেয়ে বেশী প্রত্যাশা করাটাই ভুল।"

স্পষ্টই বোঝা গেল, মলী সেন অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। বিস্ময়ের কিছুই নেই। বেচারী আজ মাসখানেক ধরে এই অভিনয়ের জন্যে কী কঠোর পরিশ্রমটাই না করেছে।

কোনো কারণে অভিনয় যদি শেষ পর্যন্ত সার্থক না হয়, তবে সমস্ত ব্যর্থতার লজ্জা তো তাঁরই। মঞ্চসজ্জা নিয়ে তাঁর এই উৎকণ্ঠা তো স্বাভাবিক।

বীরেশ্বর হৃদয়ঙ্গম করলেন। অনুতপ্ত হয়ে বললেন, "আমার অন্যায় হয়েছে, মিসেস সেন। অভিনয় শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্টেজ থেকে নড়ছি না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, অন্ততঃ মঞ্চসজ্জার দিক থেকে অভিনয়ে খুঁত থাকতে দেব না।"

ব্যস্। আউট। একটি ইন্-সুইঙ্গারে সুবালার লেগস্টাম্প উড়িয়ে দিয়েছেন মলী সেন।

খুশি হলেন। কিন্তু মনোভাব সম্পূর্ণ গোপন করে কিছুটা উদ্বেগের ভঙ্গিতে বললেন, "কিন্তু আপনার স্ত্রী যদি আপনি না গেলে সত্যি না আসেন, তবে তো—"

"আমি একবার তাঁকে টেলীফোন করার চেষ্টা দেখিগে।"

প্রস্থানরত বীরেশ্বরের পানে তাকিয়ে সদ্য জয়লাভের আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠলেন মলী সেন। মৃদুকণ্ঠে একটা গানের কলি গুন্ গুন্ করতে করতে পুনরায় প্রসাধন সুরু করলেন। গভীর আত্মপ্রসাদের সঙ্গে মনে মনে বললেন, "যে-কোনো পুরুষ মানুষকে দিয়ে যা ইচ্ছে করাতে পারি আমি। হ্যাঁ, যা ইচ্ছে তা-ই। তর্জনী সঙ্কেতে যদৃচ্ছা চালনা করতে পারি তা'কে।"

ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় আপনার অপরূপ দেহলাবণ্যের দিকে তাকিয়ে সগর্বে ভাবলেন মলী সেন, তিনিই সেই অনন্যা নারী, রূপকথার রাজপুত্রেরা যাঁর কমল নয়নের প্রসাদ যাচ্ঞা

করে অনায়াসে প্রাণ বিসর্জন করেছে দুঃসাধ্য সাধনে। বেদ পুরাণের যোগীঋষিরা যুগযুগান্ত ধরে অর্জিত তপস্যার ফল নিমেষে ডালি দিয়েছে যাঁর চরণে। নগণ্য সুবালা! তাঁর জন্যে অবজ্ঞামিশ্রিত কারুণ্য বোধ করলেন মলী সেন।

পদশব্দে মলী সেন পিছনে তাকিয়ে দেখলেন,—সত্যসিন্ধু।

অপ্রত্যাশিত। কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত নয়। মন খুশিতে ভরা ছিল, তারই প্রকাশ ঘটল অভ্যর্থনায়। স্নিগ্ধ হাস্যে সুরের রেশ টেনে বললেন, "কেন এলে মোর ঘরে আগে নাহি বলিয়া?"

সত্যসিন্ধু জবাব দিলেন, "ত্রুটি স্বীকার করছি। কিন্তু শঙ্কিত হয়ো না। প্রণয় নিবেদন করতে আসি নি।"

আনন্দের যে-জাল বুনেছিলেন মলী সেন এতক্ষণ নিজের মনে মনে, মুহূর্তে সে খান্ খান্ হয়ে ছিঁড়ে নষ্ট হয়ে গেল।

আহত কণ্ঠে বললেন, "তা জানি। কিন্তু যদি আসতেই, তাতেই বা এমন অগৌরব ছিল কী? রমণীর মন, সহস্র বর্ষেরই সখা সাধনার ধন। 'সঞ্চয়িতা'খানা আনতে বলব কী?"

"থাক, দরকার হবে না। স্মৃতিশক্তি সমস্তটাই এখনও লোপ পায় নি। কিন্তু আমি তো উত্তরায়ণ বা শ্যামলীতে বসে পঁচিশ ভল্যুম রচনাবলী লিখতে পারিনে। আমি

সাধারণ মানুষ। জীবনদেবতার চাইতে জীবনসঙ্গিনীর প্রতি আমার বেশী লোভ। ভূমার চাইতে ভূমিকে আমি অধিকতর সত্য মনে করি। তাই এ্যাডমায়ারার প্লেটে "অল্‌সো র‍্যান"-এর সংখ্যা বাড়াতে আমার প্রবৃত্তি নেই।"

ম্লান হেসে মলী সেন বললেন, "কোনো কিছুই একেবারে ষোল আনা সত্ত্বে না পেলে তোমার মন ওঠে না। মনোভাবের দিক দিয়ে তুমি হচ্ছ এক জন ঝানু ক্যাপিট্যালিস্ট। হেনরী ফোর্ড বা জি. আর. ড়ি. টাটার সগোত্র। আর যাই হোক সিন্ধু, তুমি আধুনিক নও।" কথার শেষের দিকে তাঁর গলার স্বর কৌতুকে লঘু চপল হয়ে উঠল।

অনুরূপ পরিহাসতরল কণ্ঠে সত্যসিন্ধু জবাব দিলেন, "সানন্দে স্বীকার করছি, আমি অনাধুনিক। প্রেমের ক্ষেত্রে প্রাইভেট ওনারশিপই আমার পছন্দ। হৃদয়াবেগের ন্যাশন্যালাইজেশানে আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু এ-সব বৃহৎ তত্ত্বকথার আলোচনা আপাততঃ থাক। আমি একটা বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি। না, ঘড়ির দিকে তাকাতে হবে না। আমি কয়েক মিনিটের বেশী সময় নেব না। শুধু কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব।"

মলী সেন জিজ্ঞাসু নেত্রে তাঁর পানে তাকালেন।

সত্যসিন্ধু এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে বললেন, "বিষয়টা আমার পক্ষে একটু সঙ্কোচের, ইংরেজীতে যাকে বলে এম্বেরাসিং। শুনে তুমি যদি অনধিকারচর্চা বলে থামিয়ে দিতে চাও, তা'হলেও আমি অভিযোগ করব না।"

"ভূমিকা তো হলো। এবার বলো।" বললেন, মলী সেন।

"প্রশ্নটা মিস্টার ব্যানার্জী—শচীন সম্পর্কে।"

মলী সেন দৃষ্টি নত করে বললেন, "কী জানতে চাও ?"

ঠিক সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সত্যসিন্ধু বললেন, "সাধারণতঃ অন্য লোকের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো আমার স্বভাব নয়। চরকা নিজের থাকলে তাতেও তেল দিতুম কি না সন্দেহ, পরেরটা তো দূরের কথা। কিন্তু শচীনের ব্যাপারটার দিকে চোখ বুজে থাকতে পারছিনে। তাঁর মা আমার দূর সম্পর্কে বোন। তাঁকে তুমি কখনও দেখেছ ?"

"না। তবে তাঁকে আজ আমাদের অভিনয় দেখার নিমন্ত্রণ করেছি। হয়তো আসবেন।"

"খুব সম্ভব আসবেন না। সংসারে এ-সব আনন্দ উৎসবের আসরে কখনও কোথাও তাঁকে দেখেছি, স্মরণ হয় না। শচীন তোমাকে তাঁর কথা কী বলেছে ?"

"বিশেষ কিছু নয়। শুধু এই যে, ভগবানে তাঁর অগাধ বিশ্বাস, আর ছেলের উপরে অসীম স্নেহ।"

"পুত্রস্নেহ কোন মায়ের কম ? কিন্তু এই মহিলা যেন অন্য সকল মায়ের চাইতেও বেশী মা। জীবনে বহু দুঃখ পেয়েছেন তিনি। সে জন্যেই আমার ভয়।"

"কিসের ভয় ?"

"বিধবা বুঝি বা তাঁর সর্বশেষ আশা ও অবলম্বন একমাত্র ছেলের দিক থেকেও ঘা খান।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করে মলী সেন বললেন, "অর্থাৎ সাদা কথায়, ভয় আমাকে ?"

সত্যসিন্ধু সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, "নিজের অজ্ঞাতেও আমরা অনেক সময়ে অপরের দুঃখের কারণ হই। অনিচ্ছাকৃত ক্ষতিসাধনের দৃষ্টান্তও পৃথিবীতে কম নেই। সেবার আমাদের পাড়ায় দেয়ালীর রাত্রে দূরবর্তী এক ছাদ থেকে জ্বলন্ত বাজির একটা স্ফুলিঙ্গ ছিটকে এসে একটা বড় বস্তিকে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পুড়িয়ে ছাই করে দিল। কত দরিদ্র হলো গৃহহীন, কত দুঃস্থ হলো সর্বস্বান্ত। অথচ যারা বাজি পোড়াচ্ছিল তাদের মনে তো কোনো দুরভিসন্ধি ছিল না।"

মলী সেন বললেন, "সিন্ধু, তুমি যা বলতে চাও সোজা করেই বলো। কোদালকে কোদাল বললে বুঝতেও সহজ, চিনতেও কষ্ট নেই। সাধু ভাষায় খনিত্র নাম দিয়ে তাকে অনাবশ্যক রহস্যময় করে তুলো না।"

সত্যসিন্ধু বুঝলেন, তর্কে অবতীর্ণ হচ্ছেন মলী সেন। পুরাতন স্মৃতি মনে পড়ল। কতদিন কত বিষয় নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছে তাঁদের। প্রখর মলী সেনের বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ তাঁর অনুভূতি, অসাধারণ তাঁর বাকনৈপুণ্য, জোরালো তাঁর যুক্তিজাল। তর্কে তাঁকে সহসা পরাজিত করা সহজ নয় কারো পক্ষে।

নিজেও প্রস্তুত হয়ে বললেন, "বেশ, তাই বলছি। শচীনকে তুমি মুক্তি দাও।"

বটে! এও তো সেই, "আমাকে দয়া কর মলীদি"রই

ঈষৎ পরিবর্তিত ভাষণ—রিভাইজড্ ভার্সন মেয়েলী অনুনাসিক কান্নারই পুরুষালী পুনরাবৃত্তি! অসহ্য!

নিজের মনে মনে মলী সেন নীরজার সেই অবজ্ঞাভরে প্রস্থানের অপমানে নিরন্তর দগ্ধ হচ্ছিলেন। তাই ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। অগ্নিস্রাবী দুই চক্ষু সত্যসিন্ধুর পানে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, "মুক্তি কার কাছ থেকে?"

"মিথ্যা থেকে, অলীক স্বপ্নবিলাস থেকে, তার আপন মোহপাশ থেকে।" উত্তর করলেন সত্যসিন্ধু।

মলী সেন এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। নম্র স্বরে বললেন, "শচীনকে আমি পছন্দ করি, এ যেমন মিথ্যা নয়, আমাকে তার ভালো লাগে এও তেমনি সত্যি। একে অস্বীকার করতে চাও তুমি?"

"না, চাইনে। কিন্তু সংসারে ভালোলাগা নিয়ে বিবাদ বাধে না। কারণ তার তো কোনো দায় নেই। যত গোল ভালোবাসা নিয়ে। তার দাবী যে অফুরন্ত। তোমার কথা ভাবিনে। তুমি চিরকাল দোরকেই ঘর ভেবে আনন্দ পাও। তোমার ভুল ভাঙ্গাবার চেষ্টা বৃথা। দুঃখ হয় শচীনের জন্যে।

খোঁচাটা মলী সেনকে যথেষ্টই বিঁধল। কিন্তু সে নিয়ে কলহ না করে জিজ্ঞাসা করলেন, "কারণ?"

"কারণ সাগর-তরঙ্গ তো ক্যানিউটের আজ্ঞা মেনে চলে না। শচীনের ভালোলাগার স্রোত তো তোমার ভালোলাগার সরু ধরা-বাঁধা খাদ বেয়েই চিরকাল বইবে না।

করবে, কখন যে সে ক্ষীণ ধারা হৃদয়ের একূল-ওকূল দু'কূল ছাপানো প্লাবনে ভালোবাসার বিরাট সমুদ্রে পরিণত হবে, হতভাগ্য তা জানতেও পারবে না। তারপরেই সুরু হবে আশাভঙ্গের পালা।"

"কিন্তু আশা যদি হয় অসম্ভবের তবে মনস্তাপ থেকে তাকে ঠেকাবে কে? শচীন চায় আমাকে বিয়ে করতে।"

"কী বললে?" বিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন সত্যসিন্ধু। নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারেন না।

"হ্যাঁ, কাল সন্ধ্যেবেলা সে রীতিমতো ফর্ম্যালী প্রপোজ করেছে। পাগল আর কাকে বলে?"

মিনিট কয়েক দুজনেই চুপ করে রইলেন। সত্যসিন্ধু মনে মনে বোধ হয় সমস্ত বিষয়টা ভেবে দেখলেন। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে অনেকটা অর্ধস্বগতোক্তির মতো বললেন, "না, এতটা আমিও ভাবতে পারি নি। ব্যাড্, অফুলি ব্যাড্।"

"আমাকে কী করতে বলো?"

"শচীনকে বিয়ে করতে বলি না নিশ্চয়ই। না, পরিহাসের বিষয় বা সময় এটা নয়। কিন্তু পরামর্শ দেওয়ার কালও উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ক্ষতি যা ঘটার তা ঘটেছে।"

মলী সেন আহত হলেন।

কথা বলার ভঙ্গিটা দেখ না একবার! ক্ষতি ছাড়া কারো কোনো ভালো করেন নি যেন তিনি কোনো দিন। শ্লেষের সঙ্গে বললেন, "মন্দ ছাড়া আমার কাছে তুমি আর কী আশা করো? কিন্তু জানো, এই মন্দ মলী সেনের জন্যেই

তোমাদের শচীন ব্যানার্জী একদিন আন্দামান বা জেলের হাত থেকে বেঁচেছে ?”

“সে কী ?”

“হ্যাঁ, সে মিশেছিল সন্ত্রাসবাদীদের দলে। বোমা তৈরী করে দেশ স্বাধীন করার মতলবে। সেখান থেকে তাঁকে সরিয়ে আনলে কে ? স্বদেশী ডাকাতিতে পুলিশের হাতে যে ধরা পড়ে নি, সে কার অনুগ্রহে ? খোঁজ রাখো তার ? একবার বরং তাকেই জিজ্ঞাসা করে দেখো।”

বিস্মিত সত্যসিন্ধু অনুরোধ করলেন, “সবটা খুলে বলো তো, শুনি।”

ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই,—

সেবার পূজার ছুটিতে কলকাতা থেকে শিলং যাচ্ছিলেন মলী সেন। স্বামী শিবনাথ সোজা দোকান থেকে স্টেশনে এসে ট্রেনে উঠবেন, কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে গাড়ি ফেল করলেন। রিজার্ভড-করা কম্পার্টমেণ্টে একা শুয়ে ঘুমুচ্ছিলেন মলী সেন। হঠাৎ পিস্তলের আওয়াজ ও যাত্রীদের আর্তনাদে জেগে উঠে দেখেন, গাড়ি নিশ্চল, বাইরে অন্ধকার এবং ভিতরে মানুষের অস্পষ্ট ছায়া।

আলোর সুইচ টিপতেই চোখে পড়ল, দরজার কাছে মেজেতে একটি যুবক। দীর্ঘ, বলিষ্ঠ দেহ। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে বার বার পড়ে যাচ্ছে। মলী সেনকে বলল,— “আপনি ভয় পাবেন না। আমরা টেররিস্ট। পাশের কামরায় মারোয়াড়ীর সঙ্গে হাজার কুড়ি টাকা আছে খবর

পেয়েছিলাম। অন্ধকারে ভুল করে আপনার গাড়িতে উঠে পড়েছি। আমার সঙ্গীরা শিকল টেনে পালিয়েছে। আমি তাড়াতাড়িতে গাড়ির জানালা দিয়ে লাফাতে গিয়ে পা ভেঙ্গে ফেলেছি। নড়তে পারছিনে। যাক, এক্ষুণি লোকজন এসে পড়বে। আশা করি, কাঁধে করেই বয়ে নিয়ে যাবে থানায়। পায়ে হেঁটে আর কষ্ট করতে হবে না।" বলে সে মৃদু হাস্যের চেষ্টা করল।

বিশিষ্ট চেহারার মতো কোনো কোনো মানুষের হাসিরও একটা আলাদা জাত আছে। অন্য আর পাঁচজনের চাইতে তা এতই স্বতন্ত্র যে, একবার দেখলেই তা ব্রোমাইড পেপারের গায়ে ফটোগ্রাফের রেখার মতো মনের ফলকে দাগ কেটে বসে। বিস্ময়ে হতবাক, ভীতি-বিহ্বল মলী সেনও তরুণ বিপ্লবীকে তার হাসি থেকেই চিনলেন।

মনে পড়ল, বছরখানেক আগে এক একজিবিশনের দরজায় মোটর থেকে নামতেই চাঁদার বাক্স এগিয়ে ধরেছিল একটি যুবক তাঁর সামনে। হাতের ব্যাগ খুলে একটা টাকা দিতে যাচ্ছিলেন। যুবকটি বাধা দিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, "মাত্র এক টাকা দিচ্ছেন যে? দশ টাকার নোট বের করুন।"

এ কী রকম চাঁদা সংগ্রহের রীতি রে বাপু। এ তো প্রার্থনা নয়, এ যে হুকুম!

কৌতুক বোধ করে মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি চাঁদা কুড়োতে এসেছেন, না, ইনকামট্যাক্স আদায় করতে এসেছেন?"

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে সহাস্যে জবাব দিল যুবক, "হ্যাঁ, ট্যাক্স বললেও ক্ষতি নেই। কন্‌শেন্স্‌ ট্যাক্স। যাদের শোষণ-করা-পয়সায় বড়মানুষি করে বেড়াচ্ছেন, সেই গরীবদের জন্যে মাঝে মাঝে কিছু দেওয়াকে দান ভেবে গর্ব বোধ করবেন না। বরং নিজেদেরই বিবেক শান্ত রাখার একটা সুযোগ পাচ্ছেন মনে করে কৃতজ্ঞ থাকবেন। এ তো ভিক্ষা দিচ্ছেন না ; প্রায়শ্চিত্ত করছেন।"

কথাগুলি শ্রুতিকটু। ভাষাটাও খুব রুচিকর নয়। কিন্তু প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে একজন অজ্ঞাতকুলশীল চাঁদাপ্রার্থীর সঙ্গে বাদ প্রতিবাদে ব্যাপৃত হতে যে-কোনো সম্ভ্রান্ত মহিলারই সম্মানে বাধে।

কোনো কথা না বলে মলী সেন অবজ্ঞার সঙ্গে একখানা নোট ফেলে দিলেন চাঁদার বাক্সে। ফুঃ। এমন কত দশ টাকা কত সময় এখানে ওখানে হারিয়ে যায় মলী সেনের।

চাঁদা যে নিল সে ক্রোধে ও বিরক্তিতে আরক্ত মলী সেনের মুখের পানে চেয়ে শুধু একটু হেসে বলল, "ধন্যবাদ।"

সে-হাসিতে না ছিল শ্লেষ, না ছিল অনুকম্পা, না ছিল অভিযোগ। সকাল বেলার শিশিরে ধোয়া প্রস্ফুটিত গন্ধরাজের শ্বেত পাপড়ির মতো সে-হাসিটি নির্মল। সন্ধ্যাবেলার নির্মেঘ আকাশের প্রথম তারাটির মতো স্নিগ্ধ।

মলী সেনের মন থেকে অনেক দিন তা মোছে নি।

ট্রেনের বাইরে রেলের লোকজনের ব্যস্ত-সমস্ত পদধ্বনি শোনা গেল। মুহূর্তে মন স্থির করলেন মলী সেন। ক্ষিপ্রহস্তে

শচীনের হাত থেকে একপাশে ছিটকে-পড়া রিভলভারটা গাড়ির জানালা দিয়ে সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বাইরে। নিজের বিছানার একটা কম্বল ও বালিশ তুলে নিয়ে দ্বিতীয় শয্যা রচনা করলেন ওদিককার বার্থে। বললেন,—"বাঁচতে চান তো, চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়ুন বিছানায়। আমি মলী সেন। মনে রাখবেন, আপনার নাম শিবনাথ। কলকাতায় পটলডাঙ্গায় বাড়ি, বড়বাজারে ব্যবসা। কেউ প্রশ্ন করলে বলবেন, স্ত্রী নিয়ে পূজোর ছুটিতে বেড়াতে যাচ্ছেন শিলং-এ। বাকীটা আমি সামলাব।"

কিন্তু উঠতে বললেই যদি ওঠা যেতো, তবে পালাতেই বা বাধা ছিল কী? নিজ চরণের অভদ্র আচরণে বিব্রত নকল শিবনাথ কোনোমতে মলী সেনের বাহুতে ভর দিয়ে নির্দিষ্ট বার্থে আশ্রয় নিলেন।

বাংলা ডিটেকটিভ উপন্যাসের অসম্ভব কাহিনীর মতো প্রায় অবিশ্বাস্য পরিবেষ্টনে সেই আকস্মিক যোগাযোগ স্মরণ করলে আজও তাঁরা দুজনেই বিস্মিত বোধ করেন।

হত্যার প্রতি একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা আছে প্রত্যেক নারীরই অন্তরে। তাঁদের কাছে রাজনৈতিক বিশেষণের দ্বারাই হত্যাকাণ্ড কৌলীন্য লাভ করে না। তাই পিস্তলতান্ত্রিক দেশোদ্ধারব্রতের নরঘাতন নিষ্ঠুরতা থেকে শচীনকে নিরস্ত করার নিরন্তর প্রয়াস করেন মলী সেন।

দিনের পর দিন তর্ক করেন, কলহ করেন। করেন অনুরোধ, অনুনয় ও অভিমান। প্রতিনিয়ত ঘর্ষণের দ্বারা

নাকি পাথরও ক্ষয় করা যায়, দেশসেবীর প্রতিজ্ঞা কোন ছার? ধীরে ধীরে কোন অদৃশ্য প্রক্রিয়ায় নিজের অলক্ষ্যে তার মতপরিবর্তন ঘটেছে, তা শচীন জানে না। মলী সেন জানেন।

অচিরেই বিপ্লববাদের নভোমণ্ডল থেকে খসে পড়ল একটি ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক। কিছু দিনের মধ্যেই সেই ক্ষীণদ্যুতি নক্ষত্র নতুন জন্ম নিয়ে নবরূপে দেখা দিল ক্ষুদ্র সুখ, দুঃখ, আশা, নিরাশায় ভরা বিচিত্র জীবনের অন্তহীন আকাশে শুক্লা চতুর্দশীর রাতে স্নিগ্ধ চন্দ্রমার মতো। অবশ্য বৈজ্ঞানিকেরা জানেন, চাঁদের আলো তার নিজের নয়। কোন সূর্য থেকে আলোক আহরণ করছেন শচীন সে-তথ্যও কি ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন আছে?

গভীর মনোযোগের সঙ্গে সমস্ত শুনলেন সত্যসিন্ধু। বললেন, "তোমার সাহস, তোমার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, তোমার সাফল্যের প্রশংসা করি। কিন্তু শচীনের ভালো করেছ, এ-কথা বলতে পারলে সুখী হতেম। খুনের আসামীকে জেলের চিকিৎসকেরা রোগে ওষুধ দিয়ে বাঁচায়, সুস্থ হলে ফাঁসিতে মরার জন্যে। সে-ডাক্তারেরা রোগীর সত্যিকার মিত্র কিনা সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।"

"মানে? তুমি কি আশঙ্কা কর—?" মলী সেনের কণ্ঠে উদ্বেগের আভাস।

"করি বললে অত্যুক্তি হবে, করিনে বললেও সত্যভাষণ হবে না। শচীন হচ্ছে সেই জাতের মানুষ, ইংরেজীতে যাকে

বলে ইম্পেচ্যুয়াস। এরা বুদ্ধি দিয়ে বাঁচে না, অনুভূতি দিয়ে বাঁচে। অতীতে তার সমস্ত অস্তিত্বকে জড়িয়ে ছিল উদগ্র স্বাধীনতার স্পৃহা। তাকে সে ছেড়েছে। বর্তমানে তার সমগ্র সত্তাকে আচ্ছন্ন করেছিলে তুমি। তাকে তুমি ছেড়েছ। ভবিষ্যতে তার আর অবলম্বন রইল কী? বাকী জীবন সে টিকে থাকবে হয়তো; বেঁচে থাকবে না নিশ্চয়।"

মলী সেন অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন, "তার কৃতকর্মের সমস্ত দায়িত্ব কি আমার? তার মূর্খতার শাস্তিও কি আমাকেই নিতে হবে? তোমাদের কি এই আইন-কানুন? এ যে দেখছি খাঁটি শিবঠাকুরের আপন দেশ! উঁহু, "প্লিড গিল্টী" বলে মার্সি পিটিশন পেশ করতে পারলেম না। তোমার ওকালতি সত্ত্বেও না।"

"দায়িত্ব তোমার খানিকটা আছে বৈ কি! দিনে দিনে প্রত্যাশা যদি জাগিয়ে থাক, তবে প্রত্যর্থীর প্রার্থনা দেখে আজ রাগ করলেই বা চলবে কেন? কিন্তু মলী, তর্ক করে তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। এবার আমি চলি, তোমারও অভিনয়ের জন্যে ড্রেস করা দরকার।"

আসন ছেড়ে উঠতে উঠতে ঈষৎ হাস্য করে বললেন, "কেন জানিনে, এখনও তোমার ভালো মন্দ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে পারিনে। বুঝেছি, ক্ষয়রোগের মতো হৃদয়রোগের ব্যাসিলিও বড় মারাত্মক। একবার ধরলে আর কিছুতেই ছাড়তে চায় না। তোমার কল্যাণ কামনা করি বলেই

আমি চাই, শাস্তি তুমি নাও। অন্য কারো হাত থেকে নয়, তোমার নিজের বিবেকের কাছ থেকে পরের বেদনা আর বাড়িও না।”

সত্যসিন্ধুর কণ্ঠের ব্যাকুলতা মলী সেনের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। কিন্তু তার শেষ উক্তিটি শোনামাত্রই আবার তাঁর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। ওঃ, পরের ব্যথার জন্যেই যত দুর্ভাবনা! তা'হলে দূর সম্পর্কের বোনের জন্যেই আসল দরদ!

উদ্যতরোষ ফণিনীর মতো গ্রীবা উন্নত করে মলী সেন সদর্পে ঘোষণা করলেন,—“জানি, তুমি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। তাই আমিও তোমাকে বলছি, নীতিকথার সুধাপান করে তৃষ্ণা মেটানো আমার ধাতে নেই। স্বামীর ভালোবাসা পাই নি বলেই সংসারে আর কোনো কিছুতেই আমার অধিকার নেই, এ-অনুশাসন আমি মানিনে। আমি জানি, সৃষ্টির আদি থেকে যে-নিয়মে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলে আসছে, সে হচ্ছে যোগ্যতমের জয়,—সারভাইভ্যাল অব দি ফিটেস্ট। জগতে সর্বত্র যদি প্রতিযোগিতা চলে, তবে শুধু প্রেমের ক্ষেত্রেই তা নিন্দনীয় হবে কেন? আর মাঠে খেলতে নামলে মাঝে মাঝে আঘাত দেওয়া ও আঘাত নেওয়ার আশঙ্কা তো রয়েছেই। তা নিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলা নির্বুদ্ধিতা। না, সিন্ধু, কোথায় কোন অনূঢ়া কন্যার বর জোটাতে বিঘ্ন হচ্ছে, কোন কুরূপা নার্সের বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে, কোন কাণ্ডজ্ঞানহীন যুবকের স্বপ্নভঙ্গ ঘটছে, বা কোন বিধবা জননীর দুঃখ পাওয়ার সম্ভাবনা

আছে, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আমি আমার নিজের প্রাপ্য ছাড়ব না।"

গভীর সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে সত্যসিন্ধু উত্তর করলেন, "সংসারে যা পেতে চাই তাই যে প্রাপ্য নয়, সে-কথা জানার দিন তোমার আজও আসে নি। খেলার উপমা দিয়েছ তুমি? কিন্তু ভুলে গিয়েছ যে, তাতেও রুলস্ অব দি গেম বলে একটা কথা আছে। অফসাইড থেকে গোল দেওয়া তো গ্রাহ্য নয়। দোহাই তোমার, মলী, আত্মপ্রতারণা দ্বারা নিজকে কেবলি নষ্ট করো না। হৃদয় নিয়ে হৃদয়হীনতা দ্বারা নিজের বিড়ম্বিত জীবনের ব্যর্থতাকে আর গভীর করে তুলো না।"

গান সাঙ্গ হলেও থাকে সুরের রেশ। ঝড় থেমে যাওয়ার পরেও কাঁপে নদীর ঢেউ। তর্কেরও সমাপ্তি ঘটে না বাকরোধ মাত্র। কথা যখন থাকে না মুখে, ব্যথা জেগে রয় বুকে। তাতে চিত্তবিক্ষেপ ঘটে, কাজে মনোনিবেশ অসম্ভব হয়।

ঘড়ির ধাবমান কাঁটার পানে তাকিয়ে মলী সেন শঙ্কিত হলেন। পটোত্তোলনের লগ্ন এগিয়ে আসছে মিনিটে মিনিটে। দ্রুত প্রসাধন সমাপনের চেষ্টা করলেন। কিন্তু বারে বারে ববিনের সুতো ছিঁড়ে-যাওয়া সেলাইকলের মতো

কেবলই থামতে হলো তাঁকে। ক্ষণে ক্ষণে হাত অচল হতে লাগল। আসন্ন অভিনয়ের কথা বিস্মৃত হয়ে মনে মনে পর্যালোচনা করতে লাগলেন কাণ্ডজ্ঞানহীন শচীনের নির্বুদ্ধিতা, নীতিবাগীশ সত্যসিন্ধুর সুনীতি-সন্দর্ভ। বিরক্তি বোধ করলেন।

জগতে প্রত্যেক মানুষের বিবেকেই আছে একটি ফুলবেঞ্চ। নিজের বিরুদ্ধে নিজেরই মামলা চলছে সেখানে অহর্নিশ। তাতে আপনাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে না পারা পর্যন্ত মনে শান্তি থাকে না। মলী সেন ভার্সাস মলী সেনের কেসে নিজেই নিজের ব্রীফ নিয়ে মনে মনে সওয়াল সুরু করলেন মলী সেন।

ন্যায়তঃ, স্বভাবতঃ চিরাচরিত নিয়মেই তাঁর যা পাওনা, সংসার কি তা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করে নি? প্রচণ্ড অন্যায়ের নির্দয় পীড়নে যারা নিপীড়িত, নিষ্পেষিত, তাদের সামান্য বিচ্যুতির বেলায়ই বুঝি দেখা দেয় যত কপিবুকের বচন? হুঃ, রুলস্ অব দি গেম। মাই ফুট! অপরিসীম অবজ্ঞায় ওষ্ঠাধর বিকৃত করলেন মলী সেন।

হৃদয় নিয়ে হৃদয়হীনতা! ভাষার গাঁথুনি আছে বটে। কিন্তু এপিগ্রাম দিয়ে তো বাস্তব ঘটনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পরের ব্যথার কথা ভাবতে হবে তাঁকে। কেন? কিসের জন্যে? তাঁর ব্যথার কথা কে বুঝেছে? তাঁর হৃদয়ের খোঁজ রেখেছে কেউ?

মনে পড়ল সুধাংশুকে। মনে পড়ল আট বছর আগেকার একটি চরম শোকাবহ সন্ধ্যা। কালের অনন্ত লিপিতে বিদীর্ণ হৃদয়-বেদনার একটি সকরুণ স্বাক্ষর।

সেও ছিল ঠিক এমনি একটা বন্ধু-বান্ধবীর সম্মিলিত উৎসবের উপলক্ষ। মলী সেনের দলের প্রায় জন কুড়ি-পঁচিশ স্ত্রী-পুরুষে মিলে খড়দায় গঙ্গার ধারে এক বাগানে পিকনিকের আয়োজন। প্রত্যূষে মোটরযোগে গমন, সারাদিন অবস্থান, খাওয়া-দাওয়া, খেলাধুলা ও গান-বাজনার পরে—সন্ধ্যায় কলকাতায় প্রত্যাগমন,—এই ছিল পরিকল্পনা। ব্যবস্থা যা কিছু, মলী সেনকেই করতে হয়। তাঁর মত নিখুঁত ভাবে সব কিছু করার ক্ষমতা আছে কার? স্থান নির্বাচন করে বাগানের মালিকের অনুমতি সংগ্রহ যেমন করেন তিনি, তেমনি খাওয়ার মেনু তৈরী এবং রান্নার সাজ-সরঞ্জামও যোগাড় করেন তিনিই। কেক কেনা থেকে গাড়িতে পেট্রোল নেওয়া পর্যন্ত সমস্তই তাঁর তদারকে।

প্রশংসনীয় নিপুণতায় পরবর্তী দিনের সমুদয় আয়োজন সমাধা করে সন্ধ্যাবেলা নিজের ঘরে আধশোয়াভাবে একটু বিশ্রাম করছিলেন মলী সেন। সুধাংশুর প্রতীক্ষায় ছিলেন। কাল কোন শাড়িটা পরা যায়, কোন গানটা গাওয়া যায় তার পরামর্শ করবেন। সুধাংশুর রুচি ও বুদ্ধির উপরে মলী সেনের অগাধ বিশ্বাস। তাঁকে না হলে মলী সেনের কোনো কাজই হয় না। কিন্তু সে আজ এত দেরী করছে কেন? দাঁড়াও, আসুক একবার আজ, খুব কষে বকুনি দিতে হবে।

কিন্তু বিলম্ব ক্রোধের গণ্ডি ছাড়িয়ে প্রায় উৎকণ্ঠার কোঠায় না পৌঁছা অবধি সুধাংশুর আর দেখা পাওয়া গেল না। ঘরে ঢুকতেই মলী সেন প্রশ্ন করলেন, "তোমার

হয়েছে কী? এমন দুর্ঘট হয়ে উঠেছ কেন? সারাদিন ছিলে কোথায়?"

সুধাংশু জবাব দিল, "এখানে, ওখানে, চেম্বারে।"

"বল কী! প্র্যাক্‌টিসে তোমার এত মনোযোগ হলো কবে থেকে? কলকাতা শহরের সমস্ত লোক কি আজকাল দাঁত তোলাতে তোমার চেম্বারেই এসে হাঁ করে বসে থাকে নাকি?"

"না; কিন্তু তাদের জন্যে আমাকে তো হাঁ করে বসে থাকতে হয়।"

সুধাংশুর আহত কণ্ঠস্বর মলী সেনকে আঘাত করল।

সুধাংশুর রোগীর সংখ্যা নগণ্য। তাঁর সেই অসাফল্যের প্রতি অতর্কিত ইঙ্গিত ছিল মলী সেনের প্রশ্নে, সে-কথা হৃদয়ঙ্গম করে তিনি অনুতপ্ত হলেন। স্নিগ্ধ হাস্যে বললেন, "আমি ঠাট্টা করছিলেম। ও কী, মুখ ভার করে রইলে যে? কী ছেলেমানুষ তুমি। একটুও সেন্স অব হিউমার নেই! আচ্ছা, আমার অপরাধ হয়েছে। মাপ চাইছি। নাও এখন ঐ ইজিচেয়ারটা টেনে বোসো দিকিন। অনেক কথা আছে। দাঁড়াও, বেয়ারাটাকে একটু কফি দিতে বলি। এই বয়, সাবকোবাস্তে—খাবে না? কফিতে তোমার অরুচি? ব্যাপার কী বলো তো?"

সুধাংশু বলল, "কিছু না।"

মলী সেন মাথা নেড়ে বললেন, "না সুধাংশু, 'কিছু না' বললেই শুনব না। আমি বেশ বুঝতে পারছি, কোথায় কী

একটা ঘটেছে। তুমি যেন কেবলই আলগা হয়ে যাচ্ছ। আমি দেখছি, কালকের পিক্‌নিকে তোমার এতটুকু আগ্রহ নেই। দু'হপ্তা ধরে এর উদ্যোগ আয়োজনে তুমি কখনও মন খুলে যোগ দাও নি।"

সুধাংশু বলল, "তুমি অনেক খেটেছ। তাড়াতাড়ি শুয়ে ঘুমোও, নইলে কাল ক্লান্ত লাগবে।"

মলী সেন উঠে দাঁড়িয়ে সুধাংশুর পথ রোধ করে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, "অমন ভাবে কথা চাপা দিলে চলবে না। না বলে এখান থেকে তুমি এক পা নড়তে পাবে না। আমাকে তুমি ভালো করেই জানো। আমাকে চটিও না। এক্ষুণি আমি সবাইকে টেলীফোন করে কালকের পিক্‌নিক বন্ধ করে দেব।"

"তা তুমি পারো। কিন্তু সে পাগলামী করো না। বলার মতো বিশেষ কিছুই নেই। শুধু আমার ভালো লাগে না, এই।"

"ভালো লাগে না? কী ভালো লাগে না?"

"এই পিক্‌নিক।"

মলী সেন বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "ভালো লাগে না! এক সময়ে তোমারই তো উৎসাহ ছিল সব চেয়ে বেশী। গত বছর বটানিক্‌সে যাওয়ার উদ্যোগী তো ছিলে তুমিই।"

"ঠিক কথা। গোড়াতে বরং তোমারই আপত্তি ছিল। সে সব আমি ভুলি নি, বউদি। কিন্তু আজ আর আমার এতে মন নেই। শুধু এই পিক্‌নিক নয়, আমাদের কক্‌টেলের

পার্টি, গানের জলসা, আমাদের এই সোসাইটি, আমাদের এই জীবন-যাত্রা, কোনো কিছুই আমার ভালো লাগছে না।"

মলী সেন ক্ষণকাল চিন্তা করে বললেন, "তোমার ভালো লাগে না, সে-কথা তুমি আমাকে আগে বলো নি কেন? আমি কালকের আয়োজন নাকচ করে দিতেম। তোমাকে বাদ দিয়ে আমি কোনোদিন কিছুতে হাত দিয়েছি? তোমার ভালো লাগে না এমন কিছু কখনও করেছি?"

"ঠিক সে কারণেই বলি নি। আমি ভেবেছি, আমার ভালো লাগছে না বলেই তো জিনিষটা মন্দ নয়। তুমি যদি ওতে আনন্দ পাও, তবে ক্ষতি কী? তা ছাড়া, ভেবেছি, ঘরে তুমি ইদানীং খুব বেশী অশান্তি ভোগ করছ। বাইরে হয় তো তুমি এ-সব নিয়ে কিছুটা ভুলে থাকতে পারবে।"

"এখন বুঝেছি, কেন তোমাকে একদিনও এই পিক্‌নিকের পরামর্শে পাওয়া যায় নি, কেন তুমি আমাকে এড়িয়ে চলেছ।"

"এড়িয়ে চলেছি—এ-কথা ঠিক নয়। কিছু দিন আমাকে খুব ঘোরাঘুরিও করতে হয়েছে, একেবারেই সময় পাই নি।"

"কেন?"

"ফ্ল্যাট খুঁজে বেড়িয়েছি।"

"ফ্ল্যাট? কার জন্যে?"

"নিজের জন্যে।"

"কেন, হোটেল দোষ করল কী?"

"দোষ কিছু নয়, হোটেলে অনেকগুলো টাকা দিতে হয়।"

"টাকা বাঁচাবার জন্যে তুমি হোটেল ছেড়ে ফ্ল্যাটে থাকতে চাইছ ?"

"হ্যাঁ, তা ছাড়া—"

মলী সেন বাধা দিয়ে বললেন, "মিথ্যে কথা, তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছ। বলো, সত্যি কি না।"

বিস্মিত কণ্ঠে সুধাংশু বলল, "হ্যাঁ সত্যি, কিন্তু তুমি জানলে কেমন করে ?"

"হোটেলের চাইতে ফ্ল্যাট নিয়ে থাকা সস্তা, এ-কথা আর যাকেই হোক মেয়েদের কাছে বলতে যেও না। আর আমার জানার কথা বলছ ? আমি যে ইদানীং সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি সে-খবরই বা তুমি পেলে কেমন করে ? কিন্তু তুমি বিয়ে করবে সে-সংবাদ আমার কাছে লুকোতে এত মিথ্যে কাহিনীও বানাতে হলো ! ছিঃ !"

দৃঢ়তার সঙ্গে সুধাংশু বলল, "মিথ্যে আমি বলি নি। ফ্ল্যাটের নাম শুনলেই তোমরা লাউডন স্ট্রীট বা রাজা সন্তোষ রোডের কথা ভাবো। বালীগঞ্জ, কালীঘাট অঞ্চলে অল্প আয়ের গৃহস্থের উপযোগী ফ্ল্যাটও যে আছে, তার খবর রাখ না। আর লুকোবার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তুমি পিক্‌নিকের ব্যবস্থা নিয়ে ব্যস্ত ছিলে। ভেবেছিলেম এ ঝামেলা কেটে গেলে তোমাকে বিস্তারিত বলব। তার আর সুযোগ হলো না।"

"তা যাকগে। ভাগ্যবতীটি কে ? আমাদের লুসী মিত্তির নয় তো ?"

"না, আমার দিদির এক বিধবা ননদের মেয়ে। আমার মায়ের মনোনীত পাত্রী।"

"বেশ, বেশ। মস্ত সুখবর। কন্‌গ্র্যাচুলেশানস্‌।" বলে মলী সেন বিলাতী কায়দায় হাত বাড়িয়ে দিলেন সুধাংশুর পানে।

শুভ বিবাহের সংবাদ অবশ্যই সুসংবাদ। কিন্তু মলী সেনের ভাষাটা যতই শ্রুতিমধুর হোক না কেন, তাঁর কণ্ঠে যেন সজীবতার তেমন আভাস পাওয়া গেল না। দেবরের বিয়ের সুখবরটা ভ্রাতৃজায়ার মনে যে অপরিমিত সুখের সঞ্চার করেছে, এমন নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া গেল না।

সুধাংশু শেকহ্যাণ্ড না করে নিজেই দুই হাতের মধ্যে মলী সেনের দক্ষিণ হস্তটি গ্রহণ করল। গভীর আন্তরিকতার সুরে বলল, "বউদি, বিয়েতে তুমি উপস্থিত না থাকলে কিন্তু চলবে না। পাড়াগাঁ বলে যে যেতে চাইবে না—"

"বিয়ে স্থির করা যদি আমাকে বাদ দিয়ে চলতে পারে তবে শুধু মন্ত্র পড়াটা আমার অনুপস্থিতির জন্যেই ঠেকবে না, আশা করি।"

মলী সেনের কণ্ঠে শ্লেষ ও উত্তাপ সুধাংশুর মনোযোগ এড়াল না। সে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করল, "বউদি, তুমি অসন্তুষ্ট হয়েছ? আমার কি কোনো অপরাধ ঘটেছে?"

মুহূর্তে আত্মসংবরণ করে মলী সেন বললেন, "না, কিছুমাত্র নয়। কে বললে তোমাকে আমি অসন্তুষ্ট হয়েছি?

আমি খুশি হয়েছি—সত্যি, ভারি খুশি হয়েছি। বিলীভ মি। ঐ যা, আমার চোখে কী যেন একটা ঢুকেছে, বড্ড জ্বালা করছে। এক মিনিট বোসো তো, আমি বাথরুম থেকে চোখটা একবার ধুয়ে আসছি।”

মিনিট পাঁচ সাত পরে ফিরে এসে সহাস্যে বললেন, “তুমি তা হলে কাল আমাদের সঙ্গে পিক্‌নিকে যাচ্ছ না ?”

সুধাংশু বলল, “না, একজন বাড়িওয়ালার সঙ্গে কাল পাকা কথা হবে। সকালেই তার কাছে যেতে হবে।”

সুধাংশু প্রস্থানের উদ্যোগ করতেই মলী সেন বললেন, “ও কী, উঠছ যে ? এখনই রসন চৌকী বায়না করতে ছুটবে না কি ? এত তাড়া কিসের ? বিয়ের লগ্ন তো পার হয়ে যাচ্ছে না। একটু বোসোই না।”

সুধাংশু পুনরায় আসন গ্রহণ করে বলল, “আমার কোনো তাড়া নেই। কিন্তু তোমাকে তো কাল খুব সকালেই উঠতে হবে।”

মলী সেন সে-কথায় কান না দিয়ে বললেন, “সুধাংশু, আমাদের প্রথম সাক্ষাতের দিনটি তোমার মনে পড়ে ?”

“পড়ে বৈ কি। আমি প্যারিস থেকে দেশে ফিরেছি তার আগের দিন। এ-বাড়ির কর্ত্রী তোমার পিসশাশুড়ী আমাকে ছেলেবেলা থেকে স্নেহ করতেন। পরদিন এসে তাঁকে প্রণাম করতেই বউ দেখতে পাঠিয়ে দিলেন দোতলায়। শিবুদার বাবা অতিশয় গোঁড়া হিন্দু। সন্দেহ ছিল না যে,

বউ এনেছেন ভট্টপল্লী থেকেই। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে গেলেম।”

“কেন?” মলী সেন প্রশ্ন করলেন।

সুধাংশু বলল, “সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভাবছিলেম, দেখব, দেড় গজ ঘোমটায় মুখ চোখ ঢাকা সাহা বা মল্লিক কোম্পানীর লেস বসানো জবরজঙ্গ জামা জরিতে মোড়া একটি নির্বাক, নিশ্চল, জড় কাপড়ের পুঁটুলি। ও মা, তার বদলে কি না তুমি? একেবারে যেন আধুনিক কোনো লেখকের নবীনতম উপন্যাসের পাতা থেকে সদ্য নেমে এসেছে এক কন্যা। স্মার্ট, মডার্ন, প্রিটি।”

“কি ভাবলে?”

“ভাববার আর অবকাশ ছিল কোথায়? তুমি বসে উলের কী যেন একটা বুনছিলে। মুখ তুলে আমার পানে তাকাতেই নমস্কার করে বললেম, শিবুদার মা আমার মাসি হতেন। বড় ভাই-এর স্ত্রীদের এ পরিবারে বলে, বোঠান। বড়, মেজ, সেজ ইত্যাদি বিশেষণ যোগ করে তাঁদের সনাক্ত করা হয়। সে-রকম গুরুগম্ভীর প্রাচীন সম্বোধন আপনাকে ঠিক মানাবে না, যদি অনুমতি করেন, তবে শুধু বউদি বলেই ডাকব।”

“তার পর?”

“তুমি প্রতি-নমস্কার করে চৌকি এগিয়ে দিয়ে বললে, আমার কথা শোনা আছে তোমার। ভাবলেম, থাকবারই তো কথা। মানুষ থাকে এক জায়গায়, কিন্তু তার খ্যাতি

রটনা হয় সর্বত্র। বিশেষতঃ সেটা যদি অখ্যাতি হয়। কুশল বিনিময়ের পরে সহজভাবে বললে, বয়সে না হলেও সম্পর্কে তুমি বড়। তাই যদি আমার আপত্তি না থাকে তো আমার নাম ধরেই ডাকতে চাও। কথায় নেই অনাবশ্যক আড়ষ্টতা, আচরণে নেই কৃত্রিমতা। সহজ, শোভন, সহৃদয় ব্যবহার। বাঙ্গালী মেয়ে এমন হতে পারে, কল্পনা করি নি এর আগে। মোস্ট প্লেযেণ্ট সারপ্রাইজ!"

প্লেযেণ্ট সারপ্রাইজই বটে। শুধু সুধাংশুর পক্ষে নয়, মলী সেনেরও। দুই বৎসর ব্যাপী সুখহীন, আশাহীন, নিরানন্দ বিবাহিত জীবনের শ্বাসরোধকারী ক্লিষ্টতার মধ্যে এই প্রথম যেন অনুভব করলেন মৃদু স্নিগ্ধ বাতাসের সুকোমল স্পর্শ। রুদ্ধ গৃহের ঘন অন্ধকারে হঠাৎ মুক্ত ক্ষুদ্র বাতায়নপথে উন্মুক্ত স্বচ্ছ আকাশের ঈষৎ একটুখানি ইসারার মতো যেন মলী সেনের সামনে দেখা দিল সুধাংশু। লেডী ইন ডিসট্রেসের উদ্ধারার্থে নাইট এরাণ্ট।

বাঙ্গালী পরিবারে দেবর ভ্রাতৃবধূর সম্বন্ধটি প্রীতি ও পরিহাসের এক অপূর্ব সংমিশ্রণে মধুর। মনোভাবের ঐক্য এই দুটি সমবয়সী নরনারীর সেই স্বভাবতঃ সুন্দর সামাজিক সম্পর্ককে দু'দিনেই হৃদ্যতায় নিবিড় এবং নির্ভরতায় নিকটতর করে তুলল। সরস আলোচনা, অনাবিল কৌতুক, কপট কলহ ও অবিরত মান অভিমানের মধ্য দিয়ে তাঁদের সখ্য দুজনের জীবনকেই এক অনাস্বাদিতপূর্ব মাধুর্য দান করল।

যতদিন সংসারের কর্ত্রী শিবনাথের পিসীমা জীবিত

ছিলেন, ততদিন মলী সেনের পক্ষে বাড়ির বাইরে চলাফেরার অবাধ সুযোগ ছিল না। তাই তাঁর শাসন ফাঁকি দিতে এই দুই অপরিণত বয়স্ক অপরাধীকে প্রায়ই নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করতে হতো।

একদিন সকাল বেলা সুধাংশু এসে বলল, "পিসীমা, এবার আর ভাবনা নেই। তোমার বাতের ব্যামো একদিনে আরাম হয়ে যাবে। চৌরঙ্গীতে এক ফরাসী ভৈরবী এসেছেন, বিনিপয়সায় রাজ্যের সমস্ত রোগ সারিয়ে দিচ্ছেন। চল, আজ বিকেলেই তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছি।"

পিসীমা আশান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ফরাসী ভৈরবী, সে কি রে? ব্যাটাছেলে, না, মেয়েছেলে?"

"মেয়ে। মেম সন্ন্যাসী আর কি! একবার তাঁর পা দুটো জড়িয়ে ধরতে পারলে, প্রসন্না হয়ে কমণ্ডলু থেকে শেম্পেন দান করবেন। দু'ফোঁটা খেলেই আরোগ্য।" বলে মলী সেনের পানে চোখ টিপল।

পা জড়িয়ে ধরার প্রস্তাবটা পিসীমার কাছে খুব প্রীতিপ্রদ মনে হলো না। হাজার হোক মেম তো, মেলেচ্ছো। খিরিস্টান। হিন্দু হয়ে তিনি কেমন করে—।

কিন্তু এদিকে বাতের কষ্টটাও তো কম নয়। তাই আসল কথাটা গোপন করে বললেন, "আমি গিয়ে আর কী করব বল? কথা তো বুঝব না। তুই নিজেই আমার হয়ে আম্পেন না কাম্পেন—কি বললি, তাই খানিকটা নিয়ে আসিস।"

সুধাংশু বিস্ময়ের ভান করে বলল, "ওঃ, তাই তো। তুমি যে ফরাসী জানো না, সে তো আমার মনেই ছিল না। কিন্তু ভৈরবী তো পুরুষ মানুষের সামনে বেরোন না। মেম হলে কী হয়, মাথায় ইয়া লম্বা জটাজাল। পুরুষমানুষ কখনও কেউ সামনে এসেছে কি অমনি তা দিয়ে মুখ ঢেকে দেন। না, তোমার বাত তা হলে দেখছি আর সারানো গেল না।"

পিসীমা ব্যাকুল হয়ে বললেন, "না বাবা, এমন সুযোগ হাতে পেয়ে ছাড়তে নেই।" মলী সেনের পানে তাকিয়ে বললেন, "বউমা, তুমি বরং বিকেলে সুধাংশুর সঙ্গে যাও। আমার নাম করে ওষুধটা নিয়ে এসো। একটু ভক্তি করে ভৈরবীর পায়ের ধূলোটা নিও যেন।"

সন্ধ্যায় সিনেমা দেখে বাড়ি ফেরার পথে মলী সেন সুধাংশুকে মনে করিয়ে দেন, পিসীমার জন্যে ভৈরবীর ওষুধ বলে যা হোক কিছু একটা নিতে হবে যে। তাই তো! নিকটবর্তী ডাক্তারখানা থেকে এক টিন ক্রুসেনস্ সল্ট কিনে নেওয়া হয়।

আর এক দিন হয়তো বিলেতী ফুটবলের টীম এসেছে কলকাতায়। সুধাংশু দু'খানা টিকিট কিনেছে যথারীতি।

দুপুর বেলা পিসীমা পুরানো ন্যাকড়া ছিঁড়ে ছিঁড়ে একটা ওল্টানো হাঁড়ির ওপরে জল দিয়ে প্রদীপের সলতে তৈরী করছিলেন। সুধাংশু এসে বলল, "পিসীমা, আমার সেজ বোনের ভাসুরঝিকে আজ দেখতে আসবে বাদুড়বাগানে।

তোমাকে এক্ষুণি যেতে হবে। কনে সাজা আবলুসের মতো কালো মেয়ে, ঘষে মেজে চলনসই করে …লা, যার তার কর্ম নয়।"

প্রচ্ছন্ন প্রশংসায় পিসীমা মনে মনে খুশি হয়ে বললেন, "কিন্তু সন্ধ্যে বেলা আমার জপের সময় পার হয়ে যাবে যে। তার চাইতে বউমাকে বরং নিয়ে যা।"

মুখে চোখে গভীর হতাশার চিহ্ন ফুটিয়ে সুধাংশু বলল, "সে কি আর তোমার মতো পারবে? তবে তুমি যখন বলছো, অগত্যা।"

মলী সেন দরজার আড়ালে অপেক্ষা করছিলেন। পাছে আর অধিকক্ষণ হাস্য সংবরণ কঠিন হয়ে পড়ে, তাই সাবধান পদক্ষেপে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়েন।

গুরুজনদের মৃত্যুর পরে মলী সেন যখন নিজেই সংসারের কর্ত্রীপদে উন্নীত হলেন, তখন আর কোথাও কোনো বাধা রইল না। সপ্তাহে সাত দিনে সাতটা সিনেমা দেখা এবং একই দিনে দুপুরে রেসকোর্স, বিকেলে খেলার মাঠ, সন্ধ্যায় ক্লাব এবং রাত্রে ক্যাবারায় যাওয়ার দৃষ্টান্ত আছে ভূরি ভূরি।

শুধু আমোদ প্রমোদের ক্ষেত্রেই নয়, তাঁদের প্রায় সমস্ত কর্ম, কল্পনা, মন্ত্রণাই দুজনের সম্মিলিত সত্ত্বাকে কেন্দ্র করে। সুধাংশুর নেশা ডিটেকটিভ উপন্যাসে। তাই মলী সেন নাম জানেন আগাথা ক্রিস্টীর সর্বশেষ থ্রিলারের। মলী সেনের প্রিয়,—রবীন্দ্র সঙ্গীত। তাই সুধাংশু খবর রাখে কনক দাসের আধুনিকতম রেকর্ডের।

তরুণ বয়সের যে-সকল বৃহৎ পরিকল্পনা চিরকাল প্ল্যানের আকারেই শূন্যে মিলিয়ে যায়, কোনো দিনই বাস্তবে পরিণত হয় না, সেগুলিতেও দুজনেরই যথাযোগ্য স্থান নির্দিষ্ট থাকে। উদয়শঙ্করের নাচ দেখে এসে য়ুরোপে ড্যান্স ট্রুপ নিয়ে যাওয়ার যে-জল্পনা কল্পনা চলে তাতে ইম্প্রেসারিওর পদ মলী সেনের, ম্যানেজারের পদ সুধাংশুর। এমেরিকার 'লাইফ' কাগজের মতো বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশের যে প্ল্যান হয়, তাতে সম্পাদিকার নাম মলী সেন, প্রকাশক সুধাংশু।

এমনি করে কেটেছে সুদীর্ঘ সাত বৎসর। সাতটি বছর যেন সাত স্বর্গে রচা ছন্দোবদ্ধ কাব্যকাহিনীর মতো স্বপ্নময়। সাত লহরে গাঁথা রত্নখচিত চন্দ্রহারের মতো মহার্ঘ্য।

সমাজের যে-উর্ধ্ব বায়ুস্তরে তাঁদের বিহার, বৃহৎ কারেন্সী নোটের ঘন ঘন পক্ষ সঞ্চালন ব্যতীত সেখানে পৌঁছানো সম্ভব নয়। সুধাংশুর নিজস্ব উপার্জন পরিমিত। কিন্তু মলী সেনের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে সে-বিষয়ে তাঁকে সচেতন হতে হয় নি কোনোদিন। জন-হোয়াইটের জুতা, অস্টিন রিডের সার্ট, র‍্যাঙ্কিনের স্যুট ছাড়া সুধাংশুকে কখনও বড় দেখা যায় নি। প্রিয়জনের জন্যে ব্যয় করার যে-ব্যগ্রতা নারীহৃদয়ের স্বভাবিক ধর্ম, সুধাংশুকে দিয়ে তা চরিতার্থের সুযোগ পেয়ে আনন্দ লাভ করেছেন মলী সেন। শিবনাথের বিরুদ্ধে মলী সেনের আর যাই কেন না অভিযোগ থাক, সত্যের খাতিরে স্বীকার

করতে হয়, স্ত্রীর যদৃচ্ছা টাকা খরচ নিয়ে কোনোদিন কোনো প্রশ্ন ওঠে নি।

বিগত দিনের সেই স্মৃতির ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে খণ্ড খণ্ড বহু সুখের ইতিহাস মলী সেন সুধাংশুর সঙ্গে আলোচনা করলেন। তাঁর আসন্ন বিবাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে নানাবিধ উপদেশ দিলেন। তাঁর ভাবী পত্নীকে নিয়ে দু'চারটে প্রচলিত পরিহাসও করলেন সকৌতুকে। তারপর সুধাংশু প্রস্থান করতেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে শয্যায় উপুড় হয়ে এলিয়ে পড়লেন। বক্ষের সমস্ত শক্তি দ্বারা এতক্ষণ রক্তহীন মুখমণ্ডলে যে-বিশুষ্ক হাসির রেখাটি ফুটিয়ে রেখেছিলেন, তা নিমিষে মিলিয়ে গেল। দাঁত দিয়ে ওষ্ঠাধর সবলে চেপে উদ্গত কান্নার বেগ রোধ করতে চেষ্টা করলেন।

বাতাসে অক্সিজেন যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ তার কথা কারো মনেই থাকে না। তার ব্যত্যয় ঘটা মাত্রই শ্বাসযন্ত্রে গোলযোগের ফলে মুহূর্ত মধ্যে সে-অভাব সম্পর্কে সচেতন হতে হয়। এতকাল সুধাংশুর উপরে মলী সেনের দখল ছিল প্রকৃতির আলো হাওয়ার মতোই স্বতঃসিদ্ধ। তাই তার অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি কিছুমাত্র সজাগ ছিলেন না। এখন সে-অধিকার ত্যাগের প্রশ্ন দেখা দিতেই সজোরে টান লাগল ঘরে নয়, বাইরে নয়,—একেবারে তাঁর বেদনা-ভারাক্রান্ত হৃদয়ের মাঝখানটিতে। সমস্ত জগতটাকে স্বার্থে ক্রূর ও প্রবঞ্চনায় কুৎসিত মনে হলো।

তবুও একবার স্থির চিত্তে নিরপেক্ষ বিচার করতে চেষ্টা

করলেন মলী সেন। হয়তো সুধাংশুর কথাই ঠিক। পুরুষ মানুষ বিরাট মহীরুহের মতো আপন কাণ্ডের উপর আপনি দাঁড়িয়ে থাকতে চায় সমুন্নত। দড়ি দিয়ে ঝোলানো অর্কিডের মতো পরাশ্রয়ী সৌখীন অস্তিত্ব তার পক্ষে মৃত্যুর অধিক। সে হবে গৃহের প্রধান, নারীর নাথ ও সন্তানের জনক। শুধু পরনারীর সখীত্ব নিয়ে তার সারা জীবন কাটানো চলে না।

দিন কয়েক আগে জরুরী কাজে সুধাংশুকে যেতে হয়েছিল তাঁর দিদির বাড়িতে। মফঃস্বল শহরে।

ভগ্নীপতি স্কুল মাস্টার। সামান্য বেতন। তাই দু'বেলা দুটি ছাত্র পড়াতে যান। বোন দুপুরে সাবুর পাঁপড় তৈরী করে বিক্রি করেন কো-অপারেটিভ স্টোরে। উঠনের একপাশে স্বামী যে বেগুন ও পালং শাকের বাগান করেছেন, বিকেলে ছোট ঘট থেকে জল সেচন করেন তাতে। সন্ধ্যা বেলা স্বামী যখন হাত মুখ ধুয়ে সামান্য জলযোগের পর শিশু দুটিকে খেলা দেন, স্ত্রী অদূরে মাদুরে বসে কাঁথা সেলাই করেন। দুজনে সংসারের সুখ-দুঃখের গল্প করেন।

সুধাংশু তাঁদের দেখে যেন প্রথম জানল, জীবনের সত্যিকার তাৎপর্য। বুঝল কত অর্থহীন সংসারে তার নিজের বর্তমান অবস্থিতি। স্থির করল, আর নয়। সে তো হার্লে স্ট্রীটের স্পেশিয়েলিস্ট নয়; সামান্য দাঁতের ডাক্তার। নিজের অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকের ঊর্ধ্বে বৃহৎ আড়ম্বর বা আকাশচুম্বী কল্পনা তার জন্যে নয়।

ভাবল, সারাদিন পরিশ্রম করে সে যা উপার্জন করবে তা দিয়ে সংসার চালাবে একটি সাধারণ কর্মপটু, সরল, স্নেহশীলা স্ত্রী! মানুষ করবে একটি দুটি সবল সুস্থ শিশু। কাজ কী তার বো-টাই আর শার্ক স্কীনের জ্যাকেটে? কী হবে তার লুসী মিত্তির, লিলি ঘোষ, এ্যানিটা সেন বা সোসাইটির ডায়না রায়কে নিয়ে?

শুনে মলী সেন চুপ করে রইলেন।

সুধাংশু যখন বলল, "বউদি, তোমার ভালোবাসার ঋণ আমি জীবনে ভুলব না। কিন্তু আমাকেও তো আমার আপন পূর্ণতা লাভ করতে হবে।"—তখনও মলী সেনের মুখে কথা যোগাল না।

সত্যি তো। মলী সেনের কাছে কতটুকু পাওয়ার আশা আছে সুধাংশুর? তাঁর ভাগ্যবঞ্চিত জীবনের শোকাবহ বিড়ম্বনার সঙ্গে জড়িয়ে নিজের জীবনকে সুধাংশু ব্যর্থ করবে কেন?

এ সমস্তই যুক্তির কথা! তাতে মাথা সাফ হয়, মন শান্ত হয় না। শিলাখণ্ডে বাধাপ্রাপ্ত পার্বত্য নদীর প্রবল জলস্রোতের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ বেদনায় কেবলি নিরন্তর ফুলে ফুলে ওঠে।

বালিশে মুখ ঢেকে আর্তস্বরে মলী সেন বললেন, "আমি একা, আমি শূন্য, আমি নিষ্ফল।" হৃদয়ের সমস্ত মাধুর্য কণ্ঠে ঢেলে দিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে বার বার ডাকতে লাগলেন, "সুধাংশু, সুধা, সু।"

পরদিন প্রভাতে দেখা গেল মলী সেনের অন্য মূর্তি।

পিক্‌নিকে তাঁর উৎসাহ, আনন্দ ও উচ্ছ্বাস যেন ক্ষীণমুখ ফোয়ারার জলের মতো ফিনকি দিয়ে উঠে ছড়িয়ে পড়তে লাগল চতুর্দিকে। পুকুরে সাঁতার কাটলেন, গাছের শাখায় দোলনা বেঁধে দোল খেলেন, গানের পরে গান গেয়ে সবাইকে মোহিত রাখলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মনের কোণে কোথাও কোনোখানে এক বিন্দু বেদনার লেশ আছে এমন আভাস পাওয়া গেল না। যেন এক রাত্রে আপনার পূর্ব জীবনকে জীর্ণ পট্টবাসের মতো পরিত্যাগ করে এসেছেন পশ্চাতে।

সেদিন থেকে মলী সেনের নব রূপান্তর। যে ছিল স্থিরজ্যোতি নক্ষত্র, সে হলো তীরগতি উল্কা। খরবেগে ছুটে চললেন লক্ষ্যহীন, মাত্রাহীন নিরুদ্দেশ যাত্রায়। শুধু আলো নিয়ে নয়,—জ্বালা নিয়ে।

সে আজিকে হলো কত কাল; তবু মনে হয় যেন সেদিন সকাল!

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মলী সেন পুনরায় আপন প্রসাধন কার্যে মনোনিবেশ করলেন।

মেয়েদের জন্যে নির্দিষ্ট বৃহৎ সজ্জাকক্ষটির পাশ দিয়ে বোধ করি বিশেষ কোনো একজনের সন্ধানেই যাচ্ছিলেন নীরজা।

ব্যস্ত পদে মান্নামাসি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "নীরু, গৌরীকে দেখেছ কি এদিকে ?"

নীরজা উত্তর করলেন, "কৈ, না তো।"

"হতভাগা মেয়ে গেল কোথায় ? নাঃ, আমি আর পেরে উঠছিনে।" মান্নামাসির কণ্ঠে বিরক্তি ও হতাশার সংমিশ্রণ।

বিস্ময়াবিষ্ট নীরজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন, ব্যাপার কি, মান্নামাসি ?"

"আর বলো কেন ভাই। সকাল থেকে পই পই করে মেয়েকে বললেম, স্টেজে নিখিলের সঙ্গে সঙ্গে থেকে তাঁর কাজে একটু সাহায্য করতে। কে শোনে সে-কথা ! মেয়ে কোথায় বসে আছেন তার ঠিকানা নেই। এই মেয়ে নিয়ে আমার হয়েছে মরণ।"

"না, মান্নামাসি, গৌরীর মতো এমন ভালো মেয়েকে আপনি অমন করে বলবেন না।"

মেয়ের প্রশংসায় মা মনে মনে যথেষ্ট প্রীত হলেন। কিন্তু মুখে প্রতিবাদের ভাব ফুটিয়ে বললেন, "তোমরা তো বলো, ভালো। নিজের ইষ্ট-অনিষ্ট বোধ যার নেই তার আবার ভালো কী ?"

উত্তরে নীরজা কিছু বলার চেষ্টা করতেই তাঁকে বাধা দিয়ে পরিবর্তিত স্বরে বললেন, "বুঝেছি, তুমি কী বলবে। সত্যি কিছু বোকা সে নয়। সে কি আর আমি জানিনে ? নিজের মেয়ের কথা নিজে বলতে নেই। নইলে দেখতে,

শুনতে, স্বভাবে, বুদ্ধিতে এমন মেয়ে আর ক'টি আছে আমাদের চেনা-জানার মধ্যে? জাঁক করছিনে। কিন্তু শিখিয়ে-পড়িয়ে মেয়েকে সবার প্রশংসার যোগ্য করে গড়ে তোলা যে কতখানি শক্ত ব্যাপার সে যে করেছে সে-ই শুধু জানে।"

নীরজা বিনা প্রতিবাদে মান্নামাসির কৃতিত্ব স্বীকার করলেন।

খুশি হয়ে মান্নামাসি বললেন, "মেয়ের সব ভালো। কিন্তু বড্ড বেশী লাজুক। আজকালকার ছেলেদের কী ধারা জানো তো? গুরুজনদের ঠিক করা সম্বন্ধে বিয়ে করবে, এমন পাত্রই নয়। এরা নিজেরা দেখবে, মিশবে, পছন্দ করবে, তবে তো বিয়ে। অমনি কি আর তাদের চোখে পড়া যায়? এখনকার দিনে মেয়েদের কি একটু ফরোয়ার্ড না হলে চলে?"

ফরোয়ার্ড! যাক, ইংরেজী করে কথাটাকে তবু কিছুটা ভদ্র করা হয়েছে। তা না হলে আসলে ব্যাপারটা তো গায়ে-পড়া-ভাব। চলতি বাংলায় যাকে বলে বেহায়াপনা।

নীরজা মনে মনে সঙ্কুচিত হলেন। ছিঃ ছিঃ। মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলেই কি তাদের মান-সম্ভ্রম বোধটুকুও থাকতে নেই?

দুঃখও বোধ করলেন। মেয়ের জন্যে নয়। মেয়ের মায়ের জন্যে। হায়, মান্নামাসি! তিনি তো জানেন না, গৌরীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে কার সঙ্গে! কত শক্তিশালী তার প্রতিপক্ষ! তিনি তো জানেন না যে, এ-কালে যুদ্ধজয়

সাহসের দ্বারা হয় না, সামর্থ্যের দ্বারা হয়। বোঝেন না যে, এ-যুগে আর্মির চাইতে আর্মামেণ্টের প্রয়োজন বেশী। বেচারা গৌরী। মায়ের তাড়নায় যতই কেননা সে ফরোয়ার্ড হোক, তার সাফল্যের আশা কোথায়? মাজল্ লোডার দিয়ে কি শার্মেন ট্যাঙ্কের সঙ্গে লড়াই করা চলে?

আপন মনোভাব গোপন করে কিছুটা পরিহাসের ভঙ্গিতে নীরজা বললেন, "কিন্তু মান্নামাসি, গৌরীকে না দেখতে পেয়ে আপনি এত উতলা হচ্ছেন কেন? এত রাত্রেই তা'কে ফরোয়ার্ড মার্চ করতে হবে না কি?"

মান্নামাসি হেসে বললেন, "এখন খুব ঠাট্টা করে নিচ্ছ। তা নাও। মেয়ের বিয়ের দুর্ভাবনা তো টের পাও নি। বিয়ে-থা হোক, ঘর-সংসার করো, তখন বুঝবে বয়স্থা মেয়ে সৎপাত্রে না দিতে পারা পর্যন্ত মায়েদের কেন মুখে ভাত রোচে না, চোখে ঘুম আসে না।"

নীরজা সহানুভূতির স্বরে বললেন, "না মান্নামাসি, আপনি মিছে এত ভাববেন না। গৌরীর মতো এমন লক্ষ্মীমেয়ের ভালো বর জুটবে না তো জুটবে কার?"

"না, মা, সে-ভরসা নিয়ে তো চুপ করে বসে থাকা যায় না। একে তো ছাই পোড়া দেশে সুপাত্রের সংখ্যাই কম, যদি বা একটি ভালো পাত্র পাওয়া গেল, তার পিছনে কী যে সাংঘাতিক শনির দৃষ্টি তা আমিই জানি। তুমি ছেলেমানুষ, এ-সব বুঝবে না।"

ছেলেমানুষ মনে মনে হাসলেন। ভাবলেন, উপমাটা

ঠিক হয় নি। শনি নয়,—রাহু! এ শুধু গ্রাস করতে জানে, পরিপাক করতে নয়। সে গ্রহণ করে না। গ্রহণ ঘটায়। তাতে পৃথিবীতে নামে অন্ধকার। কমল মলিন হয়, কুমুদ বিশীর্ণ।

স্বভাবতঃই অনূঢ়া কন্যার জননীরা পছন্দ করেন না স্বশ্রেণীর বিবাহযোগ্যা অন্য মেয়েদের। যেমন এক মোটর গাড়ির সেলস্‌ম্যানেরা সুচক্ষে দেখেন না অন্য কোম্পানীর গাড়িকে। বয়সের দিক দিয়ে নীরজা গৌরীর চাইতে অল্প কয়েক বছরের মাত্র বড়। সে-হিসাবে তাঁকে আপন কন্যার একজন সম্ভবপর প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞান করা মান্নামাসির পক্ষে অনুচিত হতো না। কিন্তু আর্থিক সচ্ছলতা, সামাজিক মর্যাদা বা দেহসৌষ্ঠব—এ তিনের কোনো দিক দিয়েই নীরজা কোনো দিন মান্নামাসির উদ্বেগের হেতু হন নি। তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন, সম্ভবপর পাত্রদের মনোযোগ থার্মোমিটারে নীরজার স্থান সাড়ে আটানব্বই ডিগ্রিরও অনেক নীচে। তাই নীরজার প্রতি তাঁর মনে কোনো বিরূপতা ছিল না। এমন কি, নিজের মনের সুখ-দুঃখের কথা নীরজার কাছে ব্যক্ত করতেও তাঁর কোনো দ্বিধা ছিল না।

সখেদে মান্নামাসি বললেন, "এ-সব কি আমার করার কাজ, না, আমার ভাববার কথা? এমন এক লোকের হাতে পড়েছিলেম যে, সারা জীবন কেবল কষ্ট পেয়েই গেলেম। বেঁচে থাকতে কোনো দিন কোনো কাজ তাঁকে দিয়ে হয় নি, মরেও আমার মাথায় দিয়ে গেছেন এই কন্যাদায়ের ভার।

সত্যি বলছি মা তোমাকে, বিয়ে হয় নি, তবুও আছ সুখে মনোমতো হাতে না পড়ার চাইতে চির জীবন আইবুড়ো থাকা বরং ভালো। তাতে এমন রাত্রি-দিন দগ্ধে দগ্ধে মরতে হয় না।"

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব রইলেন।

মান্নামাসি মনে মনে পর্যালোচনা করলেন আপন ভগ্ন আশা, তিক্ত স্মৃতি ও ব্যর্থ জীবন।

নীরজা স্মরণ করলেন আপন অপূর্ণ অতীত, অতৃপ্ত বর্তমান ও অনিয়ত ভবিষ্যৎ।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মান্নামাসি বললেন, "যাই, দেখিগে মেয়েটা কোথায় গেল।"

স্টেজে আলোকসম্পাত ও সমুদ্রদৃশ্যের বৈদ্যুতিক কৌশলগুলি সম্পর্কে শেষবারের মতো সহকর্মীদের নির্দেশ দিয়ে নিখিল অভিনয়ে নিজ বেশবিন্যাসের জন্যে আপন সজ্জাকক্ষের দিকে যাচ্ছিলেন। দূর থেকে নীরজাকে একা দেখতে পেয়ে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার হাতের জ্বালাটা কমেছে, নীরজা? আর রক্ত বেরুচ্ছে না তো?"

নীরজা সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললেন, "আমি আপনার খোঁজেই যাচ্ছিলেম। এই নিন।" নিজের হাতের ব্যাগটা

থেকে কী একটা ক্ষুদ্র জিনিষ বের করে নিখিলের হাতে দিতে গেলেন।

"কী? স্লিভ লিঙ্কস্! একটা কেন? ওঃ, তাই তো, আমার বাঁ আস্তিনে লিঙ্কস্ পরি নি দেখছি। আশ্চর্য, আমার তো খেয়ালই হয় নি। ছিল কোথায় এটা?"

"যেখানে বরাবর থাকে। আপনি এক হাতে পরেছেন, তাড়াতাড়িতে অন্য হাতে পরতে ভুলে গেছেন।"

"ঠিক। কিন্তু তুমি তো ভোলো নি। সত্যি নীরজা, তোমাকে যত দেখছি তত আমি অবাক হচ্ছি। রোগীর সেবা থেকে অসাবধানী লোকের তদারক পর্যন্ত সব কাজেই তুমি এক্সপার্ট। আমি যে তোমার কাছে কত কৃতজ্ঞ তা কথায় জানাতে—।"

"নার্সের কাজই তো লোকের পরিচর্যা করা। তা ঠিকমতো না করলে আপনি রাখবেন কেন? এর মধ্যে কৃতজ্ঞতার আছে কী, তা জানাবারই বা প্রয়োজন কোনখানে?"

রাগ হলো নীরজার। কৃতজ্ঞ! আহা, কৃতজ্ঞতা কুড়োবার জন্যে যেন তাঁর আর ঘুম হচ্ছিল না।

"নার্সের কাজ রোগীকে ওষুধ খাওয়ানো, আইসব্যাগ দেওয়া, টেম্পারেচার নেওয়া। সুস্থ লোকের জামায় বোতাম বসানো, চাবি খুঁজে দেওয়া, ধোপার কাপড় মিলিয়ে রাখা নার্সের ডিউটির মধ্যে নয় নিশ্চয়ই।" বলে সহাস্যে বাঁ হাতটি এগিয়ে দিলেন নীরজার দিকে।

নীরজা লিঙ্কস্‌টা জামার আস্তিনে পরিয়ে দিতে দিতে মনে মনে ভাবলেন, হুঁঃ, এমনি অন্ধই বটে! মুখে বললেন, "সে আর এমন বেশী কী? পিসীমার শুশ্রূষা করে হাতে অবসর যখন থাকে তখন আপনার দু'একটা বই গুছিয়ে দেওয়া বা ফুলদানীটা সাজিয়ে রাখাকে কিছু কাজ বলে না। আমি না করলে, অন্য কেউ করতো। পড়ে থাকতো না।"

"ঠিক জানিনে। হয়তো করতো, কিন্তু তোমার মতো নিখুঁত করে কেউ করতে পারতো না। আমার এক এক সময়ে মনে হয়, হাসপাতালের নার্স না হয়ে বাড়ির গিন্নী হলেই যেন তোমাকে মানাতো ভালো।"

কাণ্ডজ্ঞানহীন এঞ্জিনীয়র! কিছুমাত্র বোধ নেই, নিজের অজ্ঞাতে কার কোন সুতীব্র বেদনার তন্ত্রীতে কঠিন আঘাত করছেন তিনি!

কোনো দিকে দৃকপাত মাত্র না করে নিজের মন্তব্য প্রকাশ করেই চললেন, "সত্যি নীরজা, তুমি যার স্ত্রী হবে, সে ভাগ্যবান। কোনোদিন তার এতটুকু অসুবিধা হবে না। কিন্তু এই যে তুমি না চাইতেই হাতের কাছে দরকারী জিনিষটি এগিয়ে ধরছ, তাতে আমার অভ্যাস ক্রমেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ভয় হয়, শেষে যে-দিন তুমি চেলী পরে নিজের ঘর করতে যাবে, সে-দিন না আমি একেবারে অচল হয়ে পড়ি।"

কথা সমাপ্ত করে সরলচিত্ত বক্তা হাসতে লাগলেন।

কিন্তু তাঁর শ্রোত্রীটি দুই চক্ষে অগ্নি বর্ষণ করে কঠিন স্বরে

বললেন, "মিস্টার রয়, এমন ব্যঙ্গ করার দরকার কী? আমার আর কোথাও কোনো গতি নেই, আমাকেও আপনার আর পাঁচজন চাকর-দাসীর মতো আপনার এখানেই খেটে খেতে হবে, সে-কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যে তো পরিহাসের প্রয়োজন নেই। কেন আপনি আমাকে এমন অপমান করছেন?"

বিস্মিত নিখিলের মুখের হাসি নিমেষে অন্তর্হিত হলো। তিনি ক্ষুণ্ণ স্বরে বললেন, "অপমান করেছি? বলো কী, নীরজা! আমি তো কোনোদিন তোমাকে চাকর-দাসীদের মতো ভাবি নি।"

"ভেবেছেন। নিশ্চয় ভেবেছেন। ভাবলে দোষও নেই কিছু। চাকর নয়তো কী? আপনি মাইনে দেন, আমি কাজ করি! প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক ছাড়া আমাদের আর অন্য সম্বন্ধ আছে কী?"

"জানো, তুমি মাইনের কথা বললে আমি কত দুঃখিত হই? তুমি যে হাসপাতালে আমাকে যমের হাত থেকে ছিনিয়ে রেখেছিলে সে কি আমার মাইনের লোভে? টাকা দিয়ে কি আমি আমার সে-ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারব? ক'দিন থেকে আমি লক্ষ্য করছি, তুমি যেন কেবলই বিরক্ত হচ্ছ। আমি অন্যমনস্ক লোক, কাঠখোট্টা মানুষ। কথাবার্তাও সব সময়ে তোমাদের মতো তেমন গুছিয়ে বলতে পারিনে। তাই হয়তো আমার কোনো আচরণ বা কথায় তোমার মনে হয়েছে যে, আমি বুঝি টাকার মাপে তোমার

সেবার হিসাব করছি। বিশ্বাস করো নীরজা, তোমাকে অপমান করার কথা আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারিনে। তবুও না জেনে তোমার মনে যে ব্যথা দিয়েছি, তার জন্যে মাপ চাইছি। আমাকে ক্ষমা করো।" বলে নিখিল ধীরে ধীরে প্রস্থান করলেন।

নিখিলের মলিন মুখ, কাতর চাহনি ও শ্লথ গতি নীরজাকে তাঁর আপন অকারণ রূঢ়তার তীব্রতা সম্পর্কে সচেতন করল। নিখিলের বেদনার্ত কণ্ঠের সকরুণ ক্ষমাপ্রার্থনা মুহূর্তে তীক্ষ্ণফলক তীরের মতো নীরজার নিজেরই বুকে বিঁধল! তাঁর দুই চোখে অশ্রু সঞ্চারিত হলো।

হায়, এমন করে ক্ষণে ক্ষণে আপনাকে আপনি আর কত কাঁদাবে নীরজা, তা সে নিজেই ভেবে পায় না।

মলী সেনের সজ্জাকক্ষে একটি অপরিচিত মহিলার পদার্পণ ঘটল।

গ্রীষ্মের অপরাহ্ণে সূর্যাস্তের পরেও যেমন অনেকক্ষণ দিনের আলো বজায় থাকে, তেমনি এই অসাধারণ মহিলার দেহলাবণ্য যৌবনান্তেও তাঁর মুখমণ্ডলে এমন একটি কমনীয় দীপ্তি রক্ষা করেছে যে, হঠাৎ দেখলে তাঁকে প্রৌঢ়া মনে করা কঠিন।

বিধবার পরিধানে পরিচ্ছন্ন সাদা থান, গায়ে রাধাকৃষ্ণের নামাঙ্কিত বৃন্দাবনী সুতী চাদর। খালি পা। কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের সরু একটি মালা। পুরুষের মতো খাটো করে ছাঁটা মাথার কালো চুলে কোথাও একটু সাদার ছাপ লাগে নি। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুগঠিত কপালের ঠিক মাঝখানে উল্কিতে আঁকা একটি সরু তিলকচিহ্ন। যৌবনে মহিলা যে যথার্থ সুন্দরী ছিলেন, সে-কথা বুঝতে খুব বেশী দৃষ্টিশক্তির দরকার হয় না।

মলী সেন কিউটেক্সের শিশি থেকে তুলির সাহায্যে হাতের সুদৃশ্য অঙ্গুলির সযত্নেবর্ধিত নখগুলির রঞ্জনকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। চোখ তুলে তাকাতেই মহিলা বললেন, "আমি শচীনের মা।"

বলার প্রয়োজন ছিল না। মাতা ও পুত্রের মুখের সুস্পষ্ট সাদৃশ্য কারুরই দৃষ্টি এড়াবে এমন সম্ভাবনা নেই।

মলী সেন মনে মনে প্রসন্ন হলেন না। কী বিপদ! অভিনয় সুরু হওয়ার আর কতক্ষণই বা বাকী। প্রথম দৃশ্যেই তাঁর পার্ট। অথচ এখন পর্যন্ত সাজসজ্জা শেষ করতে পারলেন না। কেবলই ঘটছে নানা লোকের আনাগোনা। বারংবার ঘটছে চিত্তবিক্ষেপ ।

মনোভাব গোপন করে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন। বললেন, "আমার নাম,—মলী।"

শচীনের মা বললেন, "সে কী আর বলে দিতে হয়? তোমাকে এর আগে চোখে দেখি নি বটে, কিন্তু তোমার

বর্ণনা এত শুনেছি যে, মনে মনে তোমার চেহারাটি আঁকা হয়েই ছিল। বোধ হয় হাজার লোকের ভীড়ে দেখলেও দূর থেকেই চিনতে পারতেম। আমার ছেলের মুখে তো অষ্ট প্রহরই তোমার নাম।”

মলী সেন ঈষৎ হেসে বললেন, “আমার দুর্নাম বলুন। একমাত্র নিন্দে করা ছাড়া আর কেউ যে কখনও আমার কথা বলে এমন তো মনে হয় না।”

শচীনের মাও হেসে বললেন, “তা বৈ কি। তুমি ভালো করেই জানো, শচীন তোমাকে কতখানি পছন্দ করে। ওর ঐ এক ধারা। যাকে ভালো লাগে না, তার ছায়াও মাড়াবে না। কতদিন আত্মীয়-কুটুমদের কাছে ঐ নিয়ে কথা শুনেছি। আর যার উপরে ওর টান, তার নাম করতে অজ্ঞান। তোমাকে বলব কী মা, যে-বছর ম্যাট্রিক দেবে,—বেশ বড় হয়েছে—সে-বছর স্কুলের কোন ছেলে নাকি বলেছিল, মনোরমা নামটা শুনতে ভালো নয়। তাই নিয়ে ঘুষোঘুষি করে সে-ছেলেটির নাক দিয়ে রক্ত ঝরিয়ে এলো। কেন, না, সেটা আমার নাম। ক্ষ্যাপা আর কাকে বলে!” বলে মহিলা হাসতে লাগলেন।

আপন পুত্রের তরুণ বয়সের এই হঠকারিতার কাহিনী জননীর সকৌতুক অথচ সস্নেহ ভাষণে মলী সেনের শ্রবণে একটি অপরূপ মাধুর্য লাভ করল। মহিলার মুখের হাসি ও চোখের দৃষ্টি থেকে ক্ষরিত বাৎসল্যগৌরবের অদৃশ্য ধারা থিয়েটারের গ্রিজ, পেইন্ট, হীরা, জহরত, টিস্যু, ব্রোকেডে

সমাকীর্ণ সঙ্কীর্ণ এই সজ্জাকক্ষটিকে ঘিরে মুহূর্তে যেন স্নিগ্ধ একটি কমনীয় পরিবেশ রচনা করল।

শচীনের মা একটু থেমে বললেন, "আগে ছিলেম আমি, এখন হয়েছ তুমি। প্রশংসা শুনে শুনে আমার তো রীতিমতো হিংসে হওয়ার উপক্রম।" বলে আবার হাসতে লাগলেন।

সে-হাসিতে মলী সেনও যোগ দিলেন। বললেন, "সত্যি, আপনি এসেছেন, এতে আমি কত যে খুশি হয়েছি। শুনেছি, কোথাও কোনো উৎসবে আপনি যান না, তাই—।"

কপট গাম্ভীর্যের ভঙ্গিতে বাধা দিয়ে শচীনের মা বললেন, "তোমাদের নাটক দেখতে এসেছি, ভেবেছ বুঝি? মোটেই না। এসেছি ঝগড়া করতে। আমার কাছ থেকে আমার ছেলেকে দখল করা—এ কী রকম কথা? যাই, শক্ত করে দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে আসিগে। কিন্তু এসে এখন দেখছি, ভালো করি নি। এরই মধ্যে নিজেই তোমার দখলে চলে গিয়েছি। ছেলের সঙ্গে সঙ্গে আমাকে দেখছি এখন থেকে তোমার নাম কীর্তন করতে হবে।" বলে মৃদু হাস্যে মলী সেনের দিকে তাকালেন।

তাঁর ভাষায় ছিল স্নেহ, দৃষ্টিতে ছিল অকপট কল্যাণকামনা।

মলী সেনকে নিরুত্তর দেখে বললেন, "সত্যি মা, আমি কোথাও কখনও যাইনে। আত্মীয় স্বজনদের বিয়ে, পৈতে, ভাতের নিমন্ত্রণেও নয়। এই নিয়ে আমাকে কথাও কম

শুনতে হয় না। কিন্তু সে আমি গায়ে মাখিনে। আমার আছে ঠাকুর। তাঁকে নিয়ে সংসারের এক কোণে পড়ে আছি। আর আছে ঐ পাগলা ছেলে।”

মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, “ভগবানে আপনার খুব ভক্তি বুঝি?”

শচীনের মা উত্তর দিলেন, “শোনো একবার পাগলীর কথা! খুব ভক্তিই যদি থাকবে তা'হলে আর তুচ্ছ সংসারের কথা, ছেলের কথা ভেবে অস্থির হব কেন? তবে চেষ্টা তো করতে হবে। তিনি ছাড়া আর কী গতি আছে বলো?”

“আচ্ছা, ভগবান যা করেন সবই ভালোর জন্যে—এ-কথা কি আপনি বিশ্বাস করেন?”

“এর মধ্যে বিশ্বাস অবিশ্বাসের জায়গা নেই মা, এ যে সত্যি। আমি মুখ্যু মানুষ, তোমরা তো কত পড়াশুনা করেছ, তোমরাই বলো, সূর্য পূব দিকে ওঠে। সে-কথা কেউ বিশ্বাস করুক, না করুক, সূর্য তো বরাবর সেই পূব দিকেই উঠবে। এও তেমনি।”

উত্তর ও উপমাতে আর যাই থাক, ন্যায়শাস্ত্রের কণা মাত্র নেই। চরিত্রহীনের পশু বৌঠাকরুণকে মনে পড়ল মলী সেনের। অর্জুন তীর ছুঁড়ে পাতাল থেকে জল এনেছে, এ-কথা যদি মিথ্যে হয়, তবে পিতামহ ভীষ্ম তাঁর শরশয্যায় তৃষ্ণা মেটালেন কেমন করে! বুঝলেন তর্ক করা বৃথা।

কিছুটা সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, “কিছু যদি মনে না করেন তো বলি, শুনেছি আপনার জীবনে আপনি কিছু দুঃখ কম

পান নি। আপনি তো ভগবানে এত নির্ভর করেন, আপনাকে তিনি কেন দুঃখ দিলেন?"

শচীনের মা প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন, "ঠাকুর দুঃখ আমাকে অনেক দিয়েছেন সত্যি। কেন দিয়েছেন তা তিনিই জানেন। কিন্তু সে-দুঃখ তুচ্ছ করার ক্ষমতা দিয়ে তিনিই তো আবার দুঃখ দূর করেছেন। তিনি যে দুঃখহরণ।"

যুক্তির দিক দিয়ে এ-সকল উক্তি মলী সেনের কাছে শুধু অসার নয়, রীতিমত অশ্রদ্ধেয়। অন্য যে-কোনো ব্যক্তির মুখে এ-কথা শুনলে মলী সেন অবজ্ঞাভরে বলে উঠতেন—ননসেন্স। কিন্তু শচীনের মায়ের মুখে এই কথাগুলি বিশ্বাসের প্রগাঢ়তায় এমন একটি সতেজ ঋজুতা লাভ করল যে, তাকে বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করতে না পারলেও অবজ্ঞা করার রূঢ়তা প্রকাশ করলেন না তিনি।

শচীনের মা বললেন, "মা, তুমি আমার মেয়ের মতো। তোমাকে বলতে লজ্জা নেই। আমার বাবা ছিলেন গরীব পূজারী বামুন। যে-ঘরে বিয়ে হলো সেখানে বাবুরা পায়রার বিয়েতে দশ হাজার টাকার বাজি পুড়িয়েছেন, বউদের দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে টাকা দিয়ে মুখ দেখেছেন শাশুড়ী। নাতির জন্যে কনে দেখতে রাজাবাহাদুর যে-দিন আমাদের বাড়ি এসেছিলেন, আমার তখন তের বছর বয়স। মনে আছে, বাবা বলেছিলেন, এ শুধু মদনমোহনেরই কৃপা। নইলে তাঁর মনোরমার কী এমন কপাল! এ যে স্বপ্নেরও অতীত!"

একটু নীরব থেকে বললেন, "স্বপ্ন ভাঙ্গতেও দেরী হলো

না। বিয়ের দু'বছর যেতে না যেতেই স্বামী ঘর ছেড়ে বাইরে ছুটলেন। মোসাহেব আর মেয়েমানুষ নিয়ে দিনরাত ডুবে রইলেন মদে। শাশুড়ী, ননদের নির্যাতনের সীমা রইল না। দোষ তো আমারই। তাঁদের ছেলেকেই যদি ঘরে বেঁধে না রাখতে পারল তবে বউ-এর রূপ দিয়ে কী হবে? মনে পড়ে, নিজে সারাদিন উপোসী। তবু স্বামীর খাবার সাজিয়ে মাঝরাত অবধি জেগে বসে রয়েছি। কতদিন মত্ত অবস্থায় তিনি কাঁসি ছুঁড়ে মেরেছেন গায়ে। লক্ষ্য করলে, কপালে দাগ এখনও দু'চারটে দেখতে পাবে হয় তো।"

মলী সেন শিউরে উঠে অর্ধ স্বগতের মতো মন্তব্য করলেন—"ব্রুট!"

শচীনের মা বললেন, "এ সমস্তই সয়েছিলেম। কিন্তু স্বামী যে-দিন সমস্ত মান সম্ভ্রমের মাথা খেয়ে কৈবর্তপাড়া থেকে এক প্রজার একটা নষ্ট মেয়েকে অন্দরমহলে এনে তুললেন, সে-দিন ঠিক করলেম, আর নয়। রাত্রিতে শোবার ঘরে কড়িকাঠের সঙ্গে দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়ব। খোকা তখন বছর তিনেকের। বারুণীর মেলা থেকে কে যেন তাকে খেলনা কিনে দিয়েছিল—একটি মাটির গোপাল। সে-টা দু'হাতে চেপে কোথা থেকে হঠাৎ আমার কোলে উঠে বলল, 'মাম্, থাকুল।' এক মুহূর্তে রাস্তা দেখতে পেলেম। তাই তো, আমার ঠাকুর! তাঁকে কেন স্মরণ করি নি? আমার বাপের বাড়ির মদনমোহন—তাঁকে কেমন করে এত দিন ভুলে ছিলেম? সে-দিন থেকে ভগবানকে ডাকতে সুরু

করলেম। মা, তুমি হয় তো বিশ্বাস করবে না ; সেই থেকে আমার আর দুঃখ রইল না। তারপর ষোল বছর শ্বশুর বাড়ি ছিলেম। স্বামী অত্যাচার করেছেন গুরুজনেরা দিয়েছেন গঞ্জনা, বিধবা পেয়ে সরিকেরা ষড়যন্ত্র করে ঠকিয়ে নিয়েছে বিষয়-আশয়—কোনো কিছুই আমাকে কষ্ট দিতে পারে নি।”

মলী সেন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “স্বামীর এত অত্যাচার অপমানেও আপনি তাঁকে ছেড়ে আসেন নি ?”

“ছেড়ে এলেই নিস্তার কোথায় ? স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তো শুধু ইহকালেই শেষ নয়। জন্ম-জন্মান্তর ধরেই যে তা চলতে থাকবে।”

মলী সেন অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন, “তা বলে দুশ্চরিত্র, অত্যাচারী স্বামীর সমস্ত উপদ্রব সহ্য করে তাঁর কাছে পড়ে থাকতে পারব না আমি, তা সে-সম্পর্ক এক জন্মের হোক, কি, এক হাজার জন্মেরই হোক।”

শচীনের মা হেসে বললেন, “ষাট, তোমাকে পারতে হবে কেন ? তোমার এমন বর, এমন ঘর, এমন সুখের সংসার, তোমার মত ভাগ্যবতী আছে ক'জন ?”

মলী সেনের মুখে ম্লান ছায়া পড়ল। প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্যে তাড়াতাড়ি বললেন, “সমস্ত সঙ্কটেই কি আপনি নিশ্চিন্তে ঈশ্বরে নির্ভর করতে পারেন ?”

“পারি বলি কেমন করে ? এই ছেলের ব্যাপারেই দেখ না। মাঝে তাকে নিয়ে উদ্বেগের আর সীমা ছিল না। সে গোপনে গোপনে একটা কিছু সাংঘাতিক বিপাকে জড়িয়ে

পড়েছে, তা বুঝতে পারছিলেম ; অথচ কি করা দরকার তা জানা ছিল না। শেষে একদিন মনে হলো, আমি কেন মিছে ব্যাকুল হচ্ছি। বাসুদেবের যদি এই ইচ্ছে হয় যে, ছেলে আমার জেলে পচবে বা ফাঁসিতে মরবে, তবে আমার সাধ্য কী তাকে বাঁচাই? সেই থেকে মনের অস্থিরতা কমলো। কোথা থেকে গোবিন্দ জুটিয়ে দিলেন তোমাকে। না, না, তুমি অমন কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন? আমি সমস্তই জানি। তোমার মত এত বড় উপকার শচীনের আর কেউ করে নি।"

কৃতজ্ঞা জননীর এই অকৃত্রিম ধন্যবাদ জ্ঞাপনে মলী সেন অত্যন্ত বিব্রত বোধ করলেন। মনে হলো, এই ভক্তিমতী মহিলার সস্নেহ সাধুবাদে তাঁর সত্যিকার অধিকার নেই। প্রতারণার দ্বারা এই প্রশংসা অর্জন করেছেন, এই চিন্তায় নিজের কাছেই নিজেকে অপরাধী মনে হলো।

ধীরে ধীরে মলী সেন বললেন, "একদিন হয়তো শুনবেন, আপনার ছেলের একদিক দিয়ে যে-সামান্য উপকার করেছি, অন্য দিক দিয়ে তার অনেক বেশী করেছি অপকার।"

"শুনলেও বিশ্বাস করব না। তোমাকে কতক্ষণ বা জেনেছি। তবুও এইটুকু বুঝেছি, ঠাকুর যাকে এমন লক্ষ্মীর মতো রূপ আর সরস্বতীর মতো বুদ্ধি দিয়েছেন, সে ভুল করতে পারে, অন্যায় করতে পারে না।"

"কিন্তু ভুল থেকেও তো লোকের ক্ষতি হয়।"

"তা হয়। কিন্তু মা, ভুল করা না করা তো সব সময়ে মানুষের হাতে নয়। রামপ্রসাদের গান শোন নি—"সকলই

যে তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি; তোমার কর্ম তুমি করাও মা, লোকে বলে করি আমি।”

শ্রদ্ধায় নম্র ও হৃদ্যতায় গভীর কণ্ঠে মলী সেন বললেন, “আপনাকে দেখে এবার কিন্তু আমার হিংসে হচ্ছে। আপনার মতো এমন সহজ সরল বিশ্বাস যদি থাকত, তবে অনেক সঙ্কট থেকেই বোধ হয় ত্রাণ পেতেম।”

শচীনের মা সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, “মা, তোমার বয়স অল্প। কিন্তু কথা শুনে মনে হয়, যেন অনেক দুঃখের সাগর পার হয়ে এসেছ। জানিনে তোমার কী কষ্ট, কীসের মনস্তাপ। কারণ যা-ই হোক, রাধামাধবকে স্মরণ করো; অশান্তি দূর হবে। বিপদ কেটে যাবে। তিনি যে বিপদভঞ্জন। দীনদয়াল।”

মলী সেন নীরবে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। শেষে অকস্মাৎ প্রশ্ন করলেন, “আচ্ছা, কী বলে আপনার ঠাকুরকে আপনি ডাকেন?”

“তাঁর নাম কি একটা, নাম যে অসংখ্য—

কুব্জা রাখিল নাম পতিতপাবন হরি।
চন্দ্রাবলী নাম রাখে মোহন বংশীধারী॥
অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া।
কৃষ্ণ নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া॥
কণ্ব মুনি নাম রাখে—”

এই সমস্তই মলী সেনের কাছে নতুন। অশ্রুতপূর্ব কাহিনী। অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য।

কিছুক্ষণ পরে শচীনের মা বিদায় নিলেন। কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পূর্বে গভীর স্নেহভরে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী দ্বারা মলী সেনের চিবুক স্পর্শ করে একটি চুম্বন গ্রহণ করলেন।

তাঁর প্রস্থান-পথে একদৃষ্টে তাকিয়ে হঠাৎ কেন যেন মলী সেনের মনে পড়ল তাঁর পরলোকগতা মায়ের কথা। মলী সেন তাঁকে দেখেন নি কোনোদিন ; প্রসবের পরেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তবুও বার বারই মলী সেনের মনে হতে লাগল,---তাঁর সেই অকালমৃতা জননী আজ জীবিতা থাকলে তিনি বুঝি বা এই ভগবদ্‌বিশ্বাসী পুণ্যশীলা মহিলার মতোই হতেন। ঠিক এমনই স্নেহশীলা। এমনই কল্যাণময়ী।

প্রসাধন শেষে ধীরে ধীরে অভিনয়ের জন্যে বেশ পরিবর্তন করলেন মলী সেন। কানে পরলেন কুণ্ডল। কণ্ঠে সরু চেনের বদলে চওড়া হীরার কণ্ঠি। চরণে বাজল নূপুর, বাহুতে উঠল মণিবলয়। নিতম্বে ঝুলিয়ে দিলেন মুক্তার ঝালরযুক্ত চুনীপান্নার মনোরম অলঙ্কার। আধুনিকা মিসেস সেন বসনে-ভূষণে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হলেন অতীত কালের রাজকন্যা মঞ্জুশ্রীতে। অঙ্গে তাঁর নীলাম্বর, বক্ষে তাঁর রক্তাংশুক, ঘনকৃষ্ণ কবরীবন্ধনে প্রস্ফুটিত শ্বেত করবীগুচ্ছ।

ঘড়ির পানে তাকিয়ে দেখলেন, এখনও কিছু সময় আছে। ইজিচেয়ারটাতে দেহ এলিয়ে দিলেন। অভিনয়ে নিজ ভূমিকাটি উপলব্ধির চেষ্টা করলেন মনে মনে।

কিন্তু মন বিনিষ্ট করা কঠিন হলো। হঠাৎ শোনা গানের ভালো-লাগা সুর যেমন পুরোপুরি আয়ত্তে আসে না অথচ কেবলই ঘুরে-ফিরে কানে বাজতে থাকে, শচীনের মায়ের প্রসঙ্গও তেমনি মলী সেনের মনে পড়তে লাগল ক্ষণে ক্ষণে।

দুঃখের অনল এই বঞ্চিতা রমণীকে অঙ্গারের মতো মলিন করে নি, স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল করেছে। মন তাঁর বিক্ষোভে তিক্ত নয়, ঔদার্যে প্রশান্ত। বিধবার এই সৌম্য স্নিগ্ধ রূপটি মলী সেনকে একাধারে বিস্মিত ও আকৃষ্ট করল।

হঠাৎ চেয়ে দেখলেন, সামনে দাঁড়িয়ে মান্নামাসি।

তিনি জিজ্ঞাসা করলে, "ঘুমিয়ে পড়েছিলে না কি? তা ঘুমের আর দোষ কী? যা খাটুনিটা যাচ্ছে ক'দিন ধরে! তুমি বলেই পারছ, অন্য আর কেউ হলে—"

মলী সেন লজ্জিত হয়ে বললেন, "না, ঘুমুই নি। বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলেম। তা খবর কি মান্নামাসি?"

"খবর বিশেষ কিছু নয়। আসছে বুধবার গৌরীর জন্মদিন। গুটি দুই-তিন বন্ধুবান্ধবকে চা'য়ে ডাকব ভাবছি। নিখিলকে আসতে বলব, তোমার সুবিধে হবে কী?"

মান্নামাসির জিজ্ঞাসায় মলী সেনের প্রতি কোনো গূঢ় ইঙ্গিত ছিল কি না তা তিনিই জানেন। অন্য সময়ে মলী সেনও এতে রাগ করতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে মলী সেনের মনের তন্ত্রীগুলি একটি বিশেষ স্বরগ্রামে বাঁধা ছিল। প্রশ্নটা সেখানে যেন অকস্মাৎ মুষ্টিঘাতের মতো বাজল। বললেন, "মিস্টার রয়কে তুমি নিমন্ত্রণ করবে, তার সঙ্গে আমার সুবিধা-অসুবিধার সংস্রব কী?"

নীরবে পরাজয় স্বীকার করবেন এমন পাত্রী মান্নামাসিও নন। তিনি শ্লেষের সঙ্গে জবাব দিলেন, "কী জানি ভাই, সে তো আমিও ভাবি। কিন্তু লোকে বলে, আজকাল মিস্টার রয়ের নাকি নিজের মত বলে কিছুই নেই। তাই ভাবলেম—"

মলী সেন বাধা দিয়ে কঠিন স্বরে বললেন, "লোকে কী বলে, না বলে, তা আমাকে শোনাবার দরকার নেই। তুমি কাকে নিমন্ত্রণ করবে, না করবে, সেও তোমার ভাবনা। এ নিয়ে আমি আর কোনো বাদানুবাদ করতে চাইনে, মান্নামাসি।"

"তুমি অন্যায় রাগ করছ, মলী। আমি না হয় চুপ করেই রইলেম। কিন্তু তাই বলে মেজাজ দেখিয়ে তো আর পাঁচজনের মুখে চাপা দিতে পারবে না, ভাই। তাদের তো চোখ-কান দুই-ই আছে। তা যাকগে, জেনে সুখী হলেম যে, মিস্টার রয়কে অন্য কারো অনুমতি নিয়ে চলতে হয় না।"

একটু অর্থমূলক হাস্য করে মান্নামাসি ড্রেসিং-রুম থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

বিরক্তিতে ছেয়ে গেল মলী সেনের মন।

প্রবেশ করল সমীর। মলী সেন তাকে দেখে একটু বিস্মিতই হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "কী সমীর, কী চাই?"

"আপনি আমার এ্যালবামটা দেখতে চেয়েছিলেন, তাই সেটা নিয়ে এসেছি।"

"এরই মধ্যে? কোথায় ছিল এটা?"

"হেদোয় আমার মাসীর বাড়িতে, যেখানে আমি উঠেছি।"

"সেখান থেকে আনলে কখন?"

"এক্ষুণি। একটা ট্যাক্সি নিয়ে গিয়েছিলেম।"

নিমেষে সমস্ত ব্যাপারটা মলী সেনের কাছে দিবালোকের মতো স্বচ্ছ হয়ে দেখা দিল।

পরিচিত মহলে নিজ ভক্তজনের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অতীতে বহু দিন তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন। এই প্রথম যেন আপন অনিন্দ্য দেহশ্রীর জন্যে লজ্জা বোধ করলেন। পুরুষের কাছে তাঁর অপ্রতিরোধনীয় আকর্ষণের কদর্যতা এমন পরিপূর্ণ নগ্নতায় এর আগে আর কোনো দিন তাঁর কাছে স্পষ্ট হয় নি। তিনি নতমস্তকে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলেন। তারপর

স্নেহকোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "ধীরা কোথায়? জানো না? আচ্ছা চল, আমি দেখছি।"

স্টেজের গলি-পথটায় প্রেক্ষাগৃহ থেকে ধীরাকে ডাকিয়ে এনে বললেন, "কোথায় ছিলি এতক্ষণ? সামনের ঐ সারি দুটো গেস্টদের জন্যে। সমীরকে নিয়ে ওখানে বোস গে যা। সমীর, তুমি থিয়েটার শেষ হলে, আমার গাড়িটা নিয়ে ধীরাকে বাড়ি পৌঁছে দিও। ভালো কথা, এ-হপ্তায় কী সিনেমা দেখেছ? কিছু দেখ নি? আচ্ছা, তা' হলে পরশু ম্যাটিনীতে দুজনে টারজান দেখতে যেও। আমি টিকিট আনিয়ে রাখব।"

পাশাপাশি দু'খানি আসনে দুজনে বসল। কিন্তু এই দুটি কিশোর প্রণয়ীর যে-সান্নিধ্য ইতিপূর্বে পরস্পরের হৃদয়কে উদ্বেল ও রসনাকে মুখর করেছে আজ তার মধ্যে মাধুর্যের লেশমাত্র সন্ধান পাওয়া গেল না।

ধীরা স্টেজের উপরে নীল ভেলভেটের যবনিকার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে রইল। আড়ষ্ট। নিঃশব্দ।

অবশেষে অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে সমীর প্রশ্ন করল, "সুরু হবে কখন?"

ধীরা জবাব দিল, "সাতটায়।"

"থিয়েটার ভাঙ্গবে কখন?"

"জানিনে।"

এ-রকম প্রশ্নোত্তরের দ্বারা আদালতে জেরা করা হয়তো যায়। কথাবার্তা চালানো যায় না। তবুও আবহাওয়াটাকে

সহজ করার চেষ্টায় সমীর ঠাট্টা করে বলল, "সখের থিয়েটার দলের শুনেছি সময়ের জ্ঞান থাকে না। তোমাদের নাটকের আরম্ভ সেভেন পি-এম, না, সেভেন এ-এম ?"

অপর পক্ষ থেকে এই পরিহাসের যথোচিত সাড়া পাওয়া গেল না। সে হাতের ঘড়ি দেখে বলল, "আর মিনিট পনর পরে।"

সমীর জিজ্ঞাসা করল, "তোমার হলো কী ? হঠাৎ এমন গম্ভীর কেন ?"

ধীরা তার পানে না তাকিয়ে পূর্ববৎ নির্লিপ্ত কণ্ঠেই জবাব দিল, "না, গম্ভীর কিসের ?"

সমীর বিরক্ত হয়ে মনে মনে বলল, "খামোকা মুখ গোমড়া করে বসে থাকতে ভালো লাগে তো, থাক না। ভারি আমার বয়েই গেল।" সে আর কোনো কথা না বলে হাতের প্রোগ্রামটির পাতা বার বার উল্টে পাল্টে পড়তে লাগল সিগারেটের বিজ্ঞাপন, অভিনেতা অভিনেত্রীদের নাম, কর্মকর্তাদের তালিকা।

নিজের সজ্জাকক্ষে ফিরে এসে মলী সেন যাঁকে দেখতে পেলেন তাঁকে কিছুমাত্র প্রত্যাশা করেন নি। তিনি আর কেউ নন ; তাঁরই স্বামী শিবনাথ।

শিবনাথ বললেন, "সিন্দুকের চাবিটা একবার দরকার।"

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একমাত্র প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ ব্যতীত বাক্যালাপ খুব সামান্যই ঘটে। দীর্ঘকাল থেকে এই নিয়মেই তাঁরা অভ্যস্ত। তবুও এই মুহূর্তে ঠিক এই কথাটার জন্যে যেন মলী সেন প্রস্তুত ছিলেন না। গিরিবালার মতো তাঁরও মনে হলো, হায়, এই উৎসবের সন্ধ্যা, এই উজ্জ্বল দীপালোকিত অপরিসর সজ্জাকক্ষ, এই অপূর্ব রাজনন্দিনীর বেশ, এই স্বপ্নময় পরিবেশে যে-কথা প্রথম মনে আসে সে কি সিন্দুকের চাবি! মোহ নয়, সুধা নয়, ক্ষণিক মাধুর্যের সামান্য ইঙ্গিতটুকুও নয়?

আপন বক্ষে উদ্গত দীর্ঘনিঃশ্বাস সবলে দমন করে নিঃশব্দে ব্যাগ থেকে চাবির গোছাটা শিবনাথের হাতে দিলেন মলী সেন।

শিবনাথ মিনিট খানেক কী যেন চিন্তা করলেন। তারপর অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, "তোমার খান কয়েক গহনা দিতে পার দিন দুই-তিনের জন্যে? বিশেষ জরুরী।"

মলী সেন বললেন, "গহনা সমস্তই সেফ ডিপজিটের লকারে। তার চাবি সিন্দুকের ভিতরেই আছে। খুলে যা দরকার নিতে পারো।"

শিবনাথ ব্যাখ্যা করে বললেন,—"আমার কাছে নগদ টাকা সব কুড়িয়ে গুছিয়েও বোধ হয় হাজার খানেকের বেশী হবে না। এই রাত্তিরে আরও সাত হাজার টাকা খালি হাতে যোগাড় করা শক্ত। তাই কয়েকটা গহনা বাঁধা রেখে এখন

টাকাটা নিচ্ছি। সোমবারে ব্যাঙ্ক খুললেই তোমার গহনা ফিরে পাবে।"

মলী সেন জিজ্ঞাসু নেত্রে শিবনাথের পানে তাকালেন। শিবনাথ বললেন, "টাকাটা নিয়ে আমাকে এখনই রওনা হতে হবে। ছবি তোমার কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে।"

শিবনাথ প্রস্থানোদ্যোগ করতেই মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি যাচ্ছ কোথায়?"

"আসানসোলে। ছবির কাছ থেকে এইমাত্র খবর নিয়ে লোক এসেছে। দেবেন তাদের আপিসের ক্যাশ ভেঙেছিল, ধরা পড়েছে।"

ক্ষণেক নীরব থেকে মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "কাল সকালে সেখানে গেলে ক্ষতি কী?"

"ক্ষতি অনেক। আপিসের বড় সাহেবকে অনেক বলে কয়ে রাজী করানো গেছে, আজ রাত্তিরেই টাকাটা দিয়ে দিলে আর পুলিশে জানাবে না।"

"পুলিশে জানায় তো জানাবে। টাকা চুরি যে করেছে, তার শাস্তি সে পাবে। সেই শাস্তি থেকে তাকে বাঁচানোটাই অন্যায়।"

"তোমার বোন নেই। থাকলে জানতে পারতে যে, ভগিনীপতিকে জেলে পাঠানোটাই সংসারে সব চেয়ে বড় ন্যায় নয়।"

বোন না থাকলেও সে-কথা মলী সেন বোঝেন। ছবিকে তিনি নিজেও স্নেহ করেন। তাই মনে মনে লজ্জিত হলেন।

তাঁর আপত্তি তো সাহায্য দানে নয়। তিনি বললেন, "আর মিনিট কয়েক পরেই অভিনয় সুরু হবে, এখন তুমি চলে যাবে, সে কি করে হয়?"

শিবনাথ জবাব দিলেন, "না হওয়ার তো কোনো কারণ দেখছিনে। অভিনয়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ যে কোনখানে সে তো আমি ভেবে পাইনে।"

"যোগাযোগ নেই, সে-কথা সত্যি। কিন্তু সেটা ঘটা করে প্রচার করারই বা সার্থকতা কী?"

"প্রচার করা যেমন অনাবশ্যক, ভান করাও, তেমনি অনুচিত।" কিছুটা কঠিন কণ্ঠেই যেন বললেন শিবনাথ।

"অত্যন্ত মহৎ মনোভাব, সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও এমনই অদৃষ্টের খেলা যে, গত পনরটা বছর ধরে অহোরাত্র শুধু ভান করেই কাটাতে হচ্ছে!" জবাব দিলেন মলী সেন।

নির্মম, নির্ভেজাল সত্য! শিবনাথ হৃদয়ঙ্গম করলেন। তাইতো, ভান তো তাঁকেও কম করতে হয় না।

জগতে বহু মনোবেদনারই লাঘব আছে সমবেদনায়। কিন্তু স্বামী বিমুখ বা স্ত্রী অননুরাগিনী, প্রাণান্তেও এ-দুঃখের প্রকাশ চলে না কারো কাছে। আত্মীয় পরিজনের কাছে, বন্ধুবান্ধবের কাছে, সমাজের কাছে অসুখী দম্পতীরা তাই নিরন্তর গোপনের প্রয়াস করে তাদের বিড়ম্বিত জীবনের দুঃসহ দুঃখভার। ভান করে,—সুখী, স্বাভাবিক, সম্মিলিত জীবনযাত্রার। শিবনাথও তার ব্যতিক্রম নন।

শিবনাথকে নিরুত্তর দেখে মলী সেন মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে

বললেন, "বন্ধুবান্ধব, নিমন্ত্রিত, অভ্যাগত সব এসেছেন। তোমাকে না দেখতে পেলে তাঁরা কী ভাববেন? তাঁদের প্রশ্নের আমি কী উত্তর দেবো? দোহাই তোমার, সবার কাছে এমন ভাবে আমার মাথা হেঁট করে দিও না।"

শিবনাথ স্থির কণ্ঠে বললেন,—"ছবির এই বিপদের সময়ে এ-সব তুচ্ছ কথা ভাববার নয়।"

মলী সেন দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করে বললেন, "আমার সমস্ত কথাই তোমার কাছে তুচ্ছ। আচ্ছা, সামান্য একটা পাখী পুষলে তার প্রতি মানুষের যে-আ[illegible] থাকে আমার সম্পর্কে তোমার তাও নেই?"

শিবনাথ বললেন, "এতকাল পরে [illegible]ন করে এ-সব কথা আলোচনায় আজ আর কোনো ফল আছে কি?"

"না নেই। তবুও একটা কথা জিজ্ঞেস করছি,—তুমি বিয়ে করেছিলে কেন? আমি তোমার কী ক্ষতি করেছিলেম? আমার এত বড় সর্বনাশ তুমি কেন করলে?" ক্ষোভে ও বেদনায় মলী সেনের কণ্ঠ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

অত্যন্ত সঙ্গত প্রশ্ন। দুরূহও বটে। শিবনাথের দিক থেকে কোনো জবাব ছিল না।

কাতর কণ্ঠে শিবনাথ বললেন, "তোমার ক্ষতি করেছি, সে-কথা ঠিক। কিন্তু বিশ্বাস কর মলী, অন্যায় যা করেছি, সে ভুল করে করেছি। না বুঝে করেছি। ইচ্ছে করে নয়।"

"ভুল করেছ জেনে আমার লাভ কী? আমার জীবনটাকে

যে এমন করে ব্যর্থ করে দিলে তা কি শুধু 'সরি' বললেই চুকে যায় ভেবেছ ?"

"কোনো দিন তা ভাবি নি। মলী, তোমার দুঃখ অনেক। কিন্তু আমার মনস্তাপ যে তার চেয়ে ঢের বেশী। তুমি তবুও নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে আমাকে দোষী করে মনে কিছু সান্ত্বনা পাও। আমি দোষ দেবো কাকে ? নিজের জীবনকে বিড়ম্বিত করেছি, তার বেদনা মর্মান্তিক। তোমার জীবনকে নষ্ট করেছি, তার অনুশোচনা দুঃসহ। তুমি বিশ্বাস করবে না, মলী, অনুতাপের পীড়নে দিনে মুখে আমার অন্ন রোচে না, রাত্রিতে চোখে আমার ঘুম আসে না।"

শিবনাথের কণ্ঠের আন্তরিকতা মলী সেনের হৃদয় স্পর্শ করল। তিনি কী বলবেন ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইলেন।

শিবনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "মলী, আমি মূর্খ, হঠকারিতা করেছি ; কিন্তু তুমিই বা ভুল করতে গেলে কেন ? তোমাদের সমাজে তো মা-বাবার নির্দেশে গৌরীদান হয় না। মেয়ের মত নিয়েই সেখানে পাত্র স্থির হয়। তুমি কেন আপত্তি করলে না ? আমাদের রীতিনীতি, আবহাওয়া, পরিবর্তন কোনো কিছুই তো তোমার অনুকূল ছিল না।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মলী সেন বললেন, "আমার মত না নিয়ে বিয়ে হয় নি, সে-কথা সত্যি। বাবার তখন অত্যন্ত সঙ্কট যাচ্ছিল। শেয়ারের বাজারে হঠাৎ অনেক টাকা লোকসানে ঋণে তিনি আকণ্ঠ ডুবে ছিলেন। সে-কথা

ঘুণাক্ষরে কাউকে জানতে দেন নি। ঠিক সেই সময়ে তোমার বাবা এই বিয়ের প্রস্তাব করেন। প্রথমে আমার বাবার মত ছিল না। কিন্তু বিয়ে হলে আমার বাবার কারখানা ও ব্যবসাগুলি সমস্ত তোমাদের ব্যবসার সঙ্গে মিলে এক হয়ে রক্ষে পাবে, শেয়ার হোল্ডারদের টাকাটা বাঁচবে, নিজেরও প্রতারক অখ্যাতি রটবে না ভেবে বাবা শেষটায় রাজী হন। কিন্তু আমি সম্মতি না দিলে তিনি কখনও বিয়ে দিতেন না।"

"তুমি সম্মতি দিলে কেন?"

"বাবা বার বার বলেছিলেন, 'মলী, তুই খুশি হয়ে রাজী না হলে এ-বিয়ে আমি দেবো না। আমার দেনার কথা, কারখানার কথা তুই ভাবিসনে। তার ব্যবস্থা যা করার আমি করব।' কিন্তু আমার বাবাকে আমি ভালো করেই জানতেম। অত্যন্ত সেনসিটিভ মানুষ। সে-দিনই রাত্তিরে চুপি চুপি তাঁর টেবিলের দেরাজ থেকে রিভলভারটা আমি সরিয়ে এনে নিজের কাছে লুকিয়ে রাখলেম। মনকে বোঝালেম, ছেলে থাকলে সে আজ ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে বাবার পিছনে দাঁড়াতো। মেয়ে হয়ে আমি যদি তাঁকে তাঁর বিপদের দিনে উদ্ধার করতে না পারি, তবে ধিক আমাকে।"

শিবনাথ বিস্মিত হলেন। যাকে তিনি চিরকাল আরামপ্রিয়, গভীরতাহীন, লঘুচিত্ত, ফ্যাশানসর্বস্ব তরুণী বলে মনে মনে করুণা করেছেন, সেও যে তার প্রিয়জনের কল্যাণে আপন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে আত্মত্যাগে সক্ষম, সে-কথা কোনো দিন তিনি কল্পনা করেন নি।

মলী সেন বললেন, "তা ছাড়া,—মিথ্যে বলব না, ভেবেছিলেম, তোমার আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে যদি ব নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে না পারি, তোমার কাছ থেকে কোনো আক্ষেপের কারণ ঘটবে না। লতার মূল যদি মাটি থেকে রস টানতে পারে, তবে রোদের তাপে সে শুকিয়ে মরে না।"

শিবনাথ অর্ধস্বগতের মতো বললেন, "সত্যি, দুজনেই জীবনকে আমরা কী অসহ্য বিড়ম্বনা করে রেখেছি।"

মলী সেন বললেন, "হ্যাঁ! হোয়াট এ টেরিবল্ মেস্। কিন্তু এমন করে আর কতকাল জীবন কাটাতে হবে, বলো।"

"যতকাল জীবনের শেষ না হচ্ছে। কিন্তু মৃত্যু তো আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। সময় হলে তাকে এড়ানো যেমন চলে না, সময় না হলে তাকে পাওয়াও তেমনি অসম্ভব। একটা সীন্ না করে তো এ-যুগে প্রাণ দেওয়ার উপায় নেই।"

হঠাৎ দুই হাত দিয়ে শিবনাথের হাত চেপে ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে মলী সেন বললেন, "এস, আবার নতুন করে আমরা জীবন আরম্ভ করি। যা গিয়েছে, তা গিয়েছে। যা আছে, তাই নিয়ে সুরু করি।"

ধীরে ধীরে নিজের হাত মুক্ত করে নিয়ে শিবনাথ একটু ম্লান হেসে বললেন, "এ তো পরীক্ষার পড়া নয় যে, সমস্ত বছর ক্লাশ পালিয়ে এগজামীনের আগে সারা রাত জেগে বই মুখস্ত করে পাশ করবে! এরিয়ার মেক-আপের অবকাশ নেই জীবনে। না মলী, স্বভাবে, চিন্তায়, দৃষ্টিভঙ্গিতে

কোথাও তোমার সঙ্গে আমার এতটুকু মিল নেই। তোমার পথ আর আমার রাস্তা পৃথক, চলার ছন্দ আলাদা। এক ঘরে আমরা বাস করব। এক ঘরে আমরা ঘর করব না। সৃষ্টিকর্তার এই বিধান।"

দুই হাত দিয়ে চক্ষের অশ্রুবিন্দু মার্জনা করে মলী সেন বললেন, "ভগবান লোকটার মতে, এমন ধৈর্যশীল আসামী আর দ্বিতীয় নেই। সংসারের সমস্ত দুষ্কৃতির অভিযোগ অনায়াসে তারই মাথায় চাপিয়ে দেওয়া যায়। সে তো প্রতিবাদ করতে পারে না। হায়, পথের কথা তুলে আজ তুমি খোঁটা দিচ্ছ। একবারও তোমার মনে পড়ছে না যে, পথ আমার একদিনে পৃথক হয়ে যায় নি। ভুলে গিয়েছ যে, আমি তো প্রথমে তোমার হাত ধরেই চলতে চেয়েছিলেম। তুমিই হাত সরিয়ে নিয়েছ।"

শিবনাথ বললেন, "আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না, মলী, দোষ আমার। কিন্তু আমার কথা কাউকে বলার নয়। সে শুধু অন্তর্যামী জানেন। আমি আমার নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজেই ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছি প্রতি মুহূর্তে। তোমাকে ঠকাবার কোনো অভিপ্রায় ছিল না। আমাকে তুমি ক্ষমা করো।"

উত্তরে মলী সেন কিছু বলার পূর্বেই ব্যস্তপদে সিদ্ধনাথ প্রবেশ করে বললেন, "মিসেস সেন, ডাক্তার সত্যসিন্ধুকে দেখেছেন? এখানে আসেন নি তিনি?"

মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "ডাক্তারকে কেন? কি হয়েছে?"

"আর বলেন কেন! মেয়েদের ড্রেসিং-রুমে অপর্ণা ফেইন্ট করেছে। আমাদের কালে তো পতন ও মূর্ছাটা থাকতো পার্টের শেষে। এ যে দেখছি অভিনয়ের আগেই অজ্ঞান প্রোগ্রেসিভ যুগ কিনা, সব কিছুই এখন আগে আগে হয় হোঃ হোঃ হোঃ। যাই দেখিগে ডাক্তার আছে কোথায় ডোবালে দেখছি। না, না, আপনাকে আসতে হবে না। আপনি উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন? আমি ওদিক সামলাচ্ছি।"

সিদ্ধনাথ ডাক্তারের সন্ধানে গেলেন।

শিবনাথ বললেন, "আমি ছোট গাড়িটা নিয়ে যাচ্ছি। বড় গাড়িটা আর ড্রাইভার রইল। দরকার হলে দোকানের হিল্‌ম্যানটাও টেলীফোন করলেই তোমাকে পাঠিয়ে দেবে।"

"তুমি আজ রাতটুকুও অপেক্ষা করতে পারো না?"

"না, কোনো মতেই নয়।" বলে শিবনাথ কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

মলী সেন ইজিচেয়ারটায় বসে ক্ষোভে ও অপমানে দগ্ধ হতে লাগলেন। (যে-লোক একটা সামান্য অনুরোধের মর্যাদা রাখে না, তার কাছে ভিক্ষুকের মতো নতুন করে জীবন আরম্ভের কথা তুলেছিলেন তিনি কোন লজ্জায়?) ছিঃ ছিঃ, এমন দুর্বলতা তাঁর কেমন করে ঘটল? ধিক তাঁকে! শত ধিক তাঁর অতিপ্রমত্ত প্রগল্‌ভতায়!!

হঠাৎ শচীনের মায়ের উপরে মলী সেনের রাগ হতে লাগল। গিরিধর গোপাল, দীনদয়াল, মধুসূদন। রাবিশ্‌!

উঠে দাঁড়িয়ে বেয়ারাকে হাঁক দিয়ে বললেন, পুরুষদের ড্রেসিং-রুম থেকে অবিলম্বে নিখিলকে ডেকে আনতে।

অস্থির পদক্ষেপে পদচারণ করতে করতে ভাবলেন, ক্ষমা? কিসের ক্ষমা? ঝরণার উৎস শুকিয়ে দিয়ে তার কাছে চায় স্নিগ্ধ জলধারা? বাঁশীর রন্ধ্র বন্ধ করে দিয়ে প্রত্যাশা করে সুমধুর সুর?

ক্রোধে মলী সেনের কর্ণদ্বয় তপ্ত, নিঃশ্বাস দ্রুত এবং দৃষ্টি কঠোর হয়ে উঠল। দুই হাতের মুষ্টি বন্ধ করে দাঁত দিয়ে ওষ্ঠাধর চেপে মনে মনে বললেন,—না, কোট চাইলে ক্লোক দান করা বা ডান গালে চড় খেয়ে বাঁ গাল এগিয়ে দেওয়ার নীতিতে তিনি বিশ্বাস করেন না। ভাগ্যের কাছেও পরাভব মানবেন না কিছুতেই। দীপের আলো যদি না পান, জ্বালবেন অগ্নির শিখা। হয়তো তাতে পুড়ে মরবেন শুধু নিজেই। ক্ষতি নেই। তিনি হত হবেন, তবু নত হবেন না।

যে-কথা কাউকে বলার নয় বলে শিবনাথ স্ত্রীর কাছে মার্জনা ভিক্ষা করলেন, সে-কথা তাঁর অন্তর্যামী ছাড়া আরও দু'এক জন জানে। সে-কাহিনীটুকু সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু সামান্য নয়।

কলেজে সংস্কৃতের শিক্ষক অঘোর বাচস্পতির কাছে

প্রত্যহ পাঠ নিতে যেতেন শিবনাথ। বিপত্নীক বাচস্পতির গৃহে রাশীকৃত জড় পুঁথি-পুস্তক ব্যতীত একটি সজীব প্রাণী ছিল। সে তাঁর মেয়ে শৈলবালা। প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলা মেজেতে মাতুর বিছিয়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নবীন ছাত্রের কাছে ব্যাখ্যা করতেন কাব্য, ব্যাকরণ বা সাহিত্য। গৃহকর্ম সমাপনান্তে কক্ষের অপর প্রান্তে ছুঁচ দিয়ে জীর্ণ জামা-কাপড়ের ছিদ্র সংস্কার করতো শৈলবালা।

পিতলের পিলসুজের উপর জ্বলছে রেড়ীর তেলের প্রদীপ। প্রাচীন কবিগণের রচনার অন্তর্ঘন সাহিত্যরস, সুপণ্ডিত অধ্যাপকের উদাত্ত কণ্ঠের আবৃত্তি ও স্বল্পপরিসর গৃহের রহস্যময় মৃদু দীপালোক কিছু দিনের মধ্যেই সীবনরতা তরুণীর এই নিঃশব্দ অথচ নিয়মিত উপস্থিতিকে শিবনাথের চক্ষে একটি বিস্ময়কর বিশেষত্ব দান করল। তাঁর ভাবপ্রবণ হৃদয়ের উদ্দীপ্ত কল্পনায় বাতুড়বাগানের অপরিচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণ গলিটি ক্রমে কাব্যে বর্ণিত রেবা-সিপ্রা ও বেত্রবতী-তটবর্তিনী অবন্তী-বিদিশা বা উজ্জয়িনী নগরীর বিশাল রাজপথের মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠল। এই সেই গলির একপ্রান্তে ভাড়াটে বাড়ির ক্ষুদ্র গৃহকোণবাসিনী সামান্য শৈলবালা ধীরে ধীরে সংস্কৃত সাহিত্যের মহীয়সী নায়িকাদের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেল।

শিবনাথের মনে হলো, ঋষি কণ্বের আশ্রমে এই ছিল সেই তন্বী শকুন্তলা, বল্কলবসনেও যিনি শৈবালানুবিদ্ধ রম্য সরসিজের ন্যায় অধিক মনোজ্ঞা। তিনি কল্পনা করলেন,

ধ্যানমগ্ন মহেশের পদপ্রান্তে প্রণতিবিনতা এই সেই পর্যাপ্ত যৌবনপুঞ্জে অবনমিতা উমা, অঙ্গে যাঁর অরুণার্করক্তিম বসন, কর্ণে যাঁর চূতপল্লব, অলকে যাঁর নবকর্ণিকার।

বরষার ভরা নদীর মতো শিবনাথের তরুণ হৃদয় শৈলবালার প্রতি গভীর অনুরাগে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

প্রকৃতি বিচারে মানুষকে নাকি সাধারণতঃ দুটি বিশেষ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক,—যারা হৃদয়ের দ্বারা চালিত। দুই,—যারা মস্তিষ্কের দ্বারা। কিন্তু সংসারে এই দুই শ্রেণীর বাইরে আরও এক জাতের লোক আছে। তাদের ভাবাবেগ অত্যন্ত প্রখর, অথচ বিচারবুদ্ধিও কম সচেতন নয়।

ইতঃ নষ্ট এবং ততঃ ভ্রষ্ট দলের এই হতভাগ্যেরা না উপভোগ করতে পায় দুঃসাহসিকতার স্বল্পায়ু আনন্দ, না খুশি হয় হিসেবী বুদ্ধির সনাতন নিরাপত্তায়। এরা ইমোশানের স্রোতে ভেসে যেতে শঙ্কিত; অথচ ইন্টেলেক্টের ঘাটে বসে থেকেও তৃপ্ত নয়। অনুভূতি ও বুদ্ধিবৃত্তির নিরন্তর অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়িত মানুষের দলে ছিলেন শিবনাথ। তাঁর অদৃষ্টে দুঃখভোগ অবধারিত।

আর্থিক বা সামাজিক কোনো দিক দিয়েই শিবনাথ ও শৈলবালার দুই পরিবার সমপর্যায়ে নয়। এমন কি, তাদের জাত পর্যন্ত বিভিন্ন। সুতরাং পরিণয়ের মধ্য দিয়ে শিবনাথের প্রেম যে তার চরম ও সার্থক পরিণতি লাভ করবে প্রচলিত সামাজিক রীতিতে তার সম্ভাবনা মাত্র ছিল না।

নিজ হৃদয়াবেগের এই অবশ্যম্ভাবী নিষ্ফলতার কথা শিবনাথের অজ্ঞাত ছিল না। অথচ শৈলবালার প্রতি আপন তরুণ হৃদয়ের সুতীব্র আকর্ষণ দমন করাও তাঁর পক্ষে সাধ্যাতীত। এক দিকে যুক্তিহীন হৃদয়াবেগ ও অন্য দিকে সতর্ক বুদ্ধির বিচার বিশ্লেষণ,—নিজ মনের এই দুই বিপরীতধর্মী ভাবধারার পীড়নে শিবনাথ যখন ক্ষত-বিক্ষত, তখন হঠাৎ একদিন জানতে পারলেন, রং শুধু তাঁর একার মনেই লাগে নি। বসন্তের যে-যাদুমন্ত্র তরুশাখাকে পল্লবিত করেছে, সে লতার গ্রন্থিতেও মুকুল ফোটাতে ছাড়ে নি।

গৃহে গৃহিণী না থাকায় এত কাল শৈলবালার বাড়ন্ত গড়ন ও বিবাহে বিলম্ব সম্পর্কে পাড়ার আর পাঁচ জন হিতৈষিণী মহিলার গভীর উৎকণ্ঠার কথা বাচস্পতি মশায়ের কানে এসে পোঁছয় নি। তাই যে-দিন তাঁর এক আত্মীয় পত্রযোগে তাঁকে এ-বিষয়ে বিস্তর তিরস্কার ও প্রচুর উপদেশ বিতরণ করলেন, সে-দিন বৃদ্ধ অধ্যাপকের প্রথম খেয়াল হলো,—তাই তো, মেয়েকে তো পাত্রস্থ করা দরকার। কিন্তু তার উপায়টা জানা না থাকায় প্রথম যার সঙ্গে দেখা সেই শিবনাথকেই জিজ্ঞাসা করলেন।

চমকিত শিবনাথ বিবর্ণ হয়ে অস্পষ্ট উচ্চারণ ও অসংলগ্ন উক্তি দ্বারা অনেক চেষ্টায় যা বললেন, তার মোটামুটি ভাবার্থটা এই যে, অতঃপর তাঁর পরিচিত মহলে শৈলবালার যোগ্য পাত্র কেউ আছে কিনা সন্ধান করে দেখবেন।

সে-সন্ধ্যায় চন্দ্রাপীড়ের উপাখ্যান অধ্যাপকের ব্যাখ্যায়

যথেষ্ট প্রাঞ্জল হলো না এবং বাণভট্টের সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ শব্দগুলির মধ্যে বিক্ষিপ্তচিত্ত ছাত্রটি বারংবার কেবলই হোঁচট খেয়ে পড়তে লাগল। গৃহকোণে অপর প্রাণীটির নিয়মিত উপস্থিতিতেও সেই প্রথম ব্যত্যয় দেখা গেল।

পাঠশেষে শিবনাথ যখন বাড়ি ফেরেন, প্রত্যহই শৈলবালা প্রদীপ হাতে অন্ধকার সিঁড়িটায় পথ দেখিয়ে দেয়। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না।

শিবনাথ শৈলবালাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাকে আজ এতক্ষণ দেখি নি যে? এ কী, তোমার মুখ এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন? কোনো অসুখ-বিসুখ করেনি তো?"

শৈলবালা তার দুই চক্ষু শিবনাথের পানে বিস্ফারিত করে রুদ্ধশ্বাসে বলল, "কেন আপনি আমাকে এখান থেকে তাড়াতে চাইছেন? আমি আপনার কী ক্ষতি করেছি?"

বিস্মিত শিবনাথ বললেন, "আমি তোমাকে তাড়াবার চেষ্টা করছি! সে কী! কৈ, আমি তো—"

"করছেন না তো কী? বাবার সঙ্গে এতক্ষণ কিসের পরামর্শ করছিলেন?"

শিবনাথ বললেন, "পরামর্শ কোথায়—ওঃ, সে তোমার বিয়ের কথা যা হচ্ছিল—তা, মানে, তোমার বিয়ে—সে তো ভালোই—এ কী তুমি কাঁদছ?" বলে শিবনাথ ডান হাতের তর্জনী দিয়ে শৈলবালার আনত চিবুকটি তুলে ধরতে চেষ্টা করলেন।

শৈলবালা এক পা পিছিয়ে আঁচল দিয়ে চক্ষু মার্জনা

নিজ হৃদয়াবেগের এই অবশ্যম্ভাবী নিষ্ফলতার কথা শিবনাথের অজ্ঞাত ছিল না। অথচ শৈলবালার প্রতি আপন তরুণ হৃদয়ের সুতীব্র আকর্ষণ দমন করাও তাঁর পক্ষে সাধ্যাতীত। এক দিকে যুক্তিহীন হৃদয়াবেগ ও অন্য দিকে সতর্ক বুদ্ধির বিচার বিশ্লেষণ,—নিজ মনের এই দুই বিপরীতধর্মী ভাবধারার পীড়নে শিবনাথ যখন ক্ষত-বিক্ষত, তখন হঠাৎ একদিন জানতে পারলেন, রং শুধু তাঁর একার মনেই লাগে নি। বসন্তের যে-যাদুমন্ত্র তরুশাখাকে পল্লবিত করেছে, সে লতার গ্রন্থিতেও মুকুল ফোটাতে ছাড়ে নি।

গৃহে গৃহিণী না থাকায় এত কাল শৈলবালার বাড়ন্ত গড়ন ও বিবাহে বিলম্ব সম্পর্কে পাড়ার আর পাঁচ জন হিতৈষিণী মহিলার গভীর উৎকণ্ঠার কথা বাচস্পতি মশায়ের কানে এসে পৌঁছয় নি। তাই যে-দিন তাঁর এক আত্মীয় পত্রযোগে তাঁকে এ-বিষয়ে বিস্তর তিরস্কার ও প্রচুর উপদেশ বিতরণ করলেন, সে-দিন বৃদ্ধ অধ্যাপকের প্রথম খেয়াল হলো,—তাই তো, মেয়েকে তো পাত্রস্থ করা দরকার। কিন্তু তার উপায়টা জানা না থাকায় প্রথম যার সঙ্গে দেখা সেই শিবনাথকেই জিজ্ঞাসা করলেন।

চমকিত শিবনাথ বিবর্ণ হয়ে অস্পষ্ট উচ্চারণ ও অসংলগ্ন উক্তি দ্বারা অনেক চেষ্টায় যা বললেন, তার মোটামুটি ভাবার্থটা এই যে, অতঃপর তাঁর পরিচিত মহলে শৈলবালার যোগ্য পাত্র কেউ আছে কিনা সন্ধান করে দেখবেন।

সে-সন্ধ্যায় চন্দ্রাপীড়ের উপাখ্যান অধ্যাপকের ব্যাখ্যায়

যথেষ্ট প্রাঞ্জল হলো না এবং বাণভট্টের সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ শব্দগুলির মধ্যে বিক্ষিপ্তচিত্ত ছাত্রটি বারংবার কেবলই হোঁচট খেয়ে পড়তে লাগল। গৃহকোণে অপর প্রাণীটির নিয়মিত উপস্থিতিতেও সেই প্রথম ব্যত্যয় দেখা গেল।

পাঠশেষে শিবনাথ যখন বাড়ি ফেরেন, প্রত্যহই শৈলবালা প্রদীপ হাতে অন্ধকার সিঁড়িটায় পথ দেখিয়ে দেয়। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না।

শিবনাথ শৈলবালাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাকে আজ এতক্ষণ দেখি নি যে? এ কী, তোমার মুখ এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন? কোনো অসুখ-বিসুখ করেনি তো?"

শৈলবালা তার দুই চক্ষু শিবনাথের পানে বিস্ফারিত করে রুদ্ধশ্বাসে বলল, "কেন আপনি আমাকে এখান থেকে তাড়াতে চাইছেন? আমি আপনার কী ক্ষতি করেছি?"

বিস্মিত শিবনাথ বললেন, "আমি তোমাকে তাড়াবার চেষ্টা করছি! সে কী! কৈ, আমি তো—"

"করছেন না তো কী? বাবার সঙ্গে এতক্ষণ কিসের পরামর্শ করছিলেন?"

শিবনাথ বললেন, "পরামর্শ কোথায়—ওঃ, সে তোমার বিয়ের কথা যা হচ্ছিল—তা, মানে, তোমার বিয়ে—সে তো ভালোই—এ কী তুমি কাঁদছ?" বলে শিবনাথ ডান হাতের তর্জনী দিয়ে শৈলবালার আনত চিবুকটি তুলে ধরতে চেষ্টা করলেন।

শৈলবালা এক পা পিছিয়ে আঁচল দিয়ে চক্ষু মার্জনা

করে বলল, "আমার ভালো ভেবে আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আপনার যদি আমাকে দেখলেই দুশ্চিন্তা ঘটে, তবে বরং এখানে আর পড়তে আসবেন না।"

শিবনাথ বিস্মিত হলেন। এ তো সঙ্কুচিতা, অপরিণতবুদ্ধি বালিকার উক্তি নয়! শৈলবালার দিকে ভালো করে আর একবার তাকিয়ে দেখলেন, প্রথম যৌবনোন্মেষ তার দেহকে সুঠাম, কপোলকে আরক্তিম ও দৃষ্টিকে ভাবগম্ভীর করেছে।

শিবনাথের কাছে কিছু আর অস্পষ্ট রইল না। তাঁর প্রণয়-বেদনা নিরর্থক হয় নি, রূপকথার সোনার কাঠির মতো তা তাঁর কল্পলোকের রাজকন্যাকে জাগিয়ে তুলেছে,—এ-কথা জেনে তাঁর সর্বদেহ অপরিসীম পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো।

কিন্তু সে-আনন্দ ক্ষণস্থায়ী। এই নিষ্ফল হৃদয়াবেগ তাঁদের উভয়ের,—বিশেষ করে শৈলবালার—কল্যাণ করবে না, জীবনকে বিড়ম্বিত করবে, এ চিন্তায় শিবনাথ কেবলই ক্লিষ্ট হতে লাগলেন। ঠিক এই সময়ে তাঁর বিয়ের কথা উঠল বিখ্যাত দত্তসাহেবের পরিবারে।

শিবনাথের পিতা বৈকুণ্ঠনাথের অর্থ ছিল যথেষ্ট, কিন্তু মর্যাদা ছিল না আশানুরূপ। মনে মনে এজন্যে তাঁর ক্ষোভ ছিল গভীর। তাই বৈবাহিক সম্পর্কের লিফ্‌টে চেপে তিনি দ্রুত সম্ভ্রান্ত মহলের উপরতলায় উঠতে উৎসুক ছিলেন। দত্তসাহেব কলকাতার অভিজাতমণ্ডলীর একটি স্তম্ভবিশেষ। কোর্ট সার্কুলারে ঘন ঘন তাঁর নাম ছাপা হয়, দৈনিক কাগজে

ইন্টারভিউ। রয়টারের খবরে তাঁর বিলাতে গতিবিধির নিশানা থাকে। বৈকুণ্ঠনাথ পুলকিত হলেন।

পাত্র যিনি, মনের তীব্র অস্বস্তিতে তিনি অস্থির। নিজকে তাড়াতাড়ি যে-কোনো এক জায়গায় শক্ত করে বেঁধে ফেলার ব্যগ্রতায় শিবনাথ প্রায় চোখ বুজেই সম্মতি দিলেন।

এ-দেশে যুবকেরা স্ত্রী ঘরে আনে ঠিকুজির নির্দেশে। বৃদ্ধেরা দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করে বন্ধুদের অনুরোধ উপরোধে। শিবনাথ বিয়ে করলেন আত্মরক্ষার্থে।

ছ'দিন পরেই জানতে পারলেন, এর চেয়ে মারাত্মক ভুল জীবনে আর কখনও করেন নি।

শিবনাথ ভেবেছিলেন, স্ত্রী এসে অধিকার করলেই অবাধ্য হৃদয় আর নিরর্থক চঞ্চল হওয়ার অবকাশ পাবে না। শৈলবালাকে ভোলা সহজ হবে। মূঢ় জানতেন না যে, বাড়ির মতো হৃদয়েরও ভ্যাকেণ্ট পজেশান না দিলে নতুন লোকের সেখানে প্রবেশ অসাধ্য। শোনেন নি যে, মানুষের মনই হলো একমাত্র স্থান, যেখানে বে-আইনী দখলকারীর বিরুদ্ধেও ইজেক্টমেণ্ট স্যুট চলে না।

শিবনাথ যাকে ভালোবাসলেন, তাকে বিয়ে করতে পারলেন না। যাকে বিয়ে করলেন, তাকে ভালোবাসতে পারলেন না। তাদের দুজনেরই দুঃখের কারণ হলেন।

নিজেও সুখী হলেন না।

শিবনাথের বিয়ের কয়েক মাস পরেই অঘোর বাচস্পতির মৃত্যু ঘটল। শৈলবালা চলে গেল কোথায় দূর-সম্পর্কীয়

কোন এক আত্মীয়ের বাড়িতে। শিবনাথ তার আর কোনো সংবাদ বা সন্ধান পেলেন না।

কিন্তু কাছে থেকে যে ছিল দৃষ্টির আনন্দ, দূরে গিয়ে সে হলো চিন্তার সুখ। সামনে যে ছিল কামনার পাত্র, আড়ালে সে হলো ধ্যানের ধন। মলী সেনের পক্ষে কোনো মতেই সম্ভব ছিল না সেই অদৃশ্য প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করা।

সংসারে যে-দুষ্কৃতকারীর নীতিবোধ আছে তার শাস্তি ঘটে দু'দিকে। শিবনাথেরও সর্বাপেক্ষা বড় অসুবিধা ছিল তাঁর আপন বিবেক। তিনি না পারেন সাধারণ অত্যাচারী স্বামীদের ন্যায় হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতায় স্ত্রীর সুখ-দুঃখ সম্পর্কে উদাসীন থাকতে, না পারেন তাঁর প্রতি নিজ অন্যায় আচরণের লজ্জা এড়াতে। অথচ স্ত্রীর যা প্রাপ্য তা দেওয়াও তাঁর সাধ্যের অতীত। অনুপস্থিত শৈলবালার প্রতি এক কল্পিত অথচ সুদৃঢ় আনুগত্য-বোধের দ্বারা উপস্থিত মলী সেনের প্রতি কর্তব্যে তিনি কেবলই বিচ্যুত হতে থাকেন।

শৈলবালা কোন অজ্ঞাত স্থানে কেমন করে জীবন কাটাচ্ছে সে-চিন্তা শিবনাথের মনকে দিবারাত্র আচ্ছন্ন করে রইল। কখনও তিনি কল্পনা করতেন, সে আত্মীয়-পরিজনের সমুদয় অনুরোধ, অনুনয়, তিরস্কার ও লাঞ্ছনা অগ্রাহ্য করে আজও অনূঢ়া জীবন যাপন করছে। নিজ গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে কঠোর পরিশ্রমে দেহ তার দুর্বল, স্বাস্থ্য তার নষ্ট। কিন্তু সেই ক্ষীণকায়া নারী তার উদার হৃদয়ের গোপন মণিকোঠায় আজও শিবনাথের মূর্তিকেই সযত্নে রক্ষা করছে। সেখানে

তাঁর নিত্য আবাহন, নিত্য স্তবস্তুতি পাঠ। নিজের কল্পনায় শৈলবালার সেই অবিচল বিশ্বস্ততার পাশে আপন আচরণ তুলনা করে নিজকে তিনি অবিরত ধিক্কার দেন।

আবার কখনও বা শিবনাথ কল্পনা করেন,—পরের গলগ্রহজীবন থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যে কোনো একজনের স্ত্রী হওয়া ছাড়া হয়তো শৈলবালার আর অন্য গতি ছিল না। তাই অনাকাঙ্ক্ষিত পতিগৃহে দুর্ভাগিনীকে দিনের পর দিন অনিচ্ছুক পত্নীত্বের দায়িত্ব বহন করতে হচ্ছে। বহু আয়াসে নিজের কঠিন হৃদয়বেদনা গোপন করে সংসারের আর পাঁচজন গৃহকর্ত্রীর মতো নিয়মিত সাজিয়ে দিতে হচ্ছে আপিসের রান্না, স্কুলের টিফিন বা রোগীর পথ্য। শৈলবালার বিবাহিত জীবনের সেই দুরূহ ভূমিকা কল্পনা করে শিবনাথের নিজ দুঃখ তুলনায় অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হতো।

এমনি ভাবে, শিবনাথ ও মলী সেন—এই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্মৃতি ও কল্পনায় মিশে শৈলবালা এক দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতের মতো অচল অটল হয়ে রইল। তাকে কেউ অতিক্রম করতে পারল না।

বিবেকের তাড়নায় মাঝে মাঝে মলী সেনের প্রতি মনোনিবেশ করেন শিবনাথ। চেষ্টা করেন তাঁকে নিজ অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করতে। সে-প্রয়াস সফল হয় না। সে-দোষ সবটা শিবনাথের নয়, মলী সেনেরও নয়।

জন্মগত সংস্কার ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার ফলে যে-দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব শিবনাথ লাভ করেছেন, তার সঙ্গে

স্ত্রীর ধ্যান, ধারণা ও আচার-আচরণের মিল নেই। মলী সেন শৈশবে ন্যানি, কৈশোরে মেট্রন ও যৌবনে গভর্নেসের হাতে মানুষ হয়েছেন। পটলডাঙ্গার সেন-পরিবারে তাঁর রীতি-নীতি নিতান্তই সঙ্গতিহীন। যেন ধুতির সঙ্গে টেইলস্, কোর্মা-কারীর সঙ্গে পলতার ঝোল। শিবনাথ ও মলী সেনের অভিভাবকেরা এ-কথাটা ভুলে ছিলেন যে, গরুর গাড়ির সঙ্গে প্যাকার্ড ক্লিপার জুড়ে দিলে আর যাই হোক, আরোহীদের যাত্রাগতি স্বচ্ছন্দ হয় না।

শিবনাথের এক বন্ধু এসে বলল, মায়া-সিনেমায় কি একটা ভালো ছবি হচ্ছে। শিবনাথ আপিস থেকে ফোন করে স্ত্রীকে বললেন, যথাসময়ে তৈরী হয়ে থাকতে।

স্বামীর কাছ থেকে এই সামান্য সহৃদয়তার ইঙ্গিতটুকু মলী সেনের হৃদয়কে স্পর্শ করল। তিনি খুশিতে চঞ্চল হয়ে বললেন, "ওঃ, হাউ নাইস। কিন্তু বাংলা সিনেমায় গিয়ে কী হবে? আটত্রিশ বছরের হাতির মতো মোটা নায়িকা পঞ্চাশ বছরের ভুঁড়িওয়ালা নায়কের সঙ্গে গান গেয়ে গেয়ে প্রেম করবে। সিকেনিং। তার চাইতে চলো এম্পায়ারে।"

শিবনাথের উৎসাহ নিমেষে অন্তর্হিত হলো। ইংরেজী ছবিতে শিবনাথের তেমন রুচি নেই। চোখ বুজে ওষুধের বড়ি গেলার মতো স্ত্রী নিয়ে গেলেন সিনেমায়—

সেখানে দেখা হলো ব্যারিস্টার অশোক নন্দীর সঙ্গে। মলী সেনের পুরানো বন্ধু। ইণ্টারভ্যালের সময় সে এসে জিজ্ঞাসা করল, "হাউ এ্যাবাউট এ ড্রিঙ্ক।"

মলী সেন যতোই এড়াতে চান, সে ততোই নাছোড়বান্দা। শেষটায় অগত্যা রাজী হতে হয়। তিন জন সিনেমার বারে এলে অশোক নন্দী শিবনাথের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "হোয়াটস্ ইওর পয়জন?"

বেচারা শিবনাথ এ-সব বিলাতী রসিকতার অর্থ জানেন না। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকেন।

মলী সেন তাড়াতাড়ি বললেন, "আমাদের দুজনেরই সফট্।"

"ডোন্‌ট বি এ্যাবসার্ড!" বলে অশোক বেয়ারাকে হুকুম করল, নিজের জন্যে একটা হুইস্কি অ্যাণ্ড সোডা। হ্যাঁ, বড়া। আর মলী সেনের জন্য শেরী। শিবনাথকে বহু পীড়াপীড়িতেও লেমন স্কোয়াসের উপরে তোলা গেল না।

অশোক শিবনাথের নিম্বুপানি নিয়ে দু'চারটে ঠাট্টার চেষ্টা করল। কিন্তু বিরসবদন শিবনাথ হাইটেন্‌শন ইলেকট্রীক ক্যাবলের মতো সক্রোধে অন্তর্দাহ নিয়ে বসে রইলেন নিরুত্তর। এ-সব চপল আলাপ, লঘু কৌতুক ও অপরিচিত রীতি-নীতি তাঁর কাছে অত্যন্ত অসার ও অন্তঃসারহীন চরিত্রের সুস্পষ্ট লক্ষণ মনে হলো। বিশেষ করে, স্ত্রীর এই প্রকাশ্যে মদ্যপান তাঁর মনকে গভীর বিরক্তিতে ভরে দিল।

মলী সেন বুঝলেন, স্বামী খুশি হন নি। কিন্তু কারণ খুঁজে পান না। ড্রিঙ্ক সম্পর্কে তাঁর নিজের বিশেষ

কোনো আসক্তি নেই। কিন্তু তার একবিন্দু উদরে গেলেই ধর্ম নষ্ট হয়—এমন অনুশাসনও মানেন না। তাঁদের সমাজে উৎসবে, নিমন্ত্রণে মেয়েরা সবাই একটু-আধটু পোর্ট, শেরী বা ভার্মুথ পান করেন, এ তিনি জ্ঞান হওয়া অবধিই দেখে আসছেন। এ নিয়ে এত অনর্থ করার কী আছে? শিবনাথের এত গোঁড়ামিরই বা মানে কী? অশোকের এত অনুরোধের পরেও নিজের জেদ বজায় রাখা তাঁর উচিত হয় নি, এ-কথা কিন্তু তাঁকে মানতেই হবে।

অপরাহ্ণ বেলায় স্বামী-স্ত্রীর সান্নিধ্যটুকু যতখানি আনন্দের সম্ভাবনা নিয়ে সুরু হয়েছিল, সন্ধ্যা বেলায় চতুর্গুণ তিক্ততায় তার পরিসমাপ্তি ঘটল।

বাইশে মাঘ শিবনাথের জন্মদিন। দোকানে বেরোবার সময় মলী সেন তাঁকে সে-কথা মনে করিয়ে দিয়ে বিকেলে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার অনুরোধ করলেন।

শিবনাথের ভালো লাগল। একজনের জন্মদিনের কথা অন্ত আর একজন স্মরণ করে রেখেছে, এ-তথ্যটুকু মনকে খুশি করে।

সন্ধ্যায় গৃহে ফিরে শিবনাথ দেখলেন, মস্ত উৎসবের আয়োজন, বিরাট ভোজের ব্যবস্থা, প্রচুর জনসমাগম।

ঘরের সিলিং থেকে ঝুলছে নানা রঙের জাপানী লণ্ঠন! টিপায়ের উপর জড় হয়ে আছে নানা জনের লেখা ইংরেজীতে শুভকামনার চিঠি ও টেলীগ্রাম। উর্দি-পরিহিত ফারপোর বেয়ারারা পরিবেশন করছে

নানাবিধ সুস্বাদু ভোজ্য ও পানীয়। এক কোণের টেবিলে মলী সেনের দেওয়া সুদৃশ্য প্রেজেন্ট। সাহেবী দোকান থেকে কেনা দামী টয়লেট কেস। তাতে সবুজ ফিতায় বাঁধা কার্ডে ইংরেজীতে লেখা,—মেনি হ্যাপি রিটার্নস।

শিবনাথ কিছুমাত্র প্রসন্ন হলেন না। মনে পড়ল আগেকার এমন একটি জন্মদিনের স্মৃতি। সন্ধ্যা বেলায় মেজেতে কার্পেটের আসন বিছিয়ে শৈলবালা তাকে খেতে দিয়েছিল নিজ হাতে প্রস্তুত সাধারণ অন্ন-ব্যঞ্জন। সব শেষে ছোট পাথরের বাটিতে নলেন গুড়ের পায়েস—জন্মদিনের অবর্জনীয় উপচার। তাঁকে উপহার দিয়েছিল একটি রুমাল। তার এক কোণে রেশমের সুতায় কাজকরা শিবনাথের নামের ইংরেজী আদ্য অক্ষরটি।

সে-দিনের উৎসবে তার উপলক্ষ্য ও উদ্যোক্তা ছাড়া বাইরের তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশাধিকার ছিল না। সে-দিনের আহার্য স্নেহের দ্বারা ধন্য এবং উপহার প্রিয়হস্তের চিহ্ন দ্বারা মহার্ঘ্য ছিল। আন্তরিকতায় স্নিগ্ধ ও প্রীতিতে পূর্ণ সেই সামান্য অথচ সুষ্ঠু আয়োজনের কাছে আজিকার বহু আড়ম্বরপূর্ণ এই হট্টগোলকে অপব্যয়প্রবণ বিকৃতরুচির উৎকট নিদর্শন মনে হলো। যেন শ্যামলীর পাশে আগরওয়ালা ম্যানসন্। যেন সুরবাহারের কোমল আলাপের কাছে হোটেলের উচ্চরব জ্যাজ ব্যাণ্ড।

হায়, মলী সেনের কোনো কাজ শিবনাথের রুচিকর হয় না, কোনো সেবায় মিলে না স্বাদ। শিবনাথের

কোনো আচরণে মলী সেন পান না সন্তোষ, কোনো কথায় পান না প্রীতির আভাস।

মলী সেন ও শিবনাথের শয্যা পৃথক। স্বামী দোকানের হিসাবপত্রের খাতা পরীক্ষা করে অনেক রাত্রিতে যখন শুতে আসেন, স্ত্রী তখনও একক শয্যায় জেগে প্রতীক্ষা করেন। প্রত্যাশা করেন একটু মধুর আহ্বান, একটু নিবিড় স্পর্শ, একটু সোহাগ-সম্ভাষণ। রাতের পর রাত সে-আশা বিফল হয়। সে-নিশিজাগরণ বৃথা যায়।

মলী সেন কল্পনাও করতে পারেন না যে, দুটি পাশাপাশি শয্যার মধ্যবর্তী কয়েক হস্ত পরিমিত ফাঁকের মধ্যে দুস্তর পারাবারের মতো বিরাজ করছে অদৃশ্য শৈলবালার অবিস্মরণীয় স্মৃতি। তাকে শিবনাথ কোনোদিন লঙ্ঘন করতে পারলেন না।

শিবনাথদের বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে শব নিয়ে যায় শ্মশানে। একদা গভীর নিশীথে শবযাত্রীদের কণ্ঠে বিকট হরিধ্বনি শুনে মলী সেনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। অন্ধকার গৃহে একা বিছানায় তাঁর ভয় হতে লাগল। তাড়াতাড়ি উঠে শিবনাথের শয্যায় এসে শুলেন। নিজের ডান হাত দিয়ে শিবনাথকে বেষ্টন করে ভীতি অপনোদনের চেষ্টা করলেন।

স্ত্রীর স্পর্শে শিবনাথেরও নিদ্রা ভঙ্গ হয়েছিল। আপন বক্ষের উপর স্ত্রীর সুগোল সুকুমার বাহুখানি তাঁকে সঙ্কুচিত করল। নিজকে যেন অপরাধী মনে হলো। যন্ত্রচালিতের

মতো যেন নিজের অজ্ঞাতেই ধীরে ধীরে মলী সেনের বাহুটি তিনি পাশে নামিয়ে দিলেন।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো মলী সেন সে-শয্যা পরিত্যাগ করে নিজের বিছানায় ফিরে এলেন। শিবনাথের শয্যার অংশ গ্রহণের যে অন্য আর একটা অর্থ হতে পারে সে-কথা উপলব্ধি করে লজ্জায় ও ক্ষোভে তিনি মৃত্যুকামনা করলেন। ছিঃ ছিঃ! শিবনাথ তাঁকে কী মনে করলেন! তিনি যে শুধু অন্ধকারে ভয় পেয়েই শিবনাথের পাশে গিয়েছিলেন, সে-কথাটা চেঁচিয়ে তাঁকে জানিয়ে দিতে ইচ্ছা করল মলী সেনের।

শিবনাথও অনুতপ্ত হলেন। স্ত্রী যে ভীত ও সচকিত হয়ে তাঁর শয্যায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তাঁর অকারণ রূঢ়তায় অপমানিত ও ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে গেলেন এই কথা ভেবে শিবনাথের অনুশোচনা হলো। তিনি মাথার কাছের আলোটা জ্বেলে দিয়ে সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কী ভয় করছে? আলোটা জ্বেলে রাখব?"

নিজের বালিশে মুখ ঢেকে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মলী সেন বলে উঠলেন, "না, না, আমার একটুও ভয় করছে না। তোমাকে কিছু করতে হবে না।"

আর কী বলবেন ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইলেন শিবনাথ। তার পর বোধ হয় নিজের মুখ-ভাব গোপন করার উদ্দেশ্যেই আলোটা নিবিয়ে দিলেন।

পরদিন নিজের শয্যা মলী সেন অপসারিত করলেন পার্শ্ববর্তী কক্ষে।

দিনের পর দিন গেল কেটে। বছরের পর বছর হলো গত। শিবনাথ ও মলী সেনের হৃদয়ে কোনো যোগাযোগ ঘটল না। একজন রইলেন শিলার মতো অসাড়। অন্য জন রইলেন হিমের মত শীতল। এবং উভয়ের মিলিত সত্তা রইল মরুর মতো ঊষর।

শিবনাথ ধীরে ধীরে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন আপিসের কাজের মধ্যে। মলী সেন আপনাকে ছড়িয়ে দিলেন ক্লাবে, পার্টিতে, পিক্‌নিকে।

দুজনেই জীবন সম্পর্কে হলেন ভগ্নআশ, স্বপ্নহীন, বীতস্পৃহ।

অহর্নিশ শিবনাথ ভাবেন, মৃত্যুর আর বাকী আছে কত?

মলী সেন ভাবেন, মৃত্যুর আর বাকী আছে কী?

সজ্জাকক্ষের অভ্যন্তরে মলী সেন ও শিবনাথ যখন তাঁদের অভিশপ্ত জীবনের শোকাবহ ব্যর্থতাকে আর একবার নতুন করে উপলব্ধি করছিলেন, রঙ্গমঞ্চের অপর প্রান্তে বীরেশ্বর ও নিখিল তখন মঞ্চসজ্জার বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনায় রত।

দৃশ্যপট এবং আলোক-সম্পাতের সুষ্ঠু সমন্বয়ের উপরেই নির্ভর করে মঞ্চসজ্জার সৌকুমার্য। তাঁদের কাজের এই ঘনিষ্ঠ

যোগাযোগের ফলে বীরেশ্বর ও নিখিলকে ঘন ঘন আলাপ ও পরামর্শ করতে হয়।

স্টেজে প্রথম দৃশ্যটি সেট করা হয়ে গেছে। শুধু পটোত্তোলনের অপেক্ষা।

মলী সেনের মতো নিখিলেরও নাটকের সুরুতেই পার্ট। তিনি ইন্দ্রজিতের পোষাক পরে প্রস্তুত। পরবর্তী দৃশ্যের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কী যেন দু'একটা খুঁটিনাটি নিয়ে কথা বলছিলেন বীরেশ্বরের সঙ্গে।

সত্যসিন্ধু এসে বললেন, "রয় সাহেব, ক্ষমা প্রার্থনা করতে এলেম।"

নিখিল বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ক্ষমা প্রার্থনা? আমার কাছে? কী জন্যে?"

"অত্যন্ত আগ্রহ সত্ত্বেও আপনাদের অভিনয়ের শেষ অবধি থাকা সম্ভব হবে না। একটা টাইফয়েডের কেস আছে বেহালায়। আমি মিনিট পনর-কুড়ি পরে চলে যাব। ত্রুটি মার্জনা করতে হবে।"

"ত্রুটি কিসের? আমাদের নাটক এমন কিছু নয় যে, সবাইকে শেষ অবধি দেখতেই হবে।"

"কথাটা বড় মিথ্যে নয়; শেষ দৃশ্য অবধি ভালো অভিনয় সখের থিয়েটারে খুব কমই হয়।" বললেন বীরেশ্বর।

নিখিল বললেন, "আমার তো এই প্রথম; আগে কখনও অভিনয় করি নি। বেশ নার্ভাস বোধ করছি। ভয় হচ্ছে, অডিটরিয়াম থেকে হাততালি দিয়ে বসিয়ে না দেয়।"

"তালি বাজানো ছাড়া হাতের আর দু'চারটে মারাত্মক ব্যবহারও আছে যে!" কৌতুকভরে মন্তব্য করলেন বীরেশ্বর।

তিনজনই একসঙ্গে উচ্চ হাস্য করলেন।

সত্যসিন্ধু বললেন, "না, না, মিছে ঘাবড়াচ্ছেন কেন? মিসেস মলী সেনের প্রডাক্‌শনে লরেন্স অলিভিয়র বা শিশির ভাদুড়ীকে দেখার প্রত্যাশা নিয়ে কেউ আসে না। টিকিট যারা কেনে, তারা জানে দুর্গতদের সাহায্যের জন্যে অভিনয়, ব্যবসা হিসেবে নয়।"

"কিন্তু নায়িকার পার্টটা কোনো ব্যবসাদারী থিয়েটারের চাইতে খারাপ হবে, এ-কথা ভাববেন না যেন, ডক্টর ঘোষ। রিহার্সেলে যতটুকু দেখেছি, মঞ্জুশ্রীর ভূমিকায় মিসেস সেনের চাইতে আর কেউ ভালো করতে পারবে, আমার মনে হয় না। আশ্চর্য ক্ষমতা। মনে হয়, যেন বিলেতী সিনেমার নামকরা অভিনেত্রীদেরও হার মানাতে পারেন।" দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন নিখিল।

"আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত, মিস্টার রয়। অভিনয়ে মিসেস সেনের জুড়ি মেলা ভার।" সত্যসিন্ধু বললেন। তাঁর অধরপ্রান্তে একটুখানি হাসির রেখা দেখা গেল কি? কী জানি! স্পষ্ট বোঝা গেল না।

বীরেশ্বর বললেন, "শুধু অভিনয়ে নয়, অর্গ্যানাইজিং এবিলিটিও আশ্চর্য। এ-রকম একটা বৃহৎ ব্যাপার, কত তার ঝামেলা, কত তার স[illegible] সমস্তই একা সামলাচ্ছেন।"

"এই দলাদলির দেশে এতগুলি ছেলেমেয়েকে দিয়ে এক

সঙ্গে কিছু করানোটাই কি সহজ কথা? আমি তাঁকে যত জানছি ততই অবাক হচ্ছি। বাস্তবিক, অসাধারণ মহিলা মিসেস সেন।” সশ্রদ্ধ প্রশংসায় মন্তব্য করলেন নিখিল।

“ঠিক কথা, রয় সাহেব। তবে এ-বিষয়ে আপনার খুব ওরিজিন্যালিটি আছে ভেবে যেন গর্বিত হবেন না। মিসেস সেন সম্পর্কে ইতিপূর্বে আরও দু’এক জনের এ-রকম মনে হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত জানলেই জানা যায় যে, আগের জানাটা কত সামান্য। কিন্তু এ-প্রসঙ্গ এখন থাক। অল্প আলোচনায় এমন সংক্ষিপ্ত প্রশস্তি দ্বারা মিসেস সেনের বিবিধ গুণগ্রামের প্রতি যথেষ্ট সুবিচার হবে না। এপিকের বিষয়বস্তুকে কি সনেটে লেখা যায়?”

নিখিল কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। সত্যসিন্ধু তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, “না মিস্টার রয়, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি আপনার মতের বিরোধিতা করছিনে। সমর্থনই করছি। কপালে ছাপ নেই বলেই চিনতে পারছেন না যে, আপনি আর আমি একই ট্রেনের যাত্রী, একই পার্টির মেম্বর।” বলে সত্যসিন্ধু হাস্য করলেন। সে হাসিতে কিছু কৌতুক, কিছু ব্যঙ্গ আর কিছু বুঝি বা অনুকম্পার আভাস ছিল।

নিখিল কী বলবেন, ভেবে না পে''। চুপ করেই রইলেন। বীরেশ্বরও কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

ব্যাকুল আর্তনাদে এই নীরবতা ভঙ্গ করে অকস্মাৎ আবির্ভূতা হলেন মান্নামাসি!

"সত্য, আমার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।"

"কেন, কী হয়েছে ?" প্রায় একই সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন সচকিত সত্যসিন্ধু, বীরেশ্বর ও নিখিল।

মান্নামাসি বললেন, "গৌরী গোপনে বিয়ে করেছে।"

"বিয়ে করেছে ? কবে ?" জিজ্ঞাসা করলেন সত্যসিন্ধু।

"আজ। ঘণ্টা কয়েক আগে। দুপুর বেলা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। আমি ভেবেছি, এসেছে এখানে। তা নয়, গিয়েছে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের আপিসে। লুকিয়ে বিয়ে করে এসেছে তিন আইনে।"

"তাই নাকি ! তা বেশ তো, এতে সর্বনাশের কী আছে, মান্নামাসি ? বরটি কে ?"

"এক দোকানী ! একে সর্বনাশ বলব না তো বলব কী ?"

"দোকানী ?"

"হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। শ্যামবাজার না কোথায় যেন খদ্দরের দোকান করে খায়। লবণ তৈরী করে জেল খেটেছে বার দুই। এ-সমস্তই গৌরীর বাপের কৃত কর্মের ফল। ছোকরা ল' কলেজে তাঁরই ছাত্র ছিল। আমাদের বাড়িতে ঘন ঘন আসতো। তিনি খুব পছন্দ করতেন, বলতেন, এমন ভালো ছেলে নাকি আর হয় না। দেশের কাজে তার নিষ্ঠা দেখলে নাকি সকলেরই শ্রদ্ধা হয়। আমি কখনও আমল দিই নি। ভালো না হাতি। অপদার্থের একশেষ। তা না হলে ফার্স্ট ক্লাশে এম. এ.-ল' পাশ করে কেউ কাপড় বেচতে যায় ?"

"গৌরীর সঙ্গে তার পরিচয় অনেক দিনের বুঝি ?"

"হ্যাঁ, তার বাবাই সোহাগ করে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন যে। এক সময়ে তাঁর এমন দুর্বুদ্ধিও হয়েছিল যে, মেয়েকে ঐ হতভাগাটার সঙ্গে মিশে পাড়ায় পাড়ায় স্বদেশী করতে পাঠাবেন। গৌরীরও মনে মনে ঐ রকমই খানিকটা ইচ্ছে ছিল বোধ হয়। শেষে শুধু আমার ভয়েই দুজনে সে-মতলব ছেড়েছিল। কিন্তু এর চাইতে সেও যে ছিল ভালো।"

সত্যসিন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি কিছু জানতেন না? গৌরী যে এ-ছেলেটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে তা কি আগে অনুমান করেন নি?"

"ঘুণাক্ষরেও না। সে যে এমন আহাম্মুকি করতে পারে, তা স্বপ্নেও ভাবি নি কোনোদিন। একটা সামান্য [illegible] কানীর প্রেমে পড়বে আমার মেয়ে, এ যে ধারণার অতীত। ছিঃ, ছিঃ, লোকের কাছে আমি মুখ দেখাব কেমন করে?"

গৌরী মেয়েটি অত্যন্ত লাজুক ধরনের। এত নিরীহ ও নির্জীব যে, তার প্রবল প্রতাপান্বিত মায়ের পাশে সে প্রায় কারো চোখেই পড়ে না। ক্যাঙ্গারুমাতা যেমন আপন বুকের কোটরে সন্তান বহন করে ফেরে, মান্নামাসিও তেমনি তাকে সর্বদা নিজ আঁচলের ঢাকায় ঘিরে রেখে চলতেন। সেও যে কোনো একজন মানুষের মনোহরণ করতে পারে, তাকে ভালোবেসে, জননীর অসন্তুষ্টি অগ্রাহ্য করে গোপনে বিয়ে করার সাহস সঞ্চয় করতে পারে, সত্যসিন্ধু এ-কথা কখনও কল্পনা করেন নি।

ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত সন্দেহ নেই। কিন্তু তা বলে মান্নামাসির এত শোকার্ত হওয়ারই বা মানে কী?

মানেটা মান্নামাসিই বুঝিয়ে দিলেন।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বললেন, "তোমরা তো জানো সত্য, এই মেয়ের বিয়েই ছিল আমার রাত্রিদিনের ধ্যান, জ্ঞান। কী না করেছি তার একটা ভালো বিয়ের জন্যে? মেম রেখে শিখিয়েছি বিলেতী আদব-কায়দা। ক্লাবে মার্কারের কাছে শিখিয়েছি টেনীস। সোসাইটিতে পার্টিতে নিয়ে বেড়িয়েছি, যাতে বড় ঘরের ছেলের সঙ্গে চেনা-জানা হয়। হায়, হায়, এই তার পরিণতি! শেষকালে আমার জামাই হলো একটা কুল-শীল-হীন দোকানদার! হতভাগা মেয়ের গলায় দেয়ার কি দড়ি জুটল না?" চোখ দিয়ে তাঁর জল ঝরতে লাগল।

চোখ মুছতে মুছতে বললেন, "জীবনে কোনোদিন সুখী হতে পারলেম না। ছেলে-মেয়েরা বাপের স্বভাব পাবে না তো পাবে কার? বেঁচে থাকতে তাঁকে নিয়ে অশান্তির অবধি ছিল না। মরার পরে তাঁর মেয়েকে নিয়েও দুঃখ পাব চিরকাল। এই আমার বিধিলিপি!"

সহানুভূতির স্বরে সত্যসিন্ধু বললেন, "না মান্নামাসি, দুঃখ কিসের? গৌরী তার নিজের মনোনীত পাত্রকে বিয়ে করেছে; তাতে ক্ষতি কী? তাঁকে নিয়ে সে যদি সুখী হয়, তবে আমাদের খেদ কেন? আপনি প্রসন্নমনে তাঁদের দুজনকে গ্রহণ করুন, ভগবানের কাছে তাঁদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করুন।"

ক্রুদ্ধকণ্ঠে জবাব দিলেন মান্নামাসি, "কী বললে? তাদের আশীর্বাদ করব? কক্ষণও না। আমি অভিসম্পাত করব। তেমন মা আমি নই। আমার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করে দিয়ে এত বড় আঘাত যে দিল, তা'কে আমি কোনোদিন ক্ষমা করব না।"

এতক্ষণ সত্যসিন্ধুর সঙ্গেই কথা বলছিলেন মান্নামাসি। মনের উত্তেজনায় উপস্থিত অপর ব্যক্তি দুটিকে লক্ষ্যই করেন নি। হঠাৎ নিখিলের দিকে দৃষ্টি পড়তেই মান্নামাসির সমস্ত ক্ষোভ দুর্জয় ক্রোধে পরিণত হলো। তিনি কঠিন কণ্ঠে বললেন,—

"এই যে নিখিল রয়েছ দেখছি এখানে। বলুক সত্যি করে আমি চেষ্টা করেছিলেম কি না। গোড়াতেই যদি বিয়েটা হয়ে যেতো তবে কি গৌরী আজ ঐ অপদার্থ দোকানীটার খপ্পরে পড়ত? না, তখন যে তোমাদের এঞ্জিনীয়র সাহেবের গ্রাহ্যই নেই। কেন, গৌরী কোন অংশে ওর অযোগ্য? তা গ্রাহ্য হবে কেন? বুদ্ধি-শুদ্ধি কি কিছু আর অবশিষ্ট আছে ওর? সবই যে আর একজনের পায়ে বিসর্জন দিয়ে বসে আছেন। লজ্জা করে না? সেই যে বলে, কড়ি দিয়ে কিনলেম, দড়ি দিয়ে বাঁধলেম, হাতে দিলেম মাকু। এখন শুধু ভ্যাঁ করাটুকুই বাকী। শুনছি, মিসেস সেনের বন্ধু বলে নাকি আবার জাঁক করেও বেড়ান। ছিঃ, ছিঃ, বলি আজকালকার ছেলেদের কি ণত্ব-ষত্ব জ্ঞান নেই? তোমরা কি ভাতের বদলে ঘাস খাও?"

রাগে মান্নামাসির যেন আর দিগ্বিদিক জ্ঞান রইল না।

হতবাক নিখিল বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মান্নামাসির পানে। তাঁর সেই বিব্রত বিত্রস্ত অবস্থা মান্নামাসির মনে করুণার বদলে প্রতিহিংসা উদ্রেক করল।

"হুঃ, বন্ধু! তোমার মতো এমন আর ক'ডজন বন্ধু আছে মিসেস সেনের, তার খোঁজ রাখ, গডাচর চণ্ডু? জানো, আর কতজন এর আগে তোমার মতো বন্ধু হয়ে নিজেদের নাক-কান কেটেছে? সত্যসিন্ধুকেই না হয় একবার জিজ্ঞাসা করে দেখো।" প্রায় চীৎকার করে বললেন মান্নামাসি।

সত্যসিন্ধু তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বললেন, "মান্নামাসি, আপনি তো বোধ হয় এখানে অভিনয় দেখতে আর থাকবেন না! বাড়ি যেতে চান তো, আমি গাড়ি করে রেখে আসতে পারি।"

সত্যসিন্ধুর কথায় মান্নামাসি নিজের উত্তেজনা সম্পর্কে সচেতন হলেন। তাই তো, তিনি যে মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন! নিজের অসংযত ভাষণের জন্যে লজ্জিত বোধ করলেন। একটু চুপ করে থেকে সহজ কণ্ঠে বললেন, "না, তোমাকে আর কষ্ট দিতে চাইনে। দয়া করে আমাকে শুধু একটা ট্যাক্সি আনিয়ে দাও।"

"চলুন, আমি ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছি।" বলে বীরেশ্বর মান্নামাসিকে নিয়ে প্রস্থান করলেন।

কিছুক্ষণ সত্যসিন্ধু ও নিখিল দুজনেই চুপ করে রইলেন। তারপর অনেকটা যেন আপন মনেই বললেন সত্যসিন্ধু, "বেচারী মান্নামাসি, আশা করেছিলেন যেমন বিরাট, আশাভঙ্গে আঘাতও পেয়েছেন তেমনি কঠিন।"

নিখিলের কানে এ মন্তব্য আদৌ পৌঁচেছে কিনা তা বোঝা গেল না। তাঁর চিন্তাকুল চেহারা থেকে অনুমান করা শক্ত নয় যে, মান্নামাসির অপ্রিয় ভাষণ তাকে শুধু আঘাত করে নি, বিচলিত ও করেছে।

কিছুটা সঙ্কোচের সঙ্গে নিখিল বললেন, "আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—যদি কিছু মনে না করেন—কথাটা—"

"আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আপনার প্রশ্ন আমি বুঝেছি। দেখুন, মিস্টার রয়, আমি আপনার চাইতে বয়সে বড়, সে-হিসেবে অভিজ্ঞতাও বেশী। আমার কথা শুনুন, সংসারে যার কাছে যতটুকু পাওয়া যায়, তার কাছে ততটুকুর জন্যেই কৃতজ্ঞ থাকা ভালো। না, না, মিস্টার রয়, এ তর্কের কথা নয়, এ অনুভূতির কথা। পাথরের নুড়িকে শালগ্রাম ভেবে যদি অর্ঘ্য দিয়েই থাকেন তাতেই বা ক্ষোভ কিসের? পূজার আনন্দ তো মূর্তিতে নয়, আনন্দ ভক্তের মনে।"

বীরেশ্বর ফিরে এলেন। বললেন, "মান্নামাসিকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে এলেম।"

সত্যসিন্ধু বীরেশ্বরের প্রবেশ বা উক্তি কোনোদিকেই

মনঃসংযোগ না করে নিজের কথারই জের টেনে বললেন,—“হয়তো আমার কথাগুলি অনেকটা সারমোনাইজিং-এর মতো শোনাচ্ছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, মিস্টার রয়, এ আমার নিজ দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা। একদিন আমিও আপনারই মতো মনে মনে দগ্ধ হয়েছি, মানুষের প্রতি, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ করেছি। কিন্তু আজ আমি আমার মনের স্থৈর্য সম্পূর্ণ ফিরে পেয়েছি। সংসারে কারো সম্পর্কে কোনো অভিযোগ নেই আমার।”

নিখিল জিজ্ঞাসা করলেন, “কেমন করে তা সম্ভব হলো?”

“সংসারে অতি নগণ্য ঘটনা থেকেও যে মাঝে মাঝে কী বৃহৎ পরিবর্তন ঘটে, তা আমাদের কল্পনার বাইরে। লালাবাবুর গল্প শুনেছেন হয়তো। সেই যে ‘বেলা গেল’র কাহিনী। এও অনেকটা সে-রকমই। এত অকিঞ্চিৎকর যে, আমার নিজেরই বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে।” বলে সত্যসিন্ধু ক্ষণেক নীরব রইলেন। বোধ করি, স্মৃতির সমুদ্র মন্থন করে আহরণ করলেন পুরাতন কাহিনীর পরিপূর্ণ ইতিহাস। তারপর ধীরে ধীরে বলতে সুরু করলেন,—

“মাস ছয়-সাত আগের কথা। এক সন্ধ্যায় চেম্বারে একটি মহিলা এলেন। রোগী। এমন কতই আসে। ব্যক্তি হিসাবে কারো সম্পর্কেই ডাক্তারের কোনো ঔৎসুক্য থাকে না। কিন্তু এ মহিলাটি অন্য পাঁচজনের চাইতে স্বতন্ত্র। আশ্চর্য বুদ্ধির দীপ্তি তাঁর দৃষ্টিতে, অসাধারণ দৃঢ়তার আভাস তাঁর ভাষণে ও আচরণে। মহিলা

বিবাহিতা। স্বামীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে ঈষৎ হেসে বললেন, 'তাতে তো আপনার রোগ নির্ণয়ে কোনো সাহায্য হবে না।' "

বীরেশ্বর বললেন, "আশ্চর্য তো।"

"হ্যাঁ, সে-জন্যেই বোধ হয়, একটু বিশেষ মনোযোগ দিয়ে চিকিৎসা সুরু করলেম তাঁর। প্রতি দু'হপ্তা অন্তর আসেন তিনি। পুঁথিপত্র ঘেঁটে অনেক যত্নে ব্যবস্থা করি ওষুধের। রোগের উপশম দেখিনে। সন্দেহ হলো, মহিলা নির্দেশ মতো বিশ্রাম নিচ্ছেন না। জিজ্ঞাসা করতে সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, তিনি খেটে খান। আমি আশ্বাস দিলেম, আমাকে ফিজ দিতে হবে না। স্মিত মুখে জবাব দিলেন, 'ডাক্তারকে পয়সা না দিলে ওষুধে উপকার হয় না।' অর্থাৎ বিনীত অথচ সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন, কারো কাছ থেকে অর্থ-সাহায্য নেওয়ার পাত্রী তিনি নন। মাস দুই নিয়মিত এলেন। তারপরে তাঁর আর দেখা নেই।"

নিখিল বললেন, "অন্য কোনো ডাক্তারের কাছে গিয়েছেন বোধ হয়।"

"না, তা নয়। হঠাৎ আজ সকালে তিনি আবার এসেছিলেন। চেহারা দেখেই বুঝলেম, অসুখ কমে নি, বেড়েছে। যথারীতি পরীক্ষার পর মনোভাব যথাসাধ্য গোপন রেখে স্বাভাবিক স্বরে বললেম, 'আপনার স্বামী কিম্বা অন্য আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে একবার—।' তিনি বাধা

দিয়ে শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'আপনার যা বলবার আমাকেই বলতে পারেন।' আমি ইতস্তত: করছি দেখে বললেন, 'আপনি অনর্থক বিব্রত বোধ করবেন না। আমি জানি আমার কী হয়েছে। আপনি কত দিন মিয়াদ মনে করেন?' "

নিখিল মন্তব্য করলেন, "এ্যামেজিং।"

সত্যসিন্ধু বললেন, "প্রশ্নের পাশ কাটিয়ে বললেম—পুষ্টিকর খাদ্য, পরিপূর্ণ বিশ্রাম এবং প্রয়োজনীয় পরিচর্যা পেলে সারতে—সব চেয়ে ভালো হয় কোনো স্যানাটোরিয়ামে, কশৌলী, ধরমপুর কিম্বা—। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাড়িতে থাকলে অন্য লোকের ছোঁয়াচ লাগার আশঙ্কা আছে খুব?' আমি বললেম, তা আছে। মহিলা প্রতিবারের মতো নিয়মিত ব্যাগ থেকে টাকা বের করে পুরো ফিজের টাকাটা রাখলেন আমার টেবিলে। বললেন, 'আপনি আমার যথেষ্ট যত্ন নিয়েছেন, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।' ছোট্ট একটি নমস্কার করে ধীরে ধীরে চলে গেলেন। জানেন মৃত্যুর এত মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, অথচ ভয় বা বিচলনের কিছুমাত্র চিহ্ন নেই আচরণে।"

বীরেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন, "তারপর?"

সত্যসিন্ধু বললেন, "অবিবাহিত ডাক্তারের পক্ষে কোনো মহিলা পেশেণ্ট সম্পর্কে অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশটা বিপজ্জনক। তবুও খোঁজ-খবর নিয়ে যে-সকল বিক্ষিপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করেছি তাদের মধ্যে পূর্বাপর সামঞ্জস্য নেই।

কেউ বলেন, মহিলা কোনো এক মেয়ে স্কুলে শিক্ষয়িত্রী। আত্মীয় পরিজন কেউ কোথাও নেই। নেই যদি তবে সে-কথা বলতে বাধা কী? আবার কেউ বলেন, মহিলার সবাই আছে, স্বামী একজন আর্টিস্ট। আছে যদি তবে সে-কথা গোপন করার প্রয়াস কেন? সত্যি বলছি, মিস্টার রয়, স্বভাবে শান্ত, ব্যবহারে মধুর ও মনোভাবে তেজস্বিনী এই মহিলা আমার কাছে যেন সংকেতহীন এক বিরাট রহস্য।"

নিখিল ও বীরেশ্বর দুজনেই চুপ করে রইলেন।

সত্যসিন্ধু একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, "আমি ডাক্তার। অহরহঃ চোখের সামনে রোগীকে মরতে দেখতে হয়। তাতে বিচলিত হলে চলে না। কিন্তু মৃত্যুকে এমন প্রত্যক্ষরূপে এর আগে যেন কখনও উপলব্ধি করি নি। বোধ হয়, এই অপরিচিতা তাঁর আপন চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিলেন বলেই তাঁর আসন্ন অবধারিত মৃত্যু আমার কাছে ভয়াবহ নির্মমতায় এমন স্পষ্ট হয়ে উঠল। জীবন যে কত ক্ষণিকের এবং মানুষ যে কত অসহায় তা যেন এই প্রথম যথার্থরূপে বুঝতে পারলেম। সে-মুহূর্তেই সংসারের সমস্ত কলহ, বিরোধ, মান, অপমান নিতান্ত তুচ্ছ এবং একান্ত অর্থহীন মনে হলো। কথাটা শুনতে যতই কেন না অবাক লাগুক মিস্টার রয়, আমার রোগী রহস্যময়ী এই মহিলার কাছে আমি সত্যি কৃতজ্ঞ। তিনি আমাকে নতুন জীবনদর্শনের

ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন। তাঁকে আমি চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব।"

সত্যসিন্ধু বিদায় নিতেই ত্রৈলোক্যেশ্বর ছুটে গেলেন টেলীফোনের কাছে। একবার নো-রিপ্লাই ও দু'বার ভুল নম্বরের পর লাইনটা পেলেন।

"হ্যালো, কে কথা বলছ? ও নিধু, মাকে একবার ডেকে দে তো। মা নেই? বেরিয়েছেন? কখন? কখন ফিরবেন বলে যান নি? হেঁটে বেরিয়েছেন কী? ট্যাক্সিতে! খোকন সঙ্গে আছে তো? খোকনকে, কী বললি? খোকনকে আগেই সিনেমা দেখতে পাঠিয়েছেন? হ্যালো, হ্যালো—যাঃ (খট্ খট্ খট্) হ্যালো, হ্যালো মিস—ইয়েস, আই হ্যাভ বিন কাট অফ্। ইয়েস পি-কে, সিক্স-জিরো-নাইন-ডবল থ্রি। হ্যালো, হ্যালো, কে নিধু,—হ্যাঁ আমি। তা, কি বলছিলি তুই? ছোট স্যুটকেশটায় খানকয়েক জামা কাপড় গুছিয়ে নিয়ে গেছেন? কোথায় যাচ্ছেন জিজ্ঞেস করিস নি কেন? জিজ্ঞেস করেছিলি; বেশ। কী বললেন তিনি? কিছু বলেন নি? কী বলছিস শুনতে পাচ্ছিনে। হ্যাঁ, চাবি; চাবির কী হয়েছে? চাবি তোর হাতে দিয়ে গেছেন? আমাকে দেওয়ার জন্যে? হ্যালো, একটু চেঁচিয়ে বল দিকিন।

হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছি। চিঠি? কার চিঠি? আমার? মা লিখে রেখে গিয়েছেন, আমার জন্যে? কোথায় সে চিঠি? টেবিলের উপরে রেখেছিস তো শীগগির নিয়ে এসে খুলে পড় দেখি। ওঃ, তুই তো পড়তে জানিসনে। কী মুস্কিল!"

হতবুদ্ধি বীরেশ্বর কী করবেন ভেবে পেলেন না।

ধীরে ধীরে তাঁর স্মরণ হলো, হ্যাঁ, কিছুদিন থেকে সুবালাকে কেবলই জানালার পাশে ইজিচেয়ারটায় চুপচাপ বসে থাকতে দেখেছেন বটে। সে কী তবে—কী জানি। বীরেশ্বর তো ভেবেছেন স্কুলের খাটুনির পরে সুবালা বিশ্রাম করছেন। কিম্বা কিছু ভাবেনই নি। সদাসর্বদা যাদের দেখা যায় তাদের চেহারার পরিবর্তন স্বভাবতঃই চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু এখন বীরেশ্বরের মনে হতে লাগল, তাই তো, সুবালার চোখে মুখে ইদানীং একটা ক্লান্তি ও অবসাদের ছাপ পড়েছিল যেন।

কিন্তু সুবালা হঠাৎ গেলেন কোথায়?

তার চাইতেও বেশী অবোধ্য বিষয় আছে। কী কারণে সুবালা আপন অসুস্থতার কথা বীরেশ্বরের কাছে এতদিন একবারও উল্লেখ করেন নি? কেন তাঁকে দেন নি আপন দুরারোগ্য ব্যাধির সামান্যতম ইঙ্গিত? কেন নেন নি প্রাত্যহিক শিক্ষকতার অহেতুক পরিশ্রম থেকে অন্ততঃ সাময়িক বিশ্রাম?

মীমাংসাবিহীন দুরূহ সমস্যার মতো সুবালা চিরকাল

বীরেশ্বরের কাছে এক দুর্জ্ঞেয়, দুর্বোধ্য চরিত্র। অভিজ্ঞতার অতীত। পরিচিতির ঊর্ধ্বে।

নিখিল একা বসে ভাবছিলেন মান্নামাসির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ও প্রকাশ্য তিরস্কার।

সংসারটা কি আগাগোড়াই ছলনা? মানুষের মুখগুলি কি সব মুখোশ? এতদিন মিসেস সেনের যে-আচরণকে তিনি সহজাত সৌজন্য মনে করে শ্রদ্ধান্বিত হয়েছেন, সে তবে শুধু একটা পোজ? যাকে সৌহার্দ্য ভেবে পুলকিত হয়েছেন সে তা'হলে নিছক ককেট্রী?

ক্ষোভে ও দুঃখে নিখিলের চোখে সমস্ত পৃথিবীটাই যেন বিবর্ণ মনে হলো। বাস্তবিক, কী নির্বোধ তিনি! মান্নামাসি যে, তাকে ভৎর্সনা করে গেলেন, সে তো অহেতুক নয়। সত্যি, তিনি অবজ্ঞারই পাত্র।

কপট সোহাগ ও কৃত্রিম সখ্যের আবরণে মায়াবিনী সুপরিকল্পিত পন্থায় তাঁকে কেবলই প্রবঞ্চনা করেছে, এই নবলব্ধ ধারণায় মলী সেনের প্রতি নিখিলের মনে প্রবল বিদ্বেষ দেখা দিলো। স্থির ও নিরপেক্ষ চিত্তে তিনি একবারও ভেবে দেখলেন না, মলী সেনের সত্যিকার অপরাধ কোথায় বা কতটুকু। মলী সেনের কাছে তিনি কী প্রত্যাশা করেছিলেন?

কী পান নি? 'আমি প্রতারিত, প্রবঞ্চিত'—শুধু এই কথা মনে করে আহত আত্মাভিমানে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন।

সত্যসিন্ধুর উক্তিগুলি নিখিলের কাছে ছেলেদের কপিবুকের নীতিকথার মতো মনে হলো। হয়তো সত্য, কিন্তু অবাস্তব। জীবনদর্শনের অর্থ কী? তার ইঙ্গিত বলে সত্যসিন্ধু যে-কবিত্ব করে গেলেন তারই বা অস্তিত্ব আছে কোনখানে?

না, ডাক্তার সাহেব, উপদেশের মলমে মনের ক্ষত শুকায় না।

কিন্তু একান্তে বসে আত্মধিক্কৃতির সময় এখন কোথায়? আজ রাত্রির এই উৎসব-আয়োজনের মধ্যে তাঁর মর্মবেদনার তো অবকাশ নেই। যবনিকার এক প্রান্তে প্রেক্ষাগৃহে প্রতীক্ষাকুল অসংখ্য নরনারী, অপর প্রান্তে এই মনোরম দৃশ্যপট, এই উজ্জ্বল দীপালোক, এই সুমধুর আবহ সঙ্গীত, এই জরি-ঝলমল সাজ-সজ্জার সমারোহ। এই স্বপ্নময় পরিবেশে ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়র এন. সি. রয়ের তো কোনো অস্তিত্ব নেই। এই মুহূর্তে তিনি মগধের রাজতনয় ইন্দ্রজিৎ। বিদেশিনী রাজকন্যা মঞ্জুশ্রীর প্রেমের দ্বারে তৃষ্ণার্ত অতিথি।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং করে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বেজে উঠল। অভিনয় আরম্ভের পাঁচ মিনিট পূর্বেকার সঙ্কেতধ্বনি।

"ফাইভ মিনিটস টু কার্টেন; টেক পজিশান, এভরিবডি।" দূর থেকে স্টেজ-ম্যানেজারের কণ্ঠে নির্দেশ শোনা গেল।

নিখিল কালবিলম্ব না করে স্টেজে আপন নির্দিষ্ট স্থানে এসে আসন গ্রহণ করলেন।

গ্রীন-রূমের অপর অংশে নীরজা চলতে চলতে আপন চিন্তাধারায় এমন গভীর নিমগ্ন ছিলেন যে, দুই গজ দূরে থেকেও সত্যসিন্ধুকে দেখতে পান নি। অবশেষে প্রায় তাঁর ঘাড়ের উপর পড়তে পড়তে নিজেকে কোনো মতে সামলে নিয়ে বললেন, "মাপ করবেন, আপনাকে ঠিক—"

সত্যসিন্ধু হেসে বললেন, "ঘুমের মধ্যে হেঁটে বেড়ায় এমন লোককে ইংরেজীতে বলে সম্নাম্বুলিস্ট। জেগে থেকেও স্বপ্নচালিত যারা তাদের জন্যে অন্ততঃ ডাক্তারী শাস্ত্রে কোনো সংজ্ঞা আছে বলে জানিনে। নীরজা, ব্যাপারখানা কী ?"

নীরজা লজ্জিত হয়ে বললেন, "আপনাকে মোটেই দেখতে পাই নি।"

সত্যসিন্ধু কৌতুকজড়িত কণ্ঠে বললেন, "সংসারে ক্ষীণদৃষ্টি শুধু বৃদ্ধেরাই নন। একটা বিশেষ অবস্থায় তরুণ-তরুণীরাও চোখের অসুখে ভোগেন। তখন বিশেষ কোনো ব্যক্তি ছাড়া কারুকে আর চোখেই পড়ে না।"

সত্যসিন্ধুর বলার ভঙ্গিতে নীরজাও হেসে ফেললেন।

বললেন, "তাই না কি? বড় বেয়াড়া অসুখ বলতে হবে, ডক্টর ঘোষ।"

"হ্যাঁ, জটিল তো বটেই। চোখে রঙ্গিন চশমা না পরেও রোগী তখন সব কিছুই রঙ্গিন দেখতে সুরু করে।"

"সে তো শুনেছি জণ্ডিসের লক্ষণ। লীভারের দোষ থেকে হয়। তাদের ধরে ধরে এক কোর্স এমিটিন দিলে হয় না?" কপট ঔৎসুক্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন নীরজা।

সত্যসিন্ধু নীরজার রসবোধ ও বাক্‌চাতুর্যে চমৎকৃত হলেন। সহাস্যে জবাব দিলেন, "না সিস্টার, ডায়াগনোসিসে ভুল আছে। এ-অসুখ লীভার থেকে নয়, হার্ট থেকে। কিন্তু ব্রিটিশ ফারমাকোপিয়ায় ওর ওষুধ লেখা নেই।"

পরিহাসের আবরণে সত্যসিন্ধুর মন্তব্যগুলি যে আলোচনাকে ক্রমশঃই বাস্তবের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে-কথা হৃদয়ঙ্গম করে নীরজা বিব্রত বোধ করলেন। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে বললেন, "আপনার কাছে একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে, ডক্টর ঘোষ। আজকালের মধ্যেই আপনার চেম্বারে একবার যাব ভাবছিলেম।"

সত্যসিন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রয়োজন আমার কাছে? কারো অসুখ-বিসুখ সংক্রান্ত বোধ হয়?"

নীরজা জবাব দিলেন, "না প্রয়োজনটা আমারই।"

সত্যসিন্ধু জিজ্ঞাসু নেত্রে নীরজার পানে তাকালেন।

নীরজা কয়েক সেকেণ্ড নিজের মনে কি যেন চিন্তা

করলেন। তারপর বললেন, "আপনার জানা-শোনা কোনো হাসপাতালে আমার একটা কাজ জুটিয়ে দেন যদি তবে উপকার হয়।"

সত্যসিন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, "মিস্টার রয়ের বাড়িতে যে-কাজ, সে কি শেষ হয়ে গিয়েছে?"

"হ্যাঁ—না—হ্যাঁ—তা এক রকম শেষ বললেও হয়।" ইতস্ততঃ করে বললেন নীরজা।

সত্যসিন্ধুর কাছে বিষয়টা স্পষ্ট হলো না। জিজ্ঞাসা করলেন, "তার অর্থ?"

নীরজা বললেন, "আসলে মিস্টার রয়ের বাড়িতে কাজ সামান্যই। ওঁর পিসিমাকে শুধু একটু দেখাশোনা করা। তিনি অসুস্থ বা নিতান্ত অশক্ত নন। সারা দিনে ঘণ্টা দুই-তিনের বেশী কাজ নেই। নার্স না হয়ে যে-কোনো মেয়েমানুষ হলেই চলে।"

সত্যসিন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, "মিস্টার রয় তাই মনে করেন বুঝি?"

"না, তিনি কিছু বলেন নি।"

সত্যসিন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, "পিসিমা কি খুব দজ্জাল, বদরাগী লোক?"

"না, না। তিনি মাটির মানুষ। আমাকে প্রায় মেয়ের মতোই স্নেহ করেন।" জানালেন নীরজা।

সত্যসিন্ধু কিছুটা সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, "মাইনের কথাটা জিজ্ঞাসা করা অভদ্রতা, তবুও—"

"না, সে-দিক দিয়ে বলার কিছুই নেই। হাসপাতালে চাকরির ডবল টাকা মেলে এখানে।" বললেন নীরজা।

"তবে"?

"অসুবিধা,—মানে—কেন জানিনে, আর ভালো লাগছে না এ-কাজ।" বললেন নীরজা।

"হুঁঃ, বুঝেছি।" বলে অর্থপূর্ণভাবে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন সত্যসিন্ধু।

সত্যসিন্ধুর হাসি ও মন্তব্যে নীরজা সঙ্কোচ বোধ করলেন। চোখ তুলে সত্যসিন্ধুর পানে তাকাতেও যেন লজ্জা হচ্ছিল তাঁর। মাটিতে চোখ রেখে বললেন, "বাঃ রে, এর মধ্যে আর বোঝাবুঝির প্রশ্ন আছে কোনখানে?"

সত্যসিন্ধু পূর্ববৎ সকৌতুক হাস্যে বললেন, "নেই? কী জানি! হবেও বা। এ-সব হৃদয়স্থ তত্ত্বং। সমস্তই নাকি নিহিতং গুহায়াং। থাক। এর চাইতেও বেশী ব্যাখ্যা করলে হয়তো তুমি লজ্জায় একেবারে মাটিতেই মিশে যাবে।"

নীরজা নতদৃষ্টিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর গায়ের রং অমন কালো না হলে কর্ণমূলে রক্তিম আভা নিশ্চয়ই স্পষ্টতর হতো।

সত্যসিন্ধু বললেন, "ভাবছ, ধরলেম কী করে? কেন, সেটা এমন শক্ত কী? যার একটু সামান্য বুদ্ধি আছে, সে-ই অনায়াসে আঁচ করতে পারে। খাটুনি নেই মাইনে দ্বিগুণ, রোগী নির্ঝঞ্ঝাট। এ-চাকরি যাঁর ভালো লাগে না, বুঝতে হবে তাঁর ভালো লাগার অন্য লক্ষ্য আছে। এবং সে-লক্ষ্যে

যে অলক্ষ্যে টান পড়েছে, তা তো তরুণ মনিবটির অবস্থা দেখেই অনুমান করা যায়।" অর্থপূর্ণ হাস্য করলেন সত্যসিন্ধু।

হাসি শেষ হলে কণ্ঠে গাম্ভীর্য ও সহানুভূতি মিশিয়ে সত্যসিন্ধু বললেন,—"নীরজা, আমি তোমারও শুভাকাঙ্ক্ষী। তাই বলছি। জেনে রেখো, সুখের উপরে কোনো জবরদস্তি চলে না। সুতরাং যা পাবার নয়, তা নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে গেলে মান যায়, প্রাণও ভরে না। বোধ হয় হেঁয়ালীর মতো শোনাচ্ছে। আমার মুস্কিলই ঐখানে। ঠাট্টা করে করে এমনই অভ্যাস খারাপ হয়ে গিয়েছে যে, এখন সিরিয়স কথা বলতে গেলেও লোকে সিরিয়সলী নেয় না। কমিক অ্যাক্টরকে হিরোর পার্ট দিলে যে-দশা ঘটে।"

অতি-প্রয়োগে ব্যর্থ হয় দণ্ড, অতি-পীড়নে ভয়। অনুভূতিও অসার হয় অতিরিক্ত দুঃখভোগে। বলা বাহুল্য, সেটা বেদনার অবসান নয়, বেদনার অভ্যাস। ব্যথার অপস্মৃতি নয়,—বিস্মৃতি।

আপন নিষ্প্রেম বিবাহিত জীবনের শোকাবহ ব্যর্থতায় ক্রমশঃ অভ্যস্ত হয়ে মলী সেন তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কেও যেন আর সর্বদা সচেতন ছিলেন না। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মাটি যেমন

কাঠিন্য লাভ করে, দুঃখের দহনে তিনিও তেমনি কঠোর ঔদাসীন্য অর্জন করেছিলেন শিবনাথ সম্পর্কে আপন মনোভাব ও আচরণে। উপশমহীন ব্যাধির প্রতি অভিজ্ঞ চিকিৎসকের নিশ্চেষ্টতার মতো স্বামীর বিমুখতাকেও তিনি তাঁর জাগ্রত অনুভূতি থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন সযত্নে।

আজ সন্ধ্যায় শিবনাথের সঙ্গে এই নূতন সংঘাত মলী সেনকে কঠিনভাবে আহত করল। অতর্কিত আঘাতে বহু পুরাতন ক্ষতস্থান থেকে পুনরায় রক্তক্ষরণের ন্যায়, দীর্ঘদিন পরে নতুন করে ব্যথায় ক্লিষ্ট হতে লাগল তাঁর মন।

শিবনাথের প্রতিটি উক্তি, প্রতিটি মন্তব্য বারংবার পর্যালোচনা করে নির্জন গৃহে ক্রোধে ও বিরক্তিতে দগ্ধ হতে লাগলেন মলী সেন। বিরক্তি নিজেরই প্রতি। আত্মবিস্মৃত হয়ে তিনি যে শিবনাথের কাছে নত হয়েছিলেন, এই কথা মনে করে আপনাকে তিনি আর কিছুতেই ক্ষমা করতে পারলেন না।

জগতে বঞ্চিত হওয়ার মধ্যে আছে দুঃখ। কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় আছে অসম্মান। সেই আত্মবমাননার লজ্জা দুস্তর। প্রাণভিক্ষার চাইতেও প্রেমভিক্ষা গ্লানিকর।

প্রত্যাশাহীন মনের যে উদ্গত ঔদ্ধত্যে এতকাল শিবনাথের অনাদরকে তিনি উপেক্ষা করেছেন, তাতে চিত্তে শান্তি না পেলেও সন্তোষ পেয়েছেন। বিনীত নিবেদন ও কাতর অনুরোধের দ্বারা মলী সেন নিজেকে আজ সেই ন্যূনতম আত্মতুষ্টি থেকেও বিচ্যুত করেছিলেন। নিশ্চিত প্রত্যাখ্যানের

দ্বারা শিবনাথ শুধু যে মলী সেনের সেই ব্যাকুলতাকেই বিফল করলেন তা নয়, তাঁর দীনতাকেও প্রকট করে দিয়ে গেলেন পরিপূর্ণ নগ্নতায়। কোনোখানে তার আর এতটুকু আড়াল বা আবরণ রইল না। ছিঃ ছিঃ।

তৃষ্ণার্ত গরবিনী তাঁর সমুন্নত মঞ্চ থেকে নেমে এসে বিনম্র অঞ্জলি পেতেছিলেন নদীতে। হায়, সেখানে স্রোত বিশুষ্ক। জল মিলল না। অভাগিনীর দু'হাত ভরে উঠল শুধু পাঁক!

বেয়ারা এসে জানাল নিখিলের পক্ষে এখন আসা সম্ভব নয়।

সম্ভব নয়! মলী সেন বিস্মিত হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমনে ঠিকসে বাতায়া থে?"

বাতিয়েছে বই কি। পরিষ্কারভাবে সে মেম-সাহেবের সেলাম দিয়েছে। কিন্তু সাহেব বলেছেন, তাঁর এখন ফুরসৎ নেই।

আশ্চর্য! মলী সেন ডেকে পাঠিয়েছেন, তার পরেও নিখিলের ফুরসৎ নেই! মলী সেনের বিশ্বাস হয় না। বেয়ারাটা অন্য কাউকে নিখিল বলে ভুল করেন নি তো?

বেয়ারা মাথা নেড়ে বলল, ভুল সে একটুও করে নি। রয় সাহেবকে সে আচ্ছাসেই চেনে। ভাড়ি বড়া এঞ্জিনর, দো হাজার তনখা তলব। তাঁর দেমাকভি অনেক উঁচা। নিজের নোকরদের হোলীর দিন পাঁচ পাঁচ রূপায়া বকশিষ দেন। এ-কথা সে আপনা কানসে শুনেছে। তাঁর দপ্তরমে

চাপরাশীর কামও না কি বহুৎ আছে। হুজুর যদি থোড়া মেহেরবানী করে সাহেবকে শুধু একদফে বলেন, তবে কালই তার বৈঠে হুয়ে বড় লেড়কার একটা নোকরীর ব্যবস্থা হয়।

অসহিষ্ণু মলী সেন ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় আছেন এখন রয় সাহেব?

সে সঙ্কুচিত হয়ে জানাল, সাহেব ওদিকের সজ্জাকক্ষেই আছেন। মেমসাহেবের হুকুম হলে সে আবার এক্ষুণি গিয়ে তাঁকে বলতে পারে।

না, তার প্রয়োজন নেই। বেয়ারাকে বিদায় দিলেন মলী সেন।

সে বেচারা যেতে যেতে ভাবল, ছেলের চাকরির সুপারিশের কথাটায়ই মনিব চটেছেন। কিন্তু তার যুক্তি খুঁজে পেল না। ভাবল, মেমসাহেবের সঙ্গে এঞ্জিনর সাহেবের যখন এত দোস্তী, তখন তার ছেলের জন্যে একটু বলে দিতে আপত্তি কিসের? এ-সব বড়লোকদের মেজাজের ঠিকানা পাওয়া যে তার মতো গরীব মানুষের সম্ভব নয়, অবশেষে এই সিদ্ধান্তেই তার বিশ্বাস দৃঢ়তর হলো।

মলী সেন অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন। তিনি ডেকে পাঠালে কোনো পুরুষের সময়ের অভাব হয়, জীবনে এ-কথা তিনি এই প্রথম শুনলেন।

এক তাড়া প্রুফ হাতে নিয়ে ব্যস্তভাবে প্রবেশ করলেন সুরেন লাহিড়ী। বললেন, "এই যে মিসেস সেন, আপনাকেই

খুঁজছিলেম। কালকের কাগজে যে রিভিউটা ছাপা হবে তার প্রুফটা একবার দেখে দেন যদি।"

মলী সেন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "রিভিউর প্রুফ? তার মানে? রাম জন্মের আগেই রামায়ণ লেখা হয়েছিল শুনেছি। নাট্য-সমালোচনাও নাটক স্বুরু হওয়ার আগেই ছাপা থাকে নাকি?"

লাহিড়ী বিজ্ঞজনোচিত হাসি হেসে বললেন,—"হুঃ, ঐখানেই তো পাবলিসিটি অফিসারের এফিসিয়েন্সী। কাগজে ভালো সমালোচনা ছাপাতে হলে অভিনয় পর্যন্ত অপেক্ষা করলে চলে বুঝি? আমার টেক্‌নিকই আলাদা। ড্রেস রিহার্সেলের দিনে এডিটর, নিউজ এডিটর ও রিপোর্টারদের এনে এত আদর-আপ্যায়ন করেছি কি অমনি? অভিনয়ের সমালোচনাটা ফলাও করে আগেই লিখে রেখেছিলেম। কেক, স্যাণ্ডুইচের ফাঁকে এক সময়ে দিয়ে দিয়েছি তাঁর হাতে। কাল সকালে নিজস্ব নাট্য-সমালোচকের নামে ছাপা হয়ে যাবে দেড় কলাম। দেখবেন, এ-সব ট্রেড সিক্রেট যেন আবার কাউকে বলে দেবেন না।"

পাবলিসিটি অফিসারের ট্রেড সিক্রেট নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো মনের অবস্থা তখন মলী সেনের নয়। লাহিড়ীকে বিদায় করার উদ্দেশ্যে বললেন, "কিন্তু আমার তো এখন আর একটুও সময় নেই স্বুরেনবাবু, আমাকে মাপ করতে হচ্ছে।"

লাহিড়ী নাছোড়বান্দা। বললেন, "এ দু'মিনিটের ব্যাপার,

আপনি শুধু চট করে একবার প্রুফগুলির উপরে চোখ বুলিয়ে দিন, কাটাকুটি সংশোধন যা-কিছু আমি করছি।"

ব্যাপারটার গুরুত্ব যাতে মলী সেন যথেষ্ট পরিমাণে উপলব্ধি করতে পারেন সেজন্যে স্বর নীচু করে বললেন, "কাগজের আপিস থেকে এ-ভাবে গ্যালী বাইরে আনা নিয়ম নয়। শুধু আমার সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব বলেই, এ-খাতিরটা পাওয়া গেছে।"

বিশেষ খাতিরের জন্যে অবশ্য মলী সেন বিশেষ চিন্তিত ছিলেন না। কিন্তু সুরেন লাহিড়ীর অধ্যবসায় তাঁর জানা ছিল। রিভিউটা একবার না পড়া পর্যন্ত এখান থেকে উঠবেন, এমন সম্ভাবনা অল্প।

হাত বাড়িয়ে কাগজগুলি নিয়ে দ্রুত তার উপরে দৃষ্টি চালনা করলেন মলী সেন।

নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসা। ব্যবস্থাপনার, অভিনয়ের, আলোকসম্পাতের, দৃশ্যসজ্জার, নৃত্য-পরিকল্পনার, সঙ্গীতের সব কিছুরই তম-প্রত্যয়ান্ত সাধুবাদ। বিশেষ করে অভিনয়ের যুগ্ম প্রয়োগকর্ত্রী মিসেস মলী সেনের অভিনয় সম্পর্কে প্রায় পুরা তিন প্যারাগ্রাফ। তৃতীয় অঙ্কে মঞ্জুশ্রীর রাজগৃহ ত্যাগের দৃশ্যে তাঁর স্বাভাবিক ও মর্মস্পর্শী অভিনয়ে প্রেক্ষাগৃহে অনেকেই যে অশ্রু সংবরণ করতে পারে নি,—সে-কথারও উল্লেখ আছে।

"চমৎকার।" বলে মলী সেন প্রুফগুলি ফিরিয়ে দিলেন সুরেন লাহিড়ীর হাতে।

"কাল সকালে এটা পড়ে, যারা আজ টিকিট কেনে নি তারা বুঝতে পারবে যে, কী জিনিষ মিস্ করেছে। দেখবেন, আমি বলে রাখছি, রিপিট পারফরমেন্সের জন্য চিঠি আসবে অনেক।" বলে বীরদর্পে প্রস্থান করলেন উৎফুল্ল প্রচার-সচিব।

পরক্ষণেই ডলি এসে উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলল, "মলীদি, বীরেশ্বরবাবু বাড়ি চলে গেলেন এই মাত্র। স্টেজ সাজাবার ভার দিয়ে গেলেন আমার উপরে, আমার তো বড্ড ভয় হচ্ছে।"

কথাটা উদ্বেগেরই বটে।

"বাড়ি চলে গেলেন? কেন?" জিজ্ঞাসা করলেন মলী সেন।

"বললেন, বাড়িতে কী বিশেষ দরকার; এক্ষুণি না গেলেই নয়।" উত্তর করল ডলি।

মলী সেনের স্মরণ হলো, স্ত্রীকে অভিনয় দেখতে নিয়ে আসবার জন্যে বাড়ি যেতে চেয়েছিলেন বটে বীরেশ্বর। মলী সেন নিবৃত্ত করেছিলেন। তাই এবার তাঁকে না বলেই বীরেশ্বর চলে গেছেন মনে করে মলী সেন ক্ষুব্ধ হলেন। ভীরু কোথাকার! সাহস হয়নি মুখোমুখি তাঁর ইচ্ছার বিরোধিতা করতে। যাক। পশ্চাদপসরণের দ্বারা আত্মরক্ষা করে যারা, তারা মলী সেনের মনোযোগের অযোগ্য।

ডলি মলী সেনের মনোভাবটা অনুমান করেছে কি না তা সে-ই জানে। সে বলল, "আমি তোমাকে বলে যাওয়ার কথা বলেছিলেম। তিনি বললেন, 'সময় নেই'।"

বটে! সময় নেই!! মলী সেনের জন্যে আজ কি সবারই সময়ের অভাব? অথচ এতকাল তাঁর একটু সখ্য, একটু প্রশ্রয়, একটু সান্নিধ্যের জন্যে অকাতরে সময় বিসর্জন দিয়ে সময় সার্থক মনে করেছে কতজন। আজও অপরাহ্নে তাঁর একটি সামান্য ইঙ্গিত, একটি ক্ষুদ্র আহ্বানের অপেক্ষা করেছে কত উৎকর্ণ শ্রবণ, কত উদ্বেল হৃদয়। এই ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে কোথায় ঘটেছে বিপ্লব? কোনখানে নেমেছে যবনিকা? নির্দিষ্ট দিনশেষে চিত্রাঙ্গদার অপসৃত দেহলাবণ্যের মতো তাঁর আকর্ষণ কি নিঃশেষ হয়েছে আজ সন্ধ্যায়? চক্ষে কি নেই বিদ্যুৎ, হাস্যে কি নেই সম্মোহন, কণ্ঠে কি নেই মদিরতা?

সে-মুহূর্তে হাজির হলেন অমলা। মেয়েদের ড্রেস করার ভার তাঁর উপরে। বললেন, "মলী ভাই, সহচরীর পার্টে ছোট মেয়েদের চুলে ওয়েভ দিয়ে দিলে চমৎকার দেখাতো। কিন্তু কার্লিং ক্লিপ দেখছিনে ড্রেসিং-রূমে। তোমার কাছে—"

কথা শেষ হওয়ার আগেই ক্রোধ ও বিরক্তিজড়িত কণ্ঠে মলী সেন বললেন,—"সবই কি আমাকে করতে হবে? কোনো কিছুই কি তোমরা দেখে শুনে নিজেরা করতে পারো না? কী কুক্ষণেই যে এই অভিনয়ে হাত দিয়েছিলেম! বিরক্তি ধরে গিয়েছে আমার!"

অমলা ও ডলি দুজনেই মলী সেনের এই আকস্মিক বিক্ষোভে বিস্মিত বোধ করলেন। অভিনয়ের আয়োজনে মলী সেনের পরিশ্রম ও উদ্বেগের কথা অমলার অজানা

ছিল না। তিনি অনুমান করলেন, ক্লান্তিজনিত অবসাদেই চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছে তাঁর।

তাঁরা চলে গেলেও মলী সেনের চিত্ত শান্ত হলো না। কিসের এক দুর্জয় অভিমান যেন তাঁর হৃদয়কে দলিত, মথিত ও পীড়িত করতে লাগল সর্বক্ষণ। সমস্ত পরিচিত নরনারী, সমুদয় প্রচলিত রীতিনীতি ও সর্ববিধ সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক দুর্দমনীয় বিদ্রোহের তাড়নায় উত্তেজিত হলো তাঁর মন। তাঁর চক্ষে এই বিশ্ব চরাচরের জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে কোথাও কোনোখানে আর লেশমাত্র আনন্দের চিহ্ন রইল না।

নিজেকে আর কখনও এমন নিঃসঙ্গ নিরালম্ব মনে হয় নি। বৃহৎ পৃথিবীটা যেন একটা বিরাট অতলস্পর্শী গহ্বর; তার সীমাহীন শূন্যতার মধ্যে একা দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল সুধাংশুকে। তাঁর বঞ্চিত বিড়ম্বিত জীবনের একমাত্র অথচ ক্ষণস্থায়ী আনন্দ। অন্তহীন দুঃখ-রজনীর মেঘাবৃত আকাশে স্বল্পায়ু চন্দ্রালোক।

নিজের মনে মনে তাঁকে তিনি সকরুণ আহ্বান জানিয়ে বলতে লাগলেন, "সুধা, তুমি দূরে চলে গেলে কেন? কেন এমন চিরকালের মতো পর হয়ে গেলে তুমি?"

তাঁর অমুক্ত কণ্ঠের সেই অনুচ্চারিত কাতরতা নির্জন সজ্জাকক্ষটিকে যেন এক গভীর শোকাচ্ছন্ন নিস্তব্ধতায় পূর্ণ করে দিল।

দ্রুতপদে সত্যসিন্ধু প্রবেশ করলেন। কিন্তু তাঁকে কিছু বলার সুযোগ মাত্র না দিয়ে বিরস কণ্ঠে মলী সেন বললেন,

"যদি আবার কোনো উপদেশ দিতে এসে থাক সিন্ধু, তবে ক্ষান্ত হও। উচিত-অনুচিতের তালিকায় আমার আর রুচি নেই।"

সত্যসিন্ধু বললেন, "তাতে অবাক হই নি। মরণ-কালে সুপথ্যে অরুচি ঘটে, এ-কথা আয়ুর্বেদেও আছে। কিন্তু ভয় করো না, আমি লাইফ ইনসিওরেন্সের এজেন্ট নই; অনিচ্ছুক লোককে কর্তব্য বোঝানো আমার পেশা নয়।"

মলী সেন ঈষৎ হেসে বললেন, "শুনে আশ্বস্ত হলেম। অনেক ডাক্তারই ভুলে যান যে, ওষুধ এবং উপদেশ কোনোটাই বিনামূল্যে দিতে নেই। তাতে কারো আস্থা থাকে না।"

"বোধ হয় তাই। কিন্তু এ-আলোচনা বর্তমানে নিষ্প্রয়োজন। আমি একটি জরুরী সংবাদ দিতে এলেম। শচীনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।"

"গ্রেপ্তার করেছে! কখন?" ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন মলী সেন।

"হ্যাঁ, আজ বিকেলে। ডি. সি. হেড কোয়ার্টার্স আমার বিশেষ বন্ধু। স্কুলে সাত বছর আমরা একসঙ্গে পড়েছি। এইমাত্র টেলীফোনে আমায় খবর দিলেন। আমি এক্ষুণি লালবাজারে যাচ্ছি।"

"গ্রেপ্তার কিসের জন্যে? শচীন কি নতুন কোনো—"

"বোধ হয় না। টেলীফোনে যতটুকু জানা গেল তা এই যে, সে নিজে পুলিশের কাছে গিয়ে যেচে সমস্ত স্বীকার করেছে। পুরানো কোন কোন রাজনৈতিক ডাকাতিতে তার যোগাযোগ ছিল তাও বলেছে। আমি

জামিনের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। ওঃ আর একটা কথা। আমার বন্ধু বলছিলেন, শচীনের বাড়ি তল্লাসীর সময়ে কোনো এক মহিলার নামে লেখা একখানা চিঠি পাওয়া গেছে। প্রেমপত্র জিনিষটা ভালো। যিনি লেখেন তিনি নিশ্চয়ই আনন্দ পান। যাঁকে লেখা হয়, অনুমান করি, তাঁরও মন্দ লাগে না। কিন্তু সেটা প্রকাশ্য আদালতে বহুজন সমক্ষে পঠিত হলে কতখানি রুচিকর হবে, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কাগজপত্র এখানেও যদি কিছু থাকে তবে সেগুলি এই বেলা অবিলম্বে সরিয়ে ফেল।"

এক মুহূর্ত থেমে সত্যসিন্ধু পুনরায় বললেন, "রোগী-বিশেষে ওষুধটা আমি বিনিপয়সায়ই দিয়ে থাকি। মানুষ-বিশেষে উপদেশটাও বিনামূল্যেই দিলেম। আস্থা থাকা না-থাকাটা অবশ্য আমার হাতে নয়।"

আকস্মিক এই দুঃসংবাদের আঘাতে প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেলেন মলী সেন। গভীর উদ্বেগ ও শঙ্কায় আচ্ছন্ন হলো তাঁর শরীর ও মন। সুসম্বদ্ধ চিন্তার ক্ষমতা পেল লোপ। বাকস্ফূর্তি হলো না রসনায়। চলৎ-শক্তিহীন প্রস্তর মূর্তির মতো বসে রইলেন নিজের আসনে।

কিন্তু সে মিনিট কয়েক মাত্র। ছুটে এলেন সিদ্ধনাথ। "মিসেস সেন, আপনি এখনও বসে আছেন? ড্রপসিন উঠবে এই মুহূর্তে। ডোবাবেন দেখছি, চলুন, চলুন, আর এক সেকেণ্ড দেরী নয়।" বলে এক রকম হাত ধরেই টেনে নিয়ে গেলেন মলী সেনকে। দমকা হাওয়ায়

উড়িয়ে-নিয়ে-যাওয়া তৃণখণ্ডের মতো মলী সেনকে সজ্জাকক্ষ থেকে যেন তাঁর নিজের অজ্ঞাতেই সিদ্ধনাথ নিয়ে এলেন স্টেজে। যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো মলী সেন কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে বসলেন অভিনয়ের সেটে।

স্টেজ-ম্যানেজার শেষবারের মতো পাত্রপাত্রীদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সব ঠিক আছে কি না। তারপর দ্রুতপদে উইংসের আড়ালে গিয়ে বললেন, "রেডী? ওয়ান, টু, থ্রি।"

হুইসিল।

প্রেক্ষাগৃহের অবশিষ্ট আলোগুলি একসঙ্গে নিবে গেল। ইলেকট্রীক সুইচের প্রক্রিয়ায় মঞ্চের সম্মুখ থেকে নীল ভেলভেটের মোটা যবনিকা নিমেষে হলো অপসৃত।

উৎসুক দর্শকদের চক্ষের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হলো রঙ্গস্থল।

'স্বপন কুহেলী' গীতিনাট্যের প্রথম দৃশ্য।

সমগ্র মঞ্চটি ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। নিস্তব্ধ। শুধু বহু দূর হতে বাতাসে-ভেসে-আসা বীণাধ্বনির ঈষৎ একটুখানি আভাস আসে যেন।

রজনীর শেষ প্রহরে পূর্বাকাশের মতো ধীরে ধীরে অন্ধকার দূর হয়ে রঙ্গস্থলে দেখা দিলো আলোর রেখা।

যেন তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বীণার সুর হলো স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর।

রঙ্গস্থল পূর্ণালোকিত হলে দেখা গেল,—নদীবক্ষে ভাসমান সুদৃশ্য এক প্রমোদ-তরণী। ময়ূরপংখী গড়ন। শ্বেত পংখের কাজ করা ছাদের উপরে বীণা বাজাচ্ছেন সুন্দরী রাজকন্যা মঞ্জুশ্রী। তাঁর প্রায় কোলের কাছ ঘেঁষে বাহুতে ভর দিয়ে অর্ধশায়িত সৌম্যদর্শন ইন্দ্রজিৎ। নীচে দ্বাররক্ষিকার ভূমিকায় দাঁড়িয়ে সুবেশা দুটি তরুণী; রাজকন্যার প্রিয় সহচরীদ্বয়। দূরে অপর তীরে আকাশ নত হয়ে যেখানে গাছের সারির সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে, সেখানে উঠেছে আধখানা চাঁদ। তার আলো দুলছে নদীর বুকে। বীরেশ্বরের সুনিপুণ তুলির রেখা ও নিখিলের আলোক-সম্পাতের কৌশল 'স্বপন কুহেলীর' দৃশ্য-বিন্যাসে স্বপ্ন সৃষ্টি করেছে সন্দেহ নেই।

প্রেক্ষাগৃহের মুগ্ধ নরনারী করতালি দ্বারা সংবর্ধনা জানাল নয়নমুগ্ধকর মঞ্চসজ্জার এই অপূর্ব কলাকৌশলকে।

সমীর স্তব্ধ নিঃশ্বাসে চেয়ে ছিল স্টেজের দিকে। ধীরার কানের কাছে মুখ এনে বলল, "মলী মামীকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে কিন্তু।"

সত্যি কথা। মলী সেনের স্বাভাবিক দিব্যকান্তি যে-কোনো নারীর পক্ষেই ঈর্ষার বস্তু। সযত্ন প্রসাধন, বর্ণাঢ্য

বসন-ভূষণ, আলোকোজ্জ্বল পরিবেশের সহযোগে সেই পর্যাপ্ত রূপ হয়েছে অপরূপ।

কিন্তু সত্য কথাও শুনে যে মন অপ্রসন্ন হতে পারে, তা কি ধীরা ইতিপূর্বে কোনোদিন কল্পনা করেছে?

উত্তেজিত সমীর দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মলী সেনের প্রশংসায় নিজের উচ্ছ্বাসের থলি উজাড় করে দিতে লাগল। বলল, "দেখেছো, বীণার তারে হাতের আঙ্গুলগুলি খেলছে কেমন গ্রেসফুল্!"

"সায়লেন্স প্লীজ।"—পিছন থেকে অন্য দর্শকের কাছে তাড়া খেল সমীর। তার ডান পাশের ভদ্রলোকটিও বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করলেন। বাধ্য হয়ে সমীরের মন্তব্য বন্ধ হলো!

পার্শ্ববর্তিনীটি অহেতুক মনোবেদনায় অনর্থক পীড়িত হতে লাগল নিঃশব্দে। মলী সেনের রূপ নিয়ে এতকাল সব চেয়ে গর্বিত ছিল ধীরা স্বয়ং। আজও সমীর কিছু না বললে সম্ভবতঃ সে নিজেই প্রশংসা করতো। হায়, যে-কথা নিজের মুখে সবাইকে বলে বেড়াতে পারা যায় মনের আনন্দে, সে-কথা পরের মুখে শুনলে বুকে ব্যথা বাজে কেন, এ-রহস্য ধীরা কিছুতেই বুঝে ওঠে না।

•

অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীরা স্টেজের ভিতরে উইংসের পাশ থেকে অভিনয় দেখছিল। যদিও নীরজা দাঁড়িয়ে

ছিলেন একটু দূরে অপর প্রান্তে, সেখান থেকে অভিনয়রত নায়ক-নায়িকাকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়ার অসুবিধা ছিল না।

অভিনয়ের সঙ্গে বাস্তবের যোগ থাকে না, এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি নীরজার আছে। থিয়েটারের প্রণয়, দ্বন্দ্ব, সখ্য, বৈরিতা পাত্রপাত্রীরা মুখের গ্রিজ-পেইন্টের মতোই অভিনয়শেষে ধুয়ে মুছে ফেলে রেখে যায় পাদপ্রদীপের ছায়াতে, এ-কথা তাঁরও অজানা নেই। তবুও প্রেমমুগ্ধ ক্রৌঞ্চমিথুনের মতো মঞ্জুশ্রী ও ইন্দ্রজিতের এই ভাবাবেগে ঘন-সন্নিবদ্ধ অবস্থিতিটুকুকে নীরজা কিছুতেই যেন প্রসন্ন মনে দেখতে পারলেন না। নিজের মনকে বারংবার বোঝাতে চেষ্টা করলেন,—এ তো শুধু অভিনয়। কিন্তু মানব মনে বিচার-বুদ্ধির গণ্ডি অতিক্রম করেও আছে যে এক অনুভূতির কেন্দ্র, সেখানে নীরজার কেবলই ব্যথা বাজতে থাকে।

মঞ্জুশ্রীর বীণাবাদন সাঙ্গ হলো। সন্তর্পণে বীণাটিকে রাজকন্যা একপাশে সরিয়ে রাখলেন। ইন্দ্রজিৎ তাকিয়ে ছিলেন তাঁর মুখের পানে। সে-তন্ময় দৃষ্টিতে প্রণয়বিহ্বল পুরুষের পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। সে-দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলতেই নয়ন নত করলেন মঞ্জুশ্রী।

এই অংশটুকু নিখুঁত ভাবে আয়ত্ত করতে নিখিল ও মলী সেনকে রিহার্সলে যে অনেক দিন ধরে বহু চেষ্টা করতে হয়েছে, সে তো নীরজা স্বচক্ষেই দেখেছেন। অথচ সে-কথা

এখন তাঁর মনেই পড়ল না। ঈর্ষাকাতর হৃদয়ের পীড়িত তন্ত্রীগুলি অবিরাম বেদনায় আলোড়িত হতে লাগল।

সমগ্র প্রেক্ষাগৃহটি নীরব। বোধ হয়, একটা আলপিন পড়লেও শব্দ শোনা যাবে। দর্শকজনের বিস্ময়বিমুগ্ধ চক্ষুগুলি স্টেজের উপরে নিবদ্ধ।

সমীর ধীরার কানের কাছে কী যেন বলার উপক্রম করছিল। পাশের ভদ্রলোকটি নিজের ওষ্ঠাধরে তর্জনী স্থাপন করে বললেন, "হাশ্‌শ—।"

বেচারা সমীরকে অগত্যা উৎসাহ সংবরণ করতে হলো।

দর্শকজনের উৎসুক দৃষ্টির বাইরে ইন্দ্রজিতের মহার্ঘ্য রাজসজ্জার অন্তরালে যে রক্তমাংসের সাধারণ মানুষ নিখিলচন্দ্র রায়টি আছেন, তাঁর চিত্ত শান্ত ছিল না।

মান্নামাসির কটু ভাষণের আঘাতে নিখিলের স্বপ্ন গেছে ভেঙ্গে, মন হয়েছে বিষাক্ত। মোহভঙ্গের পরিণাম তো মোহমুক্তি নয়, মোহভেদ। এক ভ্রম থেকে অপর ভ্রান্তি

ফলে প্রথমে যতখানি ছিল অনুরাগ, পরিণামে তার বেশী জমেছে বিদ্বেষ। যতখানি ছিল আকর্ষণ, তার বেশী দেখা দিয়েছে বিতৃষ্ণা।

কিন্তু নিজ দায়িত্ব পালনে কোনোদিন কোনো ত্রুটি ঘটে নি নিখিলের। আজ সন্ধ্যায় এই অভিনয়েও আপন কর্তব্যে এতটুকু স্খলন হবে না, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দ্বারা মন থেকে বার বার সরিয়ে দিলেন ব্যক্তিগত দুঃখ-ক্ষোভের ভার। নিষ্ঠার সঙ্গে করতে লাগলেন আপন অংশটুকুর অভিনয়।

আহত নিখিলের সমস্ত বেদনা চাপা রইল ইন্দ্রজিতের রাজবেশের আড়ালে। মুখে ফুটিয়ে তুললেন প্রফুল্লতা, দৃষ্টিতে আনলেন বিহ্বলতা, কণ্ঠে জাগালেন ভাবগম্ভীর স্বর। জড়তাহীন উচ্চারণে সুরু করলেন নিজ পার্ট,—"সুলক্ষণে, ধন্য মানি আপনারে তোমার প্রসাদে। প্রেমে তব মোর অভিষেক।"

নীরজার দুই কানে কে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার নিক্ষেপ করল। কিন্তু আত্মসংবরণে ব্যর্থ হলে তো লজ্জা রাখার জায়গা থাকবে না কোথাও। তাই নিজেকে সংযত করার চেষ্টায় মনে মনে বলতে লাগলেন, "না, ঈর্ষা করব না। ফেলব না চোখের জল। দুঃখকে জয় করব আমি।"

নিখিলের কণ্ঠ কানে এল—"হে কল্যাণী, ভিক্ষা এক আছে তব পাশে। বিমুখ করো না যেন—"

নীরজা দুই হাত দিয়ে সজোরে নিজের কান দুটি চেপে ধরলেন। স্মরণ করলেন সত্যসিন্ধুর উপদেশ,—যা রইবে না জানি, তাকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে পারলেই হারানোকে

আর ক্ষতি মনে হয় না।) ঠিক কথা। ত্যাগ করবেন তিনি। শুধু স্বেচ্ছায় নয়, স্বচ্ছন্দচিত্তেও। অনুচ্চ কণ্ঠে মন্ত্রের মতো পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করতে লাগলেন নীরজা, "আমি দিলেম, আমি দিলেম। নিঃশেষে দিলেম।"

চেয়ে দেখলেন, নিখিল আবেগভরে তাঁর দুই হাতের মধ্যে মলী সেনের ডান হাতখানি গ্রহণ করেছেন। বলছেন—কী বলছেন? কী জানি, তার এক বর্ণও আর নীরজার বোধগম্য হলো না। দুই চক্ষে তাঁর জ্বালা ধরল। ছিঃ ছিঃ। এ-দৃশ্য কি লুপ্ত করা যায় না দৃষ্টির সম্মুখ থেকে? ঢেকে দেওয়া যায় না সূচীভেদ্য আঁধারে? আকাশে অমাবস্যার কালিমা কি নেই? সমস্ত আলো কি মুছে দেওয়া যায় না রঙ্গমঞ্চ থেকে? ন্যায়হীন, নীতিহীন, নির্মম, নিষ্ঠুর এই পৃথিবী থেকে?

উত্তেজনায় কম্পিত পদে নীরজা দ্রুত ছুটে গেলেন বৈদ্যুতিক কলাকৌশল ও আলোক নিয়ন্ত্রণের সুইচ বোর্ডটার দিকে।

নিখিলের মনেও ঝড় বইছিল প্রচণ্ড।

এতদিন মলী সেনের ক্ষণিক উপস্থিতিকে তিনি জ্ঞান করতেন সৌভাগ্য, তাঁর সঙ্গকে মনে করতেন পুরস্কার।

আজও অপরাহ্ণ বেলায় ইলেকট্রীক সুইচ বোর্ডটার কাছে মলী সেনের অঙ্গুলির অতর্কিত ছোঁয়াটুকু নিখিলের সর্বাঙ্গে পুলকের প্রবাহ সৃষ্টি করেছে। সেই নৈকট্যই এখন বিরক্তি উৎপাদন করে। সেই আকাঙ্ক্ষিত স্পর্শ মনে হয় অশুচি। আশ্চর্য!

এতক্ষণ যে-মনোবলের দ্বারা নিখিল পরিপূর্ণ নিষ্ঠায় অভিনয় করে যাচ্ছিলেন, মলী সেনের হাতটি হাতে নেওয়া মাত্রই যেন তা ছিটকে-পড়া কাচের বাসনের মতো ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেল। স্থান কাল পাত্র সম্পর্কে বুঝি তাঁর আর জ্ঞান রইল না। অভিনয় বিস্মৃত হলেন। ভুলে গেলেন, তিনি মগধের যুবরাজ ইন্দ্রজিতের ভূমিকায় অবতীর্ণ। আপনাকে দেখতে পেলেন এক ছলনাময়ী নারীর অপ্রীতিকর অতিনিকট পরিবেষ্টনে। প্রবল্ল ঘৃণা ভরে তার কলুষিত হস্তের অবাঞ্ছিত স্পর্শ থেকে তড়িদ্বেগে সরিয়ে নিলেন নিজের হাত।

সজোরে হাত টেনে নিলেন, না, কি হাত দিয়ে ধাক্কা দিলেন?

কে জানে?

মানসিক আলোড়নের প্রাবল্যে নিজকে অবিচলিত ও সংহত রাখা কঠিন হলো মলী সেনেরও পক্ষে।

সিদ্ধনাথ তাঁকে গ্রিন-রুম থেকে প্রায় একটি জড় পদার্থের মতো টেনে স্টেজে বসিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু আপনার বোধশক্তিকে পুরোপুরি বজায় রাখা যেন মলী সেনের শক্তির বাইরে মনে হলো। তিনি প্রাণপণে যতই মনোনিবেশের প্রয়াস করেন অভিনয়ে, তাঁর সমস্ত চৈতন্য কেবলি হারিয়ে যেতে চায় অতীত স্মৃতিতে। মনে পড়ে একটি সুকুমার তরুণ মুখ,—সারল্যে নির্মল ও বীরত্বে নির্ভীক। স্মরণে আনে দুটি স্বচ্ছ চপল চক্ষের দৃষ্টি,—সাংসারিক অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক নয়; ভাবপ্রবণতায় উদ্দীপ্ত। নিজের অজ্ঞাতে মলী সেন উন্মনা হয়ে যান।

এ কী বিপত্তি! ইন্দ্রজিৎ চেয়ে আছে মঞ্জুশ্রীর মুখের পানে। অধীর আগ্রহে প্রত্যাশা করছে উত্তর; প্রেমময়ী রাজকন্যার সলজ্জ সম্মতি। কিন্তু কোথায়? সে যে বাক্যহীনা! এক বর্ণও মনে আসছে না তাঁর পার্ট! উপায়? লজ্জা ও উৎকণ্ঠায় মলী সেনের সর্বাঙ্গ হিম হয়ে এল।

যাক, ঐ যে উইংসের পিছন থেকে পার্টের খেই ধরিয়ে দিচ্ছে স্মারক। মলী সেন শুনতে পেলেন,—"আমি চাই তোমাকে বিয়ে করতে, চাই দুজনে ঘর বাঁধতে।" সর্বনাশ! এ তো নাট্যকারের রচনা নয়, এ যে শচীনের উক্তি। এ কী বিভ্রম, না, ইন্দ্রজাল? মলী সেন কী জেগে স্বপ্ন দেখছেন?

প্রম্‌টার বেচারা বার বার স্মরণ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা

করল—"হে অতিথি, কিছু নাহি অদেয় তোমায়—বলুন মিসেস সেন, হে অতিথি—।"

বৃথা। মলী সেনের মস্তিষ্কে যেন একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্পের বিপর্যয় চলছে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মতো তাঁর রসনা হলো ভাষাহীন, অঙ্গ হলো বিবশ। মনে হলো, পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছে আশ্রয়। সম্মুখে চেয়ে দেখলেন,—এ কী, প্রেক্ষাগৃহটা রথের মেলার নাগরদোলার মতো ঘুরছে যেন! রঙ্গমঞ্চের আলোগুলি যাচ্ছে নিবে! এ কী, চারদিকে এত অন্ধকার কেন?

অন্ধকার! হ্যাঁ, অন্ধকারই চান নীরজা। ঘন, কালো নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। যে-অন্ধকারে লুপ্ত হবে সহস্র কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে নির্লজ্জ প্রণয়লীলার এই প্রগল্‌ভ প্রকাশ। লুপ্ত হবে নিখিল, মলী সেন, উৎসব-আয়োজনের সমস্ত সমারোহ।

রুদ্ধশ্বাসে নীরজা সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন সুইচ-বোর্ডের ক্ষুদ্র মঞ্চটির উপরে। ঠিক যেখানে ঘণ্টা দুই আগে নিখিল মলী সেনকে সযত্নে দেখিয়েছেন আলোক নিয়ন্ত্রণ ও বৈদ্যুতিক কৌশলগুলির নিয়ন্ত্রণ-সঙ্কেত। সারিবন্দী অসংখ্য সুইচের মধ্যে যেটা প্রথম হাতের নাগালে পেলেন নীরজা সেটাই টিপে দিলেন সজোরে।

হুম্! দাম্!! দড়াম্!!!

বিকট শব্দে কেঁপে উঠল রঙ্গস্থল। বিপুলবেগে প্রমোদ-তরণীটি হলো আন্দোলিত। ছাদের উপর থেকে মলী সেন সবলে শূন্যে নিক্ষিপ্ত হলেন। পড়ে গেলেন স্টেজের নীচে যেখানে নানা যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামের ভীড়।

চক্ষের পলকে ঘটল দুর্ঘটনা।

সভয় আর্তনাদ উঠল স্টেজের ভিতরে। কেউ চীৎকার করছেন, "স্ট্রেচার"। কেউ চেঁচাচ্ছেন, "এ্যাম্বুলেন্স"। কেউ বা হাঁক দিচ্ছেন, "ফায়ার-ব্রিগেড"। কী করবেন ভেবে না পেয়ে অর্থহীনভাবে ছুটোছুটি করছেন শঙ্কিত মুখে কর্মকর্তার দল। স্টেজ-ম্যানেজার তাড়াতাড়ি নীল পর্দাটা ফেলে দিলেন।

প্রেক্ষাগৃহেও দর্শকেরা ভীত, চমকিত। কী ঘটেছে বুঝতে না পেরে অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাঁরা সবাই অবিলম্বে বাইরে বেরোবার চেষ্টায় উর্ধ্বশ্বাসে দরজার দিকে ছুটলেন। সেখানে কে কার আগে নিষ্ক্রান্ত হবেন তাই নিয়ে প্রতিযোগিতা। ব্যস্ততা ও ভীড়। মায়েদের ত্রাস, শিশুদের আর্তনাদ। চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা ও কোলাহল।

সমীর আসন ছেড়ে ছুটে গেল স্টেজের উপর। নিমেষে লাফিয়ে পড়ল মঞ্চের তলদেশে। জীমনাস্টিক-করা শরীর তার। মলী সেনের সংজ্ঞাহীন লঘুভার দেহ দুই হাতে অনায়াসে বহন করে উপরে নিয়ে এল। ড্রেসিং-রুমে টেবিলের উপরে শুইয়ে দিল।

কৌতূহলী বন্ধুবান্ধবীরা চার দিকে ঘিরে দাঁড়ালেন। মেয়েদের মধ্যে কেউ খুঁজতে লাগলেন স্মেলিং সল্ট, ছেলেদের মধ্যে কেউ ছুটলেন বরফের সন্ধানে। বর্ষীয়সীরা "ডাক্তার, শীগগির একজন ডাক্তার" বলে ব্যাকুলভাবে তাকাতে লাগলেন আশে-পাশে।

এই হিতাকাঙ্ক্ষী অথচ কিংকর্তব্যবিমূঢ় নরনারীর ভীড় ঠেলে যিনি সামনে এগিয়ে এলেন, তিনি শচীনের মা। হতবুদ্ধি সমীরকে বললেন,—"আমি ওকে দেখছি বাবা। তুমি চট করে একটু ঠাণ্ডা জল আনো দিকিন।"

মলী সেনের মাথাটি স্নেহভরে মহিলা তুলে নিলেন নিজের কোলে। তাঁর বুকের কাঁচুলির শক্ত বাঁধনটা শিথিল করে দিলেন। হাত-পাখার অভাবে একটা প্রোগ্রামের বই দিয়ে হাওয়া করতে লাগলেন সযত্নে।

ঘণ্টা দুই কেটে গিয়েছে।

প্রেক্ষাগৃহ জনশূন্য। স্টেজের উপরেও ভীড় নেই। বেশীর ভাগ অভিনেতা ও অভিনেত্রীই চলে গিয়েছেন। শুধু ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন তখনও অপেক্ষা করছেন।

ক্রিং ক্রিং শব্দে টেলীফোন বাজছে মুহুর্মুহুঃ। নানা

জায়গা থেকে আসছে পরিচিত ও অপরিচিতদের কণ্ঠে ঘন ঘন উৎকণ্ঠিত অনুসন্ধান।

একাধিক সম্ভবপর স্থানে খোঁজ করে শিবনাথকেও ধরা গিয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে দেরী হওয়ায় আসানসোল যাত্রায় তাঁর বিলম্ব ঘটেছিল। তিনিও রোগীর কক্ষের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন।

অবশেষে ডাক্তার বেরিয়ে এসে বললেন, "জ্ঞান হয়েছে। ভয়ের কিছু নেই। ইন্‌জুরি তেমন বিশেষ কিছু নয়। পায়ে ও পিঠে কয়েকটা সামান্য ব্রুইসেস, ছড়ে যাওয়ার মতো। খুব আশ্চর্য রকম ভাবে বেঁচে গিয়েছেন বলতে হবে। ওঁর ঘরে আজ রাত্তিরে কেউ যাবেন না যেন।"

প্রাণের আশঙ্কা নেই। আঘাত সামান্য। শুনে খুবই খুশি হওয়া উচিত। কিন্তু শিবনাথের মনে যেন আশ্বাসের সৃষ্টি হলো না। কেন? শিবনাথ কি সহজে উতলা হন? বেশী উদ্বিগ্ন বোধ করেন? না কি—তিনি—হঠাৎ শিবনাথের কাছে নিজের হৃদয়ের গোপন কুঠরীর দ্বার উদ্ঘাটিত হলো। শিবনাথ সভয়ে আবিষ্কার করলেন, এ তো উদ্বেগ নয়, এ হতাশা। মলী সেনের দুর্ঘটনার সংবাদ শুনে তিনি অবশ্যই অত্যন্ত দুঃখিত ও চিন্তিত হয়েছিলেন। কিন্তু সেই দুঃখ ও দুর্ভাবনার সঙ্গে তাঁর অবচেতন মনের নিভৃততম স্তরে সমান্তরালভাবে বইছিল একটি অতি সূক্ষ্ম প্রত্যাশার ধারা। অরুচিকর দাম্পত্য-বন্ধন থেকে গ্রন্থিমোচনের ইঙ্গিত। নিরন্তর কৃত্রিম জীবনযাপনের শ্বাসরুদ্ধকর বিড়ম্বনা থেকে

নিষ্কৃতির আশা। ডাক্তারের আশ্বাসে তাই যেন মনে অতি সূক্ষ্ম অথচ সুস্পষ্ট নিরাশার ভাব জাগল।

শিক্ষা ও শুভবুদ্ধির প্রভাবে শিবনাথ সভয়ে দুই হাত দিয়ে যেন সজোরে প্রতিরোধ করতে চাইলেন এই হীন মনোভাব। কিন্তু নিজের কাছে নিজের সততায় কিছুতেই অস্বীকার করতে পারলেন না তার অস্তিত্ব। ফলে নিজের উপরেই ক্রুদ্ধ হলেন।

স্ত্রীর জ্ঞান হওয়া মাত্রই তাঁর কাছে যেতে না পারার দুঃখেই যে স্বামীর মুখ ম্লান হয়ে আছে, সে-সম্পর্কে ডাক্তারের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। তিনি শিবনাথকে বোঝালেন, "শারীরিক আঘাত বেশী না হলেও জোর শক লেগেছে তো। এখন প্রিয়জনকে দেখলে একটা ইমোশান্যাল একসাইটমেন্ট হতে পারে। তাতে ব্রেইনে ব্লাড রাশ করার আশঙ্কা।"

আপন সুপ্ত মানসের গুপ্ত তথ্য জানতে পেরে নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মিল শিবনাথের। হৃদয়হীন পাষণ্ড বলে নিজেকেই নিজে ভর্ৎসনা করলেন তিনি। স্ত্রীর চিকিৎসা ও পরিচর্যায় যাতে কিছুমাত্র ত্রুটি না ঘটে সে-দিকে অতি মাত্রায় তৎপর হয়ে উঠলেন। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলেন, "একবার কর্নেল এমার্সনকে ডাকলে হয় না?"

"না, না, এ সামান্য ব্যাপারে তাঁকে কেন? পেশেন্টের দরকার শুধু এখন রেস্টফুল স্লিপ। ভালো করে ঘুমোতে

পারলেই হয়। আমি লুমীনল আর ব্রোমাইড দিয়ে একটা মিকশ্চার রেখে গেলেম। তাই যথেষ্ট।"

শিবনাথ বললেন, "একজন বিলাতী নার্স—"

ডাক্তার বললেন, "যে-মহিলা ওঁর কাছে রয়েছেন তিনি বোধ হয় মিসেস সেনের মা? তাঁর চাইতে ভালো শুশ্রূষা নার্স এসে করতে পারবে না। তবে, আপনি যদি টাকা খরচ করতে চান, আমার আপত্তি কী?"

শিবনাথ নিবৃত্ত হলেন।

আত্মনিগ্রহের পালায় আরও একজনের অংশ ছিল। সে ধীরা। মলী সেনের ঘরের বাইরে অন্ধকার এক কোণে থামে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল নিঃশব্দে। ভয়ে, দুঃখে ও অনুশোচনায় প্রায় বিবর্ণ চেহারা। মলী সেনের প্রতি কিছুক্ষণ পূর্বে সে বিরূপ হয়েছিল, এ-কথা মনে করে ধীরার অনুতাপের আর সীমা রইল না। নিজের দুই গালে নিজ হাতে চড় কষিয়ে দিতে ইচ্ছা হলো তার। মলী মামীর আর জ্ঞান ফিরে আসবে কি? তিনি সম্পূর্ণ সেরে উঠবেন তো? তিনি যদি না বাঁচেন? না, না, সে কি কখনও হয়? মনে মনে সমস্ত ঠাকুর দেবতাকে স্মরণ করে সে প্রার্থনা করল, "ঈশ্বর, কালী,

দুর্গা, তোমরা মলী মামীকে ভাল করে সুস্থ করে দাও।"

পাশে কার যেন উপস্থিতি অনুভব করল ধীরা। মুখ তুলে দেখল,—সমীর।

সমীর চুপি চুপি বলল, "ডাক্তার বলেছেন, বেশী লাগে নি। কোনো ভয় নেই।"

ধীরা সমীরের দেহলগ্ন হয়ে তার কাঁধে আপন অশ্রুপ্লাবিত মুখটি স্থাপন করল। সমীর ডান হাত দিয়ে তাকে বেষ্টন করে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলল, "কেঁদ না ধীরা, মলী মামী ভালো হয়ে উঠবেন।"

অভিমানের দ্বারা যে-দুটি হৃদয় কেবলই দূরে সরে যাচ্ছিল কিছুক্ষণ আগে, উদ্বেগ ও অনুশোচনার মধ্য দিয়ে তারা এখন নিকটতর হলো। সমীর দেখল, হাসিতে যে-ব্যবধান দূর হয় নি, অশ্রুতে তা ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হলো।

নিখিল বসেছিলেন এতক্ষণ একান্তে। ঘড়ির পানে তাকিয়ে দেখলেন, রাত কম হয়নি। গৃহে ফিরবার উদ্যোগ করলেন। মনে হলো স্টেজের বাইরে সিঁড়ির উপরে কে যেন বসে আছে। অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না। কাছে এগিয়ে গেলেন।

"এ কী, নীরজা! তুমি বাড়ি যাও নি এখনও?" সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন নিখিল।

নীরজা উঠে দাঁড়াতেই নিখিল লক্ষ্য করলেন, তার মুখ ছাই-এর মতো পাংশু। ভাবলেন, দুর্ঘটনায় তাঁরও আঘাত লেগেছে মনে। বললেন, "চল আমি পৌঁছে দিচ্ছি তোমাকে।"

গাড়িতে বসে দুজনের কারুর মুখেই কথা ছিল না। ক্লান্তিতে অবসন্ন বোধ করলেন নিখিল। ক্লান্তি শুধু দেহের নয়, মনেরও। চোখ বুজে ভাবতে চেষ্টা করলেন আজ অপরাহ্ণ থেকে দ্রুত পরিবর্তিত সমুদয় ঘটনা-প্রবাহ। অসীম এক শূন্যতায় যেন ছেয়ে গেল মন। যেন খুঁজতে লাগলেন কোনো একটা নির্ভর, হাত বাড়িয়ে পেতে চাইলেন কোনো একটা অবলম্বন। হাতের সামনে যা ছিল, নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি তা শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেন।

নীরজাও অন্যমনস্ক ছিলেন তেমনি। কখন যে তাঁর ডান হাতখানি পার্শ্ববর্তী নিখিলের হাতের মধ্যে আশ্রয় লাভ করেছে তা জানতেও পারেন নি।

হঠাৎ খেয়াল হলো নীরজার। সর্বাঙ্গে জাগল কম্পন। সুখে কী দুঃখে, সে-কথা বোঝবার সাধ্য রইল না।

গ্যাসের আলোয় আলোকিত রাজপথ দিয়ে ছুটে চলেছে গাড়ি। বাইরের পানে চেয়ে নীরজা মনে মনে কা'কে যে

প্রণাম করলেন, কেন যে প্রণাম করলেন, সে শুধু তাঁর অন্তর্যামীই জানেন।

“এই যে শিবনাথবাবু, আপনি এখানে—”

চমকিত শিবনাথ তাকিয়ে দেখলেন, সুরেন লাহিড়ী।

পূর্ণিমার নিদ্রা নেই। নিদ্রা নেই সাগরের। আর নিদ্রা নেই দেখা গেল প্রচার-সচিবের চক্ষে।

প্রথমে মলী সেনের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মামুলী দুশ্চিন্তা ও পরে শিবনাথের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে লাহিড়ী বললেন, “কী দুর্ভাগ্য! অভিনয়ের রিভিউটা বিশ্ববার্তায় পেজ মেক আপ হয়ে গিয়েছিল। বন্ধ করে দিতে হলো। যাকগে, গতস্য শোচনা নাস্তি। তার জায়গায় এই রিপোর্টটা ছাপার জন্যে পাঠিয়ে দিচ্ছি। বড্ড তাড়াহুড়া করে লিখতে হলো। একটু শুনুন দিকিন, কেমন হয়েছে। এক্ষুণি পৌঁছে দিতে হবে। নিউজ এডিটরের ডেস্কে। নইলে ডাক এডিশানটা ধরা যাবে না।”

শিবনাথের সম্মতির অপেক্ষা মাত্র না করে লাহিড়ী পড়তে সুরু করলেন। এমন একটি উপভোগ্য অভিনয় সুরুতেই পণ্ড হওয়ার ফলে দর্শকগণের হতাশা, আর্টের ক্ষতি,

প্রধানা অভিনেত্রীর আঘাত ইত্যাদির মর্মস্পর্শী বর্ণনা। শেষ কয় ছত্রে আছে শিবনাথেরও উল্লেখ ;—

"অপ্রত্যাশিত শোচনীয় দুর্ঘটনায় অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা মিস্টার সেন স্বভাবতঃই অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার ন্যায় পত্নীগতপ্রাণ স্বামীর এই উদ্বেগ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণের গভীর সহানুভূতি উদ্রেক করিয়াছে। যে-সকল বিশিষ্ট নাগরিক বাড়িতে আসিয়া বা টেলীফোনযোগে মিস্টার সেনকে তাঁহার এই বিপদে সমবেদনা জানাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উল্লেখযোগ্য,—স্যার ও লেডী প্রফুল্লনাথ রায় ; জাস্টিস এস. পি. সেন ; কলিকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র জনাব মহম্মদ জারীফ ; শেরীফ রামসুখন ভাণ্ডারী ; মিস্টার ডি. কে. বোস, আই. সি. এস. ও তাঁহার স্ত্রী।"

"নামের লিস্টটা আরও একটু বড় হ'লে ভালো হয়। যাই দেখিগে, নতুন আর কেউ টেলীফোন করেছে কি না।" বলে লাহিড়ী প্রস্থান করলেন।

কিন্তু পরমুহূর্তেই ফিরে এসে প্রচারসচিব উৎসাহের সঙ্গে বললেন, "রিপোর্টটার সঙ্গে সিক্-বেডের একখানা ছবি ছাপাতে পারলে চমৎকার হতো। কপালে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা, চোখ বুজে শুয়ে আছেন মিসেস সেন, নার্স মাথায় আইস-ব্যাগ দিচ্ছে,—ওঃ, ফার্স্ট ক্লাশ পাবলিসিটি এফেক্ট হতো। একদম বিলাতী কায়দা। একজন ফটোগ্রাফারকে যদি একবার আনতে পারেন, মিস্টার সেন,— আচ্ছা, থাক, আমি বিশ্ববার্তায় একবার টেলীফোন

করে দেখিগে, তাঁদের স্টাফ-ফটোগ্রাফারকে ধরা যায় কি না।”

বন্ধুজন ও পরিচিতের দল একে একে সবাই চলে গিয়েছেন। শুধু শিবনাথ তখনও বসে আছেন মলী সেনের ঘরের সামনে লক্ষ্যহীন, নিরুদ্যম আলস্যে।

রাত্রি গভীর হতে লাগল। বাড়ির সম্মুখে গলিতে দোকান-পাট অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পথ জনবিরল। আশেপাশে দীপহীন রুদ্ধদ্বার গৃহগুলিতে অধিবাসীরা বেশীর ভাগ সুপ্তিমগ্ন।

আসন ত্যাগ করে শিবনাথ ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন ঘরের সংলগ্ন খোলা ছোট ছাদটিতে। আলসের উপরে দু'হাত রেখে তাকিয়ে দেখলেন—ঊর্ধ্বে নিঃশব্দতিমিরবেষ্টিত বিস্তীর্ণ আকাশ। সেখানে লক্ষ লক্ষ তারকা-অক্ষরে লেখা বুঝি মহাকালের দুর্বোধ্য লিপিকা! তাতে কী আছে সমাপ্তির ইঙ্গিত? মুক্তির নিশানা? আছে পরিত্রাণের সঙ্কেত?

বেদনামথিত বক্ষস্থল থেকে নিজের অলক্ষিতেই গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করলেন শিবনাথ।

উত্তর ভ্রমণ

আমার কথাটি ফুরালো।

কিন্তু নটে গাছটি মুড়োবার আগেই বিস্মিত বন্ধুজনেরা প্রশ্ন করেন, "সে কী কথা? এই কি শেষ?"

জবাবে চুপি চুপি বলি, শেষ কিছুরই হয় না। উপসংহারের অন্তে থাকে পরিশিষ্ট, পঞ্চম অঙ্কের অবসানে আসে এপিলোগ, পরিশেষের পরে পুনশ্চ। তাই প্যারাডাইজ লস্টের পরে আবার প্যারাডাইজ রিগেইণ্ড হয়। বঙ্কিমের হাতে মরা উদাসিনী বন্য বালিকা দামোদরের হাতে বেঁচে উঠে নম্র বধূরূপে স্বামী পুত্র নিয়ে করে ঘর। পর্বের পর পর্ব যোজনায় পাটনার পিয়ারী বাঈজীর ধারা বয়ে পৌঁছয় মুরারিপুরের দ্বারকাদাস বাবাজীর আশ্রমে বৈষ্ণবী কমললতায়। টানলে বাড়ে শুধু দ্রৌপদীর বস্ত্র নয়, উপন্যাসের ভল্যুমও। প্রমাণ—আপ্টন সিন্‌ক্লেয়ার?

অবশ্য জগতে বস্তু এবং প্রাণী দু'-এরই আয়ুষ্কাল বাঁধা আছে বিশ্বদেবের খাতায়। সেই নির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রম মাত্রই তাদের অস্তিত্ব যায় ঘুচে। কিন্তু জীবনসাঙ্গের মধ্য দিয়েই যে, জীবনের উজ্জীবন ঘটে তার প্রমাণ আছে যুগে যুগে জগতের একাধিক মহামানবের ধর্মপূত জীবনে। ক্রুশদণ্ডে যিশুর যে-জীবনাবসান সে খৃস্টের সত্যিকার মৃত্যু, না, জন্ম? ইংরেজী ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী নাথুরাম গডসে গান্ধিজীকে প্রকৃতপক্ষে মেরেছে, না, বাঁচিয়েছে?

মরণ নিয়ে কবিদের নানা জল্পনা-কল্পনার কথা সুপরিজ্ঞাত। তা'কে কেউ বলেছেন মধুর, কেউ বলেছেন ভয়াল, কেউ

বলেছেন শান্তির পারাবার। কেউ বা তা'কে মনে করেছেন শ্যাম সমান। মৃত্যুর রূপ সম্পর্কে তাঁদের যতই মতভেদ থাক, তাকে চরম সমাধান বলে তাঁরা কখনও ভুল করেন নি। কবিদের সাংসারিক জ্ঞানের পরিমাণ সম্পর্কে বহু কৌতুক প্রচলিত আছে; কিন্তু তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তির অভাব নেই। মরণেই যদি সমস্ত নিঃশেষ, তবে কোন পরিতৃপ্তি নিয়ে মরবে নায়ক? কোন প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাঁচবে নায়িকা? না, একমাত্র বাংলা সিনেমার পরিচালক ছাড়া এ-যুগে মৃত্যুকে আর কেউ সমাপ্তির অবধারিত উপায় মনে করে না।

পদার্থবিদ্যায় বলে,—বস্তুর বিলোপ নেই; আছে পরিবর্তন। আধ্যাত্মিকতার মতে, প্রাণের বিনাশ নেই, আছে বিবর্তন। সাদা কথায়, তথ্যজ্ঞানীরা মানে রূপান্তর। তত্ত্বজ্ঞানীরা মানে জন্মান্তর। এ দু'-এর কোনোটাই যারা নয়, সেই সাধারণ মানুষেরও দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় আছে অনুরূপ উদাহরণ। ধূপ দগ্ধ হলেই তো মেলে সুরভি, প্রদীপের তেল ক্ষয় হয়েই দেয় আলো। বসন্তে চেরীর শাখায় পাতা খসে গেলে ফোটে ফুল। ফুল ঝরে গিয়ে ধরে ফল। ফল থেকে বেরোয় বীজ। সে কি তরুর সারা, না, সুরু? শ্রাবণ আকাশের শ্যামল মেঘমালা কি জলের আদি, না, অন্ত? জপের মালায় কোন রুদ্রাক্ষটি শেষের? স্তবের ভাষায় কোন মন্ত্রটি সমাপ্তির?

বস্তুতঃ, জগতে বিরাম নেই, আছে বিশ্রাম। যাত্রাশেষ নেই, আছে যাত্রাভঙ্গ। সে-থামাটা শুধু পুনরারম্ভেরই

পূর্বাভাস ;—গানের যেমন সম, কবিতার যেমন চরণ। সেগুলি তো ইতি নয়,—যতি। একমাত্র দাম্পত্য কলহে স্ত্রীর উক্তি ছাড়া জগতে 'শেষকথা' বলে কিছুই নেই।

শুনে বন্ধুরা নিরস্ত হন। কিন্তু বান্ধবীরা তাঁদের খোপাসুদ্ধ মাথা নেড়ে কানের দুলে দোলা দিয়ে বলেন, "বা রে, তা বলে তোমার গল্পের কি পূর্ণচ্ছেদ থাকবে না? প্লটের থাকবে না কন্‌ক্লুশন?"

সে সাহিত্যানুরাগিনীদের আর একবার স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে, গল্পের বায়না নিয়ে আমি বসি নি।

গল্প এ-যুগে হয় না। গল্প রচনার জন্যে চাই যে-রহস্যময় পরিবেশ এবং কল্পনাপ্রবণ মনোভাব তার কোনোটাই বর্তমানে আর সম্ভব নয়। অপরিচয়ের যে-দূরত্ব ও কৌতূহল শ্রোতার কল্পনাকে উদ্দীপ্ত ও মনকে মোহাবিষ্ট করে, আজিকার ভূগোল-ইতিহাস-ব্যাখ্যাত বিজ্ঞান-বিশ্লেষিত দিনে তার অস্তিত্ব নেই।

পৃথিবীর সকল দেশের সর্বাপেক্ষা আদি ও অকৃত্রিম গল্প হলো রূপকথা। তার পাত্র-পাত্রীরা সাধারণ নরনারীর প্রাত্যহিক পরিচিতির বাইরে। তার ঘটনাবিন্যাস সাংসারিক অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে। সেই অজ্ঞাত, অভাবিত রহস্য তাই শ্রোতার মনে এক অনির্বচনীয় মোহ বিস্তার করে। রূপকথার রাজ্য পুরোপুরি স্বপ্নের রাজ্য। সে-গল্প-লোক আসলে হলো কল্প-লোক। তাই তার আবেদন এত সর্বজনীন, এত দেশ-কাল-নিরপেক্ষ।

কিন্তু আধুনিক জগতে মানুষের বিস্ময়ের পরিধি সঙ্কীর্ণ। বিশ্বাসের ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। যন্ত্র এবং বিজ্ঞান মিলে অচেনা অজানার ক্ষেত্রকে করেছে অপরিসর, অসম্ভবের তালিকাকে করেছে সংক্ষিপ্ত। এরোপ্লেনে যখন হামেশাই তিল, তিসি, মায় হাতির বাচ্চা চালান হচ্ছে, তখন পুষ্পকরথের নামে কারো মন উত্তেজিত হয় না। প্রত্যহ খবরের কাগজে যখন থাকে হাইড্রোজেন বোমার রোমহর্ষক বিবরণ, তখন অগ্নি বা বরুণ বাণের কথা শুনে কারো তুই চোখ কপালে উঠবে এমন সম্ভাবনা নেই। যে-দিনে প্রমাণ ছাড়া কিছুই প্রত্যয় হয় না, সে-দিনে 'এ হ্যাণ্ড বুক অব বটানি'র পাতায় উল্লেখ না থাকলে সাত ভাই চম্পার পারুল বোনটিকেও কারো মনে ধরে না এবং প্রাণী-তত্ত্ববিদের ছাড়পত্র না পেলে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীদেরই বা সাধ্য কি যে, শ্রোতাদের অবিশ্বাসের বেড়া ডিঙ্গোয়!

এক যে ছিল রাজা! সুদূর অতীতে কোন এক বিস্মৃত দিবসের কর্মহীন সন্ধ্যায় মৃদু দীপালোকিত গৃহকোণে বৃদ্ধা পিতামহী সর্বপ্রথম এই বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন, তা শুধু পণ্ডিতেরাই জানেন। কিন্তু যুগ-যুগান্ত ধরে এই সহজ ও সামান্য সূচনাটি নিঃসংশয় শিশুচিত্তে যে কী মোহিনী মায়া বিস্তার করে আসছে, সে-কথা কারুরই অজানা নেই। ভাষার কারুকার্য নয়, ভাবের গাম্ভীর্য নয়, আড়ম্বরহীন নিরলঙ্কার চারটি মাত্র শব্দ,—এক যে ছিল রাজা! সে তো কথা নয়, সে ইন্দ্রজাল।

মুস্কিল এই যে, এ-যুগে রাজা নেই। আছে রাজ্যপাল।

নৃপতির বদলে রাষ্ট্রপতি। তাঁদের ভ্রূকুটিতে কারো শিরশ্ছেদ হয় না, তাঁদের তুষ্টিতে হয় না অর্ধেক রাজত্বসহ রাজকন্যা লাভ। প্রজাপালন বা দুষ্টদলন কোনোটাই তাঁদের এক্তিয়ারে নয়। প্রভাতে ত্রিষ্টুপ অনুষ্টুপ ছন্দে গেঁথে কোনো সভাকবি করে না তাঁদের স্তুতিপাঠ। চাঁদির রেকাবে হাজার আশরফি সাজিয়ে কোনো আমীর ওমরাহ দেয় না নজরানা। অনাথ আশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন বা বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কারবিতরণী সভার সভাপতিত্ব ছাড়া তাঁদের আর কোনো সার্থকথা নেই। ফুঃ; তাদের গল্প লিখতে বসবে কে?

এ-কালের রাজকন্যারাও পাঁচ-মহলা রাজপুরীর অন্তঃপুরে সোনার কাঠি ছোঁয়ার অপেক্ষায় নিদ্রামগ্ন থাকে না। সোনার গয়না গড়াতে স্যাকরার দোকানে ভীড় বাড়ায়। কেশবতীদের কেশদাম মেঘবরণ হওয়ার আগেই ববড্ হয়ে যায়। আধুনিক কঙ্কাবতীর অশ্রুতে মুক্তা ঝরে না, বরং গালের মেক-আপ ধুয়ে যায়। তাদের গল্প শুনতে বসবে কে? ডেমোক্রেসিতে ফেয়ার ট্রায়েল হয় তো হতে পারে, কিন্তু ফেয়ারী টেলস্ কদাচ নয়। হায়, গণতন্ত্রে ছেলেদের মত গঠন করে মন্ত্রীমণ্ডলী, মেয়েদের রুচি নিয়ন্ত্রণ করে সিনেমা প্রযোজক এবং শিশুদের চিত্ত বিনোদন করে ডিটেকটিভ বই-এর প্রকাশক।

রূপকথার পরবর্তীকালে উপকথা রচিত হয়েছে যাঁদের নিয়ে, তাঁদের সঙ্গেও আধুনিক নরনারীর সাদৃশ্য সামান্য। ক্রোধ, করুণা, প্রেম, প্রতিহিংসা প্রভৃতি মৌলিক প্রবৃত্তিগুলির

তীব্র অনুভূতি ও প্রচণ্ড প্রকাশ সে-যুগের অধিকাংশ নরনারীর আচরণে দিয়েছে অভিনবত্ব, চরিত্রকে করেছে রহস্যময়। পাপে, পুণ্যে, ক্রূরতায়, ঔদার্যে, লোভে, বৈরাগ্যে, মহত্ত্বে ও দুষ্কৃতিতে তাঁরা অসাধারণ। তাই তাঁদের সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহল ও কল্পনার কিছুমাত্র অভাব ঘটে নি।

আধুনিক মানুষের জীবনে বিস্তার নেই। বিক্রমও না। হোমিওপ্যাথিক ওষুধের মতো তার না আছে রং, না আছে ঝাঁজ। নিতান্তই নিরীহ। স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান হলে আধুনিক ভেনিসের মুর শয্যাগৃহে সুন্দরী ভার্যাকে গলা টিপে মারে না, বড় জোর বিবাহবিচ্ছেদের পরামর্শ নিতে উকীলের বাড়ি ছোটে। ওসমান এবং জগৎসিংহ এখন আর তলোয়ার নিয়ে তেড়ে আসে না। একে অন্যকে সিগারেট-কেস বাড়িয়ে দিয়ে বলে, "হ্যাভ এ স্মোক।" প্রণয়িনীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে এ-যুগে প্রেমিক আত্মহত্যা করে না; বরং মাসিক পত্রিকায় সুদীর্ঘ গদ্য কবিতা লিখে পাঠকের মনেই হত্যা-প্রবৃত্তি জাগায়।

এ-যুগে মানুষের ক্ষুদ্র সুখ, ক্ষুদ্র দুঃখ, ক্ষুদ্র কল্পনা। উচ্চাভিলাষ রাজসিংহাসন নয়, খুব বেশী হলে একটা প্রাদেশিক মন্ত্রিত্ব। তার জন্যে গুপ্তহত্যার প্রয়োজন হয় না, খদ্দরের টুপিই যথেষ্ট। কলহের উত্তেজনায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কেউ যুদ্ধযাত্রা করে না, থানায় ডায়েরী লিখিয়ে আসে। এখন জয়ের লক্ষ্য নির্বাচন, দানের দৌড় ফ্লাগ-ডে এবং প্রতিহিংসার মাত্রা বেনামী চিঠি। এ-কালে বাসের

জন্যে উদ্ভব হয়েছে ফ্ল্যাট, আহারের জন্যে ক্যাফেটেরিয়া এবং পড়ার জন্যে 'ডাইজেস্ট' অথবা দৈনিক পত্রিকার রবিবাসরীয় অংশ। কোনোখানে আর বিশালতা বা নাটকীয়ত্বের অস্তিত্ব নেই। তাই এ-যুগে ড্রামা হয় না, হয় প্লে। সেক্সপিয়ার হয় না, হয় নোয়েল কাওয়ার্ড। এখন জীবনে টেম্পেস্ট নেই ; আছে কেবলই ব্রিফ এনকাউন্টার।

বাস্তবিক গল্প-উপন্যাসকে যে ইংরেজীতে ফিকশান বলে সেটা একেবারে নিরর্থক নয়। কী কঠিন সঙ্কটে পড়েই যে আধুনিক সাহিত্যিকেরা চাষী-মজুরদের গল্প রচনায় বসেন, সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। যেন রেশনের দিনে বাঙ্গালী মেয়েদের রুটি খাওয়ার দায়!

অবশ্য অপরিচয় এবং ব্যাবধান নিরঙ্কুশ কল্পনার অনুকূল, সন্দেহ নেই। কিন্তু অবকাশ, অপব্যয় ও অজস্রতার মাটি না পেলে কল্পনাধর্মী রচনার অঙ্কুরোদ্গম হয় না। তাই আইন সভায় স্বতন্ত্র দল যেমন প্রচ্ছন্ন সুবিধাবাদী, রাষ্ট্রনীতিতে নিউ ডেমোক্রেসী যেমন বেনামী কমিউনিজম, রচনাশাস্ত্রে আধুনিক গণ-উপন্যাসও তেমনি ছদ্মবেশী প্রবন্ধ-পুস্তক। 'মেহনতি'তে আর যাই হোক, সাহিত্য হয় না। সাহিত্যিকেরই কথা ধার করে বলতে পারি, মানুষের মনোহরণ করে বংশীধর। সে হলধরের সাধ্যে নেই।

এ-যুগের সার্থক সাহিত্যসেবীদের কাছে সমাজ ও জীবনের এই সঙ্কীর্ণ পরিধির কথা অজ্ঞাত নেই। তাঁরা জানেন, নলেন গুড়ের মরশুম ফুরোলে নলেনতর গুড়ের

আশায় বসে কালহরণে লাভ নেই, তখন বাজার থেকে চিনি কিনে সন্দেশের পাক দিতে হয়। তাই তাঁরা এখন গল্প না লিখে লেখেন প্রসঙ্গ। ঘটনা-বিন্যাসের চেষ্টা ছেড়ে মন দেন চরিত্র-সৃষ্টিতে। জীবনের গতি অপেক্ষা মনের ধারা তাঁদের রচনার অধিক উপজীব্য। তাতে বিবরণ অপেক্ষা বিশ্লেষণ বেশী। মানসিক একটি বিশেষ অবস্থা, বা আচরণের একটি বিশেষ ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলতে পারলেই তাঁদের রচনা সফল।

পুরানো দিনের রচনায় পাত্র-পাত্রীদের মাতৃজঠরবাস থেকে শ্মশানযাত্রা পর্যন্ত সমগ্র জীবনের কাহিনী থাকত। এখনকার লেখায় থাকে তাদের জীবিতকালের কোনো একটি অংশ, কোনো একটি দিন, এমন কি কোনো দু' একটি ঘণ্টার কথামাত্র। সেগুলি কথাসাহিত্যের ভোজনশালায় ডিনার নয়—আলাকার্ট। কাহিনী-সমুদ্রের তরঙ্গ নয়, —বুদ্বুদ! এ-যুগের গল্পলেখক,—শেকভ। কবি,—টি. এস. এলিয়ট। জগতে রোমান্টিক কাব্য আর হয় না। সত্যিকার গল্পও আর হবে না। যেমন আর ফিরে আসবে না সামন্ততন্ত্র বা পালের জাহাজ, কিম্বা চণ্ডীমণ্ডপের আড্ডা।

তবুও সংশয় নিরসন হয় না। বান্ধবীরা সহৃদয়া। তাঁরা হৃষ্টচিত্তে বই-এর মলাট মুড়ে রেখে তাঁদের কমলকরপল্লবে চা-এর পেয়ালা এগিয়ে ধরেন। কিন্তু দেখ বৎস সম্মুখেতে প্রসারিত তব সমালোচকের জিজ্ঞাসু নেত্র।

বাগ্‌বিস্তার দ্বারা ভোটদাতাদের ভোলানো যায়, সমালোচকদের নয়। তাঁরা ঊর্ধ্বে ও অধে মৃদু শির

সঞ্চালনপূর্বক সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র, ইংরেজী কাব্য-জিজ্ঞাসা ও রাশিয়ান সাহিত্য-বিচার উদ্ধৃত করে শব্দবহুল ও কটাক্ষ-কুটিল যে-সব মন্তব্য প্রকাশ করেন তার সহজ সারাংশ এই যে, "আচ্ছা, না হয় মেনেই নিলেম এটা মলী সেনের গল্প নয়। কিন্তু বাপু হে, তাঁর জীবনের কি পরিণতি নেই ?"

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন করি, "না, নেই।"

শুধু মিসেস মলী সেনের নয়, সংসারে কারুর জীবনেরই পরিণতি থাকে না। থাকে পরিণাম। জিভে ক্যানসার ক্ষতকে কি গণ্য করব ঠাকুর রামকৃষ্ণের দিব্য জীবনের পরিণতি ? অতীতের কারাবরণকারী বহুনির্যাতিত দেশহিতব্রতীদের জীবনের পরিণতি কি বর্তমান পারমিট-লোলুপতা ?

পরিণতি কথাটার মধ্যে যে সুসমঞ্জস সমাধানের ইঙ্গিত আছে, জীবনের প্রকৃতিই তার বিরুদ্ধে। বাস্তব জীবন হচ্ছে কতকগুলি আকস্মিকতার সমষ্টি। সুপরিকল্পিত ধারা বা যুক্তিসম্মত ধাপ বেয়ে তা চলে না। তার আরম্ভ, তার স্থিতি এবং তার অবসান সমস্তই পুরোপুরি কার্যকারণবিরহিত, খামখেয়ালীভরা,—ইংরেজীতে যাকে বলে আরবিট্র্যারী। তার মধ্যে ঔচিত্যানুগ বিকাশ বা সঙ্গতিপূর্ণ সমাপন খুঁজতে যাওয়া পণ্ডশ্রম।

কাল পূর্ণ হলে মলী সেনের জীবনেরও নিশ্চয় একটা পরিণাম ঘটবে। কিন্তু সে তো আমার জানা নেই। এটা

খণ্ডিত জীবনচিত্র মাত্র। পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত নয়। মলী সেনের যিনি বসওয়েল, আশা করি, তিনি গোকুলে বাড়ছেন।

প্রকৃত তথ্য হচ্ছে এই যে, দুর্ঘটনার পরে মলী সেনের সঙ্গে আমার আর যোগাযোগ ঘটে নি। কর্তার ইচ্ছায় শুধু কর্ম নয়, কর্মস্থানও বটে। আমার কর্মদাতাদের আদেশে অভিনয় রাত্রির পরদিনই আমাকে দীর্ঘকালের জন্যে স্থানান্তরে যেতে হয়। মাঝে এই প্রাসাদপুরীতে কখনও আসি নি, এমন নয়। কিন্তু মলী সেনের সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করি নি। সেটা ইচ্ছাকৃত। যাঁকে ভালো লাগে, তাঁর সঙ্গে পরিচয় পরিমিত রাখা বিধেয়। যে-গানের রেকর্ডটি পছন্দ, সেটি বেশী বাজাতে নেই।

অবশ্য পছন্দ হলে কৌতূহলটাও একেবারে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তারও একটা সীমা থাকা প্রয়োজন। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে মলী সেন পুনরায় অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন কি না, সে-সংবাদ আমার পক্ষে অনাবশ্যক। একমাত্র সাহায্য-রজনীর টিকেটের যাঁরা মূল্য ফেরৎ আশা করেন, তাঁরা ছাড়া আর কারুরই তাতে ঔৎসুক্য নেই। উপর থেকে নীচে ছিটকে পড়া সত্ত্বেও মলী সেনের আঘাত কেন গুরুতর হয় নি, তার কারণ নিয়ে মাথা ঘামাবেন ডাক্তারেরা। হঠাৎ মানসিক উত্তেজনা বা অবসাদে সংজ্ঞা লোপ হয় কি না, তার সঠিক উত্তর দিতে পারবেন মনস্তত্ত্ববিদ। প্রমোদ-তরণীর ছাদ থেকে পতনের সঠিক কারণ কি, সেটা

নির্ণয়ের কাজ সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের। আমি আর যাই কেন না হই, অন্ততঃ রবার্ট ব্লেক নই।

মলী সেন সম্পর্কে আমার কৌতূহল নেই। কিন্তু মনোযোগ আছে। বিদেশে আমার এক আত্মীয়াকে মলী সেনের কাহিনী বলেছিলেম। শুনে নিরতিশয় ঘৃণাভরে নাসিকা কুঞ্চিত করে তিনি ধিক্কার দিলেন, "অমন মেয়ের মুখে আগুন।"

মহিলা পাঁচটি মেয়ে ও চারটি ছেলে, একুনে এই নয়টি জীবিত সন্তানের জননী। বয়স চল্লিশের উপরে। এখনও স্বামীর নামীয় খামের চিঠি গোপনে খুলে পড়েন এবং তাঁর বাড়ি ফিরতে দেরী হলে আপিসের এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান স্টেনোগ্রাফার মেয়েদের চেহারা সম্পর্কে চাপরাশীকে জেরা করেন। তাঁর উষ্ণতার কারণ বুঝি।

মলী সেনের সগোত্রদের মধ্যে অনেক মেয়েই এখন স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে মুখে সধূম অগ্নিবহন করেন। সমাজের উপরতলার অতি-আধুনিকাদের খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরা অবশ্যই জানেন যে, ঠোঁটে রং মাখাটাই এখন আর যথেষ্ট প্রগতিশীলার চিহ্ন নয়। আমার আত্মীয়ার ভর্ৎসনা কানে গেলে মলী সেন বিচলিত হবেন, এমন সম্ভাবনা নেই। সুতরাং সে-প্রসঙ্গ থাক।

এদেশে সুনীতি সংঘের চাঁদা-না-দেওয়া সদস্য আছেন সর্বত্র। আপামর সাধারণের নৈতিক চরিত্রের স্বয়ংনিযুক্ত অভিভাবকের সংখ্যাও অগুণতি। যদিও তাঁরা জেনে আতঙ্কে

তার পরিত্রাণ কোথায়? তার তো হোলি ওয়েডলক্ নয়, হোলি ডেডলক্।

দুঃখে অচঞ্চল সুখে চ বিগতস্পৃহ যে-নারী, তিনি নমস্যা। তাঁকে নিয়ে তো প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু হৃদিস্থিত হৃষীকেশের দোহাইতে যার হৃদয় সান্ত্বনা না পায়, সমাজের আর পাঁচজন নারীর মতো যে প্রত্যাশা করে সখ্য, প্রীতি ও অনুরাগ, সেই কাদামাটিতে-গড়া সাধারণ মেয়ে স্বামীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকবে কী নিয়ে? মলী সেনের শৈশবের শিক্ষা, কৈশোরের আবেষ্টন ও যৌবনের সমাজ কোনোটাই ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের অনুকূল নয়। কৃচ্ছ্র সাধনের সঙ্গে ভগবদ্ভক্তির সম্বন্ধ ঠিক কোনখানে সে আমার জানা নেই। কিন্তু সোনার বোতাম-আঁটা সিল্কের পাঞ্জাবী গায়ে যে ব্রহ্মচিন্তা চলে না, সে-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

সমাজে অধিকাংশ আধুনিকাদেরই উভয় সঙ্কট। পূর্বজন্ম বা কর্মফলের উপর যে-অসন্দিগ্ধ নির্ভরতায় প্রাচীনারা আপন দুর্ভাগ্যকে অনিবার্যরূপে গ্রহণ ও বহন করতেন, সে তাঁরা বর্জন করেছেন। অথচ যে-দুঃসহসের দ্বারা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা যায়, তাও তাঁরা অর্জন করেন নি। তাঁদের না আছে অন্ধ বিশ্বাসের প্রশান্তি, না আছে যুক্তিপরায়ণতার দৃঢ়তা। যে-পাখী মনে আকাশে উড়ে বেড়াবার বাসনা আছে অথচ ডানায় যথেষ্ট জোর নেই, তার মতো দুঃখী নেই ত্রিজগতে। পাখা-ঝটপটানিতে কেবলি ক্ষত-বিক্ষত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না তার।

সেন তো ছায়া নন। তাঁর হৃদয় আছে, আশ আসক্তি আছে এবং সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ যে-সম্পদ সেই ভাসা আছে। ভালোবাসায় তিনি আপন স্বামীকে জয় পারেন নি। অন্যকে আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু -প্রেম নরনারীর পরিপূর্ণ মিলনের মধ্যে সসম্মানে ত নয়, যে-অনুরাগ নিত্যকার সাংসারিক জীবনযাত্রায় ফলিত, স্বজন-বন্ধুগণের দ্বারা অস্বীকৃত এবং সমাজের -কল্যাণ ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতিহীন, সে ঝঞ্ঝার মতো হলেও ঝঞ্ঝার মতোই অস্থায়ী। বন্ধনহীন প্রেম পুষ্পের মতো আপনাতে আপনি বিকশি মনোহরণ পারে। কিন্তু দীর্ঘকাল বাঁচতে পারে না। প্রেম— । বাস্তব জীবনের দীপশিখায় আশ্রয় না পেলে সে য় হয়েও স্বল্পায়ু। এ-সত্য মলী সেনের জানা ছিল না। ব্যর্থমনোরথ হয়ে তিনি ক্ষোভে বিদ্রোহে ও ভ্রান্তিতে ার কেবলি মাথা খুঁড়েছেন চারদিকের দেয়ালে। তাতে ল চিড় ধরে নি। তাঁর নিজেরই আহত ললাট থেকে শোণিত।

অসামান্য রূপ ও অসাধারণ বুদ্ধি নিয়ে অতুল ঐশ্বর্যে এবং য ভক্তজনের মধ্যে মলী সেন রিক্ত, নিঃসঙ্গ ও বুভুক্ষু। রিত রীতিতে যেখানে তাঁর স্থান, সেখানে তিনি ৃত। স্বাভাবিক নিয়মে যাঁর কাছে তাঁর মান, কাছে তিনি অনাদৃত। সেই অবাঞ্ছিত অবস্থিতির মিত গ্লানি নিরন্তর বহন করে আপন আত্মাকে তিলে

তিলে হনন করছেন অনন্যোপায় মলী সেন। তিনি যা চেয়েছেন তা রয়েছে তাঁর পাওয়ার অতীত। তাঁর কাছে যা চাওয়া হয়েছে, তা ছিল তাঁর দেওয়ার অসাধ্য।

এই হলো তাঁর ট্র্যাজেডি।

এই হবে তাঁর এপিটাফ।